১৪শ বর্ষ | বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩১ | ১ম সংখ্যা

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত

প্রতিভা

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার
এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি, এফ্‌-সি-এস

সূচী

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বার্ষিক মূল্য ২ ডাকমাশুল সহ ২৸৹ | শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রতিভা কার্য্যালয়, ঢাকা। | এই সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সহ [illegible]

১৪শ বর্ষ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৩১ ১ম সংখ্যা।

চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক

বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারিত হইবার পর চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান আরম্ভ হয়। বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু চীন দেশ হইতে ভারতে আগমন করেন, আবার বহু ভারতবর্ষীয় ভিক্ষু চীনদেশে যাইয়া দীর্ঘকাল বসবাস করেন। তখনকার দিনে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের পথ সুগম ছিল না, বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শতকরা ২০।২৫ জন গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিত কিনা সন্দেহ, অবশিষ্ট পথি মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কারণ স্থলপথে গোবির বিশাল মরুভূমি ও সহস্র সহস্র অজ্ঞাত পর্ব্বত ও নদী অতিক্রম করিয়া আসিতে হইত, আবার জলপথে ক্ষুদ্র তরণী মাত্র নির্ভর করিয়া উত্তাল-তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ সীমাহীন জলধির বক্ষে মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে হইত। কিন্তু এ সকল দুস্তর বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যাঁহারা জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া ভারতবর্ষ অথবা চীনদেশে গমনাগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা যে সর্ব্বজন বরেণ্য ও জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য একদেশদর্শী ইতিহাস ইঁহাদের কথা স্মরণ করে না। যে ক্ষুদ্র সেনাপতি অসংখ্য নরহত্যা করিয়া সামান্য ভূখণ্ড অধিকার করে, ইতিহাস সগৌরবে তাহার নাম বক্ষে ধারণ করে, তাহার জন্ম ও বাল্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করে। কিন্তু যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি জগতে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য অসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, সাধারণ ইতিহাসে তাহাদের স্থান নাই। ইহা ইতিহাসের দুর্ভাগ্য, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহারা নগণ্য নহেন। জগতের প্রকৃত ইতিহাস যখন লিখিত হইবে তখন আমরা দেখিব যে যুদ্ধ ও [illegible] কাহিনীই তাহার প্রধান উপজীব্য নহে, পরন্তু [illegible]

মানবসভ্যতার উৎপত্তি ও প্রসারের বিবরণই তাহার চরম লক্ষ্য। সুতরাং এই শেষোক্ত কার্য্যে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারাই ইতিহাসের প্রধান নায়ক এবং তাঁহাদের আখ্যানই সমরকুশল নরপতির রক্তলিপ্ত কাহিনী অপেক্ষা ইতিহাসে উচ্চতর স্থান পাইবার যোগ্য।

এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া আজ কয়েকটি অজ্ঞাত অখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজকের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ফা-হিয়ান, হুয়েন সাং বা ইৎ-সিংয়ের ন্যায় ইঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, কিন্তু ইঁহারাও অনুরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনেকেই দুস্তর পথিমধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—কয়েকজন মাত্র ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল কার্য্যসিদ্ধির পরিমাণ দ্বারাই ইঁহাদের মূল্য নির্ণয় করিলে ইঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। গুণীই গুণের আদর করিতে জানে, তাই সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ইৎসিং ইঁহাদের আখ্যান সযত্নে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইৎসিংয়ের গ্রন্থের নাম "যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য পশ্চিম দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) গমন করিয়াছিলেন তাহাদের জীবনী"। এই গ্রন্থে প্রায় ষাটজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ ও মূল বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির অনুসন্ধানে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। সুতরাং ইঁহারা সকলেই ইৎসিংএর সমসাময়িক। অর্দ্ধশতাব্দী পরিমিত সময়ের মধ্যেই অন্যূন ষাট জন ভিক্ষু ধর্ম্মের প্রেরণায় এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন ইহা ভাবিলে চিত্তে স্বতঃই বিস্ময় ও সম্ভ্রমের উদয় হয়।

ইৎসিংয়ের গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সাবানে কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কোন ইংরেজী অনুবাদ না থাকায় এবং ফরাসী অনুবাদও এদেশে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, ইৎসিংএর এই গ্রন্থখানি আমাদের নিকট বিশেষ সুপরিচিত নহে। অথচ, মহাপ্রাণ ভিক্ষুগণের জীবন কাহিনীর সঙ্গে তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্যও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই জন্য প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া ইহার সটীক অনুবাদের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করি। তিনি অনতিবিলম্বে তদনুরূপ ব্যবস্থাও করেন। ঘটনাচক্রে ইহার অনতিকাল পরেই আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আসি। এই অনুবাদ কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে কিনা তাহাও অবগত নহি। তবে ভরসা আছে, ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই জন্য আমি এই গ্রন্থের অনুবাদ করিতে প্রয়াসী না হইয়া ইহার সার মর্ম্ম সংকলন ও স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার মাত্র করিব, অর্থাৎ যে ষাট জন ভিক্ষুর জীবনী ইৎ সিং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সংক্ষেপতঃ তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের কাহিনী বর্ণনা করিব, ও প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব। এই ভিক্ষুগণের চীন দেশীয় নামের সঙ্গে অনেকস্থলে সংস্কৃত নামও আছে। সাধারণের পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া আমি প্রধানতঃ এই সংস্কৃত নামই ব্যবহার করিব, তবে চীনদেশীয় নামও বন্ধনীমধ্যে উল্লেখ করিব।

১। প্রকাশমতি (ইউয়েন-চাও)

চীনদেশের তই প্রদেশে ইহার জন্ম। বাল্যকালেই ইনি সংসার-ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মূল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে সর্ব্বদাই শ্রাবস্তীর জেতবনের (১)

(১) শ্রাবস্তীর বিখ্যাত জেতবন উদ্যান অনাথপিণ্ডদ নামক এক ধনাঢ্য বণিক বুদ্ধদেবকে দান করেন। বুদ্ধদেব বহু বর্ষ তথায় সশিষ্য বাস করেন এবং তাঁহার অনেক ধর্ম্মোপদেশ ঐ স্থানেই উচ্চারিত হয়। এই নিমিত্ত জেতবন বৌদ্ধগণের নিকট পরম পবিত্র তীর্থস্থান। সম্প্রতি শ্রাবস্তী

চিত্র ইহার মানসপটে সমুদিত হইত। অবশেষে একদিন জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া খখ্খর (২) হস্তে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীমাহীন মরুভূমি ও দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ও দৈব কৃপায় দস্যু-দলের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তিনি তিব্বতে উপস্থিত হন। এই সময়ে চীনদেশীয় এক রাজকন্যা (৩) তিব্বতের রাণী ছিলেন—তাঁহার সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের জালন্ধর প্রদেশে উপস্থিত হন। এখানে তিনি চারি বৎসর পর্য্যন্ত সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জালন্ধরের রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করেন অতঃপর তিনি গয়ার মহাবোধি বিহারে গমন করেন এবং সেখানেও চারি বৎসর বাস করেন। এখানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটি অতি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহাকে দেখিলে জীবন্ত মানুষ বলিয়া ভ্রম হইত। অতঃপর তিনি নালন্দা বিহারে তিন বৎসর কাল জিনপ্রভ ও রত্নসিংহের নিকট মধ্যমক শাস্ত্র, শতশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ভিক্ষু প্রকাশমতি গঙ্গানদী পার হইয়া চন-পু (জম্বু কিংবা শম্বু) (৪) নামক নরপতির রাজ্যে উপনীত হন এবং বিশেষরূপে সমাদৃত হন। এখানে সিন্-চে নামক মন্দিরে এবং অন্যান্য মন্দিরে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন।

ইতিমধ্যে চীন দেশীয় রাজদূত ওয়াঙ্গ-হিউয়েন-সে (৫) ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাশমতির গুণাবলীর কথা বিবৃত করিলে রাজা উক্ত ভিক্ষুকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত তাহাকেই প্রেরণ করেন। প্রকাশমতি নেপাল ও তিব্বতের মধ্য দিয়া চীনদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং ৬৬৪ খৃঃ অব্দে লো-যং নামক রাজধানীতে উপনীত হন। এখানে তিনি স্থানীয় ভিক্ষুগণের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের সারমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বাস্তিবাদ বিনয়ের অনুবাদ করিতে অনুরোধ করে। এমন সময়ে চীন সম্রাট তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং আয়ুষ্মান লোকায়ত (?) নামক ব্রাহ্মণকে (৬) কাশ্মীর হইতে আনয়ন

ও জেতবনের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত এবং সাহেত্ মাহেত্ নামে খ্যাত।

(২) ভিক্ষুগণের ব্যবহৃত যষ্টি বিশেষ। ইহার মাথা টিন দিয়া ঢাকা এবং তাহাতে কয়েকটি টিনের কড়া লাগান থাকিত।

(৩) ৬৩৪ খৃঃ অব্দে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ রাজা স্রং-স্থান্ গ্যাম্ পো চীনদেশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য চীনদেশের রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। চীনরাজ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করায় তিনি চীনদেশ আক্রমণ করেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন কিন্তু চীনরাজ তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। ৬৪১ খৃঃ অব্দে রাজকুমারী ওয়েনৎ চেঙ্গএর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি নেপালের এক রাজ-কন্যাকেও বিবাহ করেন। এই দুই বৌদ্ধ রাণীর সহায়তায় তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। স্রং স্থান্ গ্যাম পো ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কতকাংশ জয় করেন (বিস্তৃত বিবরণ সিলভ্যান্ লেভি প্রণীত নেপালের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য)।

(৪) রাজা জম্বু (?) কোন দেশে রাজত্ব করিতেন এবং সিন-চে নামক মন্দির কোথায় ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। ভিক্ষু প্রজ্ঞাবর্ম্মণের জীবনী (৪১ সংখ্যা) হইতে জানা যায় যে উক্ত মন্দির স্যান-মুও-লুও-পো (অম্রব অথবা অমবর নামক রাজ্যে অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের নাম হুয়েনসাংএর বিবরণে নাই। সম্ভবতঃ ইহা অযোধ্যা দেশে ছিল।

(৫) ইনি হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ ভিঃ স্মিথের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

(৬) লোকায়ত (অথবা লোকাদিত্য) উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ। ইনি অমরত্ব লাভ করিবার ঔষধ জানিতেন এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল। অমর হইবার লোভেই চীন সম্রাট তাঁহাকে আনিতে পাঠান। ৬৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন এবং বিশেষ সম্মান সূচক উপাধি লাভ করেন।

করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ এই ব্রাহ্মণ অমরত্ব লাভ করিবার ঔষধ জানিতেন।

রাজাজ্ঞায় প্রকাশমতি আবার ভারতবর্ষ যাত্রা করিলেন। আবার পর্ব্বত ও মরুভূমি পার হইয়া দুইবার দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি সীমান্ত প্রদেশে পৌছিলেন। পথিমধ্যে লোকায়তের সহিত দেখা হইল, তিনি চীন রাজদূতের সঙ্গে চীনদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন লোকায়ত সকলকে লইয়া অমরত্ব লাভ করিবার ঔষধ আনিবার জন্য লুয়ো-চা (লডক ?) নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে কপিশ ও সিন্ধুদেশের মধ্যদিয়া তাহারা লডকে পৌছিলেন। তথাকার রাজা পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনি চারি বৎসর কাল তথায় বসবাস করেন। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া অনেক ঔষধপত্র সংগ্রহ করেন। তথা হইতে বজ্রাসন হইয়া নালন্দ মহাবিহারে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না কারণ নেপালের পথে তিব্বতীয়েরা ও কপিশের পথে আরবেরা বিষম বাধা উপস্থিত করিল। প্রকাশমতি আশা করিয়াছিলেন যে চীনদেশে ফিরিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য সমূহ জনসমাজে প্রচার করিবেন কিন্তু তাহার আশা পূরণ হইল না। অনেকদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

২। শ্রীদেব (তও-হি)

ইনিও স্থলপথে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মহাবোধি নালন্দ, কুশীনগর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। স্যান-মুও-লুও-পো নামক স্থানের (৭) রাজা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তিনি নালন্দা বিহারে মহাযান শাস্ত্র ও কুশীনগরের নিকটবর্ত্তী 'শুভবন' বিহারে বিনয় পিটক অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি শব্দবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন। মহাবোধি বিহারে তিনি চীনাভাষার একটি প্রশস্তি রচনা করেন। তিনি অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন কিন্তু ভারতবর্ষেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

৩। চ্যাং মিন—ইনি সমগ্র প্রজ্ঞাশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়া জলপথে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি হো-লিং অর্থাৎ যবদ্বীপের পশ্চিমভাগে উপস্থিত হন। সেখান হইতে জলপথে মো-লোউও-যু অর্থাৎ প্যালেম্বাং-এ উপস্থিত হন। সেখান হইতে এক বণিকের জাহাজে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। জাহাজখানি খুব মালপত্রে বোঝাই করা ছিল। গন্তব্য স্থানে পৌছিবার অনতিকাল পূর্ব্বে ভীষণ ঝড় উঠিল। তখন জাহাজ রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া সকলেই তাড়াতাড়ি জাহাজ সংলগ্ন জালিবোটে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইতে ব্যগ্র হইল। জাহাজের মালিক স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু চ্যাংমিনকে জালিবোটে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বলিলেন কিন্তু ভিক্ষু রাজী হইলেন না, বলিলেন "অন্য লোককে বাঁচাও আমার জীবন রক্ষার আবশ্যক নাই।" তারপর পশ্চিমদিকে ফিরিয়া যুক্তকরে তিনি ভগবান বুদ্ধের উপাসনা করিতে লাগিলেন। জাহাজ ডুবিল সঙ্গে সঙ্গে এই মহাপ্রাণ ভিক্ষু জগতে বৌদ্ধধর্ম্মের অতুল মহিমা ঘোষণা করিয়া শরহিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক শিষ্য ছিল তিনিও গুরুর আদর্শ অবলম্বন করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।

৪। মহাযান-প্রদীপ (তাং চেং তেং)

বাল্যকালে পিতামাতার সঙ্গে ইনি জলপথে দ্বারাবতী রাজ্যে (৮) আসিয়াছিলেন। তৎপর তিনি চীনে প্রত্যাগমন করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল পর তিনি জলপথে সিংহলে উপস্থিত হন, সিংহল হইতে দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া তিনি তাম্রলিপ্তি অভিমুখে যাত্রা করেন, এইখানে নদীর মোহনায় দস্যুরা তাহার নৌকা আক্রমণ করিয়া লুট পাট করে। তিনি কেবলমাত্র প্রাণে বাঁচিয়া কোন ক্রমে তাম্রলিপ্তি পৌছেন। তথায় দ্বাদশ বৎসর গো-লুও-হো (বরাহ ?) মন্দিরে বাস করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এখানে ইৎ-সিংএর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এখানে এক বণিকদলের সঙ্গে যাত্রা করিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে

(৭) ৪ পাদ টীকা দ্রষ্টব্য।

(৮) দ্বারাবতী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান শ্যাম রাজ্য।

নালন্দা, বৌদ্ধগয়া, বৈশালী, কুশীনগর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ মন্দিরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৫। সংঘবর্ম্ম।

ইহার বাসস্থান সমর খন্দ (৯)। যৌবনেই ইনি চীনদেশে গমন করেন। ৬৫৬ ও ৬৬১ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ইনি চীন সম্রাটের আদেশে সম্রাটের দূতের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বৌদ্ধ গয়ায় উপস্থিত হইয়া বজ্রাসনের নিকটে তিনি ভিক্ষুগণের জন্য এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন। তারপর সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া এক বিরাট বৌদ্ধ সংঘের অধিবেশন হয় এবং বজ্রাসন দীপমালায় সজ্জিত হয়। সংঘবর্ম্মই ইহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। তার পর মহাবোধির মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে এক অশোক বৃক্ষের পাদমূলে তিনি বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তথা হইতে তিনি চীন দেশে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর তিনি সম্রাটের আদেশে কিয়াওচে (বর্ত্তমান হ্যানয়) গমন করেন। সেখানে তখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। প্রতিদিন অসংখ্য মনুষ্য ও পশু প্রাণত্যাগ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সংঘবর্ম্মের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি প্রতিদিন বুভুক্ষিত নরনারী ও পশুদিগের জন্য খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহৎ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া লোকে তাহাকে বোধিসত্ত্ব আখ্যা প্রদান করিল। এইখানেই ষাট বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

৬। প্রজ্ঞাবর্ম্ম (হুই লুয়েন)।

ইনি কোরিয়ার অধিবাসী। বৌদ্ধ তীর্থ সমূহ দেখিবার মানসে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দশ বৎসর কাল জ্যান-মুও-লুও-লো (১০) নামক দেশে সিন-চে-মন্দিরে অবস্থিতি করেন।

---

(৯) সংঘবর্ম্মের অন্য কোন নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে সমরখন্দে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল এবং হিন্দু নাম ব্যবহৃত হইত।

(১০) ৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সম্প্রতি তিনি আরও একটু পূর্ব্বে গন্ধার চণ্ড (?-কিয়েন্-তু-লু চং-চ) নামে একটি মন্দিরে বসবাস করিতেছেন। অনেক দিন পূর্ব্বে তুরুষ্করা তাহাদের দেশীয় ভিক্ষুগণের বসবাস করিবার জন্য এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মন্দিরটির অনেক ধন ঐশ্বর্য্য থাকায় এবং ইহার বিধি ব্যবস্থার উৎকর্ষ হেতু ইহা অন্যান্য মন্দিরের শীর্ষ স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। উত্তরে তুরুষ্ক দেশ হইতে ভিক্ষুগণ ভারতবর্ষে আসিলে তাঁহারা এই মন্দিরে বাস করেন এবং তাঁহারা ইহার 'বিহার স্বামী' (১১) বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

[এই তুরুষ্ক মন্দিরের উপলক্ষে ইৎসিং এই জাতীয় কতকগুলি বিদেশী ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই বিবরণ অতিশয় মূল্যবান, কারণ ইহা দ্বারা তৎকালে দূর দেশ দেশান্তরের ভিক্ষু সম্প্রদায়ের একত্র মিলন সূচিত হইতেছে]

মহাবোধির পশ্চিমে গুণ চরিত (কিউ-ন-চে-লি-তো) মন্দির। ইহা কপিশা-বাসীর নির্ম্মিত এবং ঐ সময় অঞ্চলের ভিক্ষুরা ভারতবর্ষে আসিলে এই মন্দিরে বসবাস করে। এ মন্দিরটিও খুব ঐশ্বর্য্যশালী। এখানে বহুসংখ্যক ধর্ম্ম প্রাণ ভিক্ষু বাস করেন, তাঁহারা সকলেই হীনযান-পন্থী।

মহাবোধির উত্তর-পূর্ব্বে কিঞ্চিদধিক দুই যোজন দূরে কিউ-লু-কিয়া (১২) নামে মঠ। পুরাকালে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কিউ-লু-কিয়া নামে দেশের রাজা ইহার প্রতিষ্ঠা

---

(১১) 'বিহার স্বামীগণ' মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সম্প্রদায়। মন্দিরের ধন সম্পত্তি ও বিধি ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে তাহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিত। অন্যান্য ভিক্ষুগণ কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেন, মন্দিরের কোন বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন না।

(১২) সম্ভবতঃ পাণ্ড্য রাজধানী কর্কাই। ইহা তাম্রপর্ণী নদীর তীরে সাগর সঙ্গমে অবস্থিত ছিল।

করেন। মন্দিরটি সম্পদশালী না হইলেও এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিয়মগুলি খুব নিষ্ঠার সহিত পালিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি রাজা আদিত্য সেন (১৩) পুরাতন মঠের পার্শ্বেই নূতন একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা শীঘ্রই শেষ হইবে। দাক্ষিণাত্যের ভিক্ষুগণ এদেশে আসিলে বেশীর ভাগ এই মন্দিরেই বাস করেন।

প্রায় সকল দেশেরই নিজস্ব একটি মন্দির আছে। কেবল চীন দেশের কোন মন্দির নাই। ইহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা হয়। নালন্দের কিঞ্চিদধিক চল্লিশ যোজন পূর্ব্বে, গঙ্গার উপকূলে মৃগ-শিখা-বন (মি-লি-কিয়-সি-চিয়-পো-নো) নামে একটি মন্দির আছে। ইহার অনতিদূরে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকময়ী ভিত্তি ব্যতীত আর ইহার বিশেষ কিছুই নাই। ইহাকে চীনা-মন্দির বলে। বৃদ্ধগণের মুখে মুখে বহুকাল হইতে এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে মহারাজ শ্রীগুপ্ত (১৪) (চে-লি-কি-তো) চীনদেশীয় ভিক্ষুগণের জন্য এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। ঐ সময়ে বিংশাধিক চীন দেশীয় ভিক্ষু সং-কাও(১৫) দেশের ভিতর দিয়া মহাবোধিতে উপস্থিত হন। রাজা শ্রীগুপ্ত তাহাদের ধর্ম্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের বাসের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২৪ খানি গ্রাম দান করেন।

কালক্রমে চীনদেশীয় ভিক্ষুরা এস্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। তিন খানি বাদে অন্যান্য গ্রাম গুলিও অন্যের হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা পূর্ব্ব ভারতবর্ষের অধিপতি দেব বর্ম্মণের (তি-পোউও-পো-মো) রাজ্যভুক্ত। তিনি প্রায়ই বলেন যে যদি চীন দেশীয় কোন ভিক্ষু এখানে আসিয়া বসবাস করেন তবে তিনি মন্দিরটির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বোক্ত গ্রামগুলি তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিবেন।

বজ্রাসন মহাবোধি মন্দিরটি সিংহলের রাজা প্রস্তুত করিয়াছেন। সিংহলের ভিক্ষুগণ বহুকাল তথায় বসবাস করিতেছে।

মহাবোধি মন্দিরের কিঞ্চিদধিক সাত যোজন উত্তর-পূর্ব্বে নালন্দা মন্দির। পুরাকালে উত্তর ভারতবর্ষের ভিক্ষু (পি-চু) রাজবংশের (হো-লুও-চে-প্যান-চে) জন্য রাজা শ্রীশক্রাদিত্য (শ্রে-লি-চে-কিয়ে-লুও-তিয়ে-তি) ইহা নির্ম্মাণ করেন। আদিম মন্দিরটি অতিশয় ক্ষুদ্র। মাত্র ৫০ ফুট পরিমিত বর্গভূমি ছিল। পরবর্ত্তী রাজগণ ক্রমে ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করায় এক্ষণে ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এই বিশাল বিহারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। আমি সংক্ষেপতঃ ইহার বিস্তৃতির একটু আভাস দিব।

[এই খানে ইৎ-সিং ১৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী নালন্দার বর্ণনা ও তাহার একটি মানচিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। মানচিত্রটি এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। ইৎ সিংএর ভারত ভ্রমণ কাহিনীতেও নালন্দার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য আছে। এই সমুদয় একসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করা যাইবে]

৭। তান্ কোয়াং

ইনি সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ক্রমে তিনি হরিকেল রাজ্যে উপস্থিত হন। হরিকেল (হো-লি-কি

---

(১৩) মগধের পরবর্ত্তী-গুপ্ত বংশীয় সম্রাট।

(১৪) সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্রাটগণের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত।

(১৫) এটি একটি বিশেষ মূল্যবান তথ্য। সংকাও চীন দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান হইতে ইউনান প্রদেশের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে যাইবার পথ ছিল। ভারতবর্ষ হইতে চীনে যাতায়াতের যত পথ আছে তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু নানা অসভ্য জাতির বাস-হেতু এই পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল ছিল। ফা-হিয়ানের ভারত আগমনেরও শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও এই পথ দিয়া চীন দেশবাসীরা ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও যে এই পথ ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সময়ান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

লোহিত্য) পূর্ব্ব ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমানায় অবস্থিত (১৬)। হরিকেল হইতে যাওয়ার পর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ নদী-গর্ভে অথবা পর্ব্বত-গহ্বরে তাহার প্রাণবিসর্জ্জন হইয়াছে।

৮। হরিকেল দেশীয় একজন ভিক্ষু আমাকে একজন চীনদেশীয় ভিক্ষুর সংবাদ নিবেদন করিল; "এই ভিক্ষুর বয়স পঞ্চাশের উপর। রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তিনি একটি বিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি বহু ধর্ম্ম-পুস্তক ও দেবমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিকেলেই অসুস্থ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

৯। সেং-চি

ইনি সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া প্রথমে সমতট রাজ্যে উপনীত হন। এই রাজ্যের রাজার নাম হো-লু-চে পো-চ (হর্ষভট অথবা রাজভট)। তিনি ত্রিরত্নের একজন ভক্ত ও পরম উপাসক। প্রতিদিন তিনি মাটি দিয়া লক্ষ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র হইতে লক্ষ শ্লোক পাঠ করেন এবং লক্ষ ফুল দান করেন। এই সমুদয় দ্রব্যাদি রাশীকৃত করিলে মানুষের সমান উচ্চ বোঝা হয়। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এইগুলি দান করেন। রাজা যখন দল বল সহ যাত্রা করেন তখন অগ্রভাগে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি নেওয়া হয়, ধ্বজ ও পতাকায় সূর্য্যের কিরণ ঢাকিয়া যায় এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হয়। বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি সহ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রাবকের দল সর্ব্বপ্রথমে যাত্রা করে, পশ্চাৎ রাজা স্বয়ং যাত্রা করেন।

রাজধানীতে চারি সহস্রেরও অধিক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আছে। ইহাদের সকলের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার রাজা নির্ব্বাহ করেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাজদূত প্রত্যেক ভিক্ষুর বাসস্থলের নিকট যাইয়া যুক্ত করে নিবেদন করে "মহারাজ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন রাত্রিতে আপনাদের সুনিদ্রা হইয়াছে কিনা।" ভিক্ষুগণ উত্তর করেন "আমরা প্রার্থনা করি মহারাজ নিরাময় ও দীর্ঘজীবি হউন এবং তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করুক।" রাজদূতেরা ফিরিয়া আসিয়া এই সমুদয় রাজার নিকট নিবেদন করিলে তবে রাজকার্য্য আরম্ভ হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে যে সমুদয় শাস্ত্রবিৎ প্রজ্ঞাবান ও ধর্ম্মশীল ভিক্ষু আছেন তাঁহারা সকলেই এই রাজ্যে একত্রিত হন। কারণ রাজার দানশীলতার খ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সেং-চি এই রাজার মন্দিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১০। প্রজ্ঞাদেব (উ হিং)

ইনি সমুদ্রপথে সুমাত্রা ও মলয় উপদ্বীপ হইয়া ন-কিয়া-পো-তন্ ন (নেগাপটম্) দেশে উপনীত হন। সেখান হইতে জলপথে দুই দিনে সিংহলে পৌছেন। সেখান হইতে সমুদ্র পথে একমাসে হরিকেলে উপস্থিত হন। হরিকেল পূর্ব্ব ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত এবং জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত।

এখানে এক বৎসর থাকিয়া তিনি আর একজন চীনদেশীয় ভিক্ষুসহ নালন্দা গমন করেন। নালন্দা হরিকেল হইতে ১০০ যোজন দূরে। তৎপর তাঁহারা মহাবোধি বিহারে গমন করেন। রাজা তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন এবং উভয়কেই বিহারস্বামীর পদ দান করেন। পশ্চিম দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) বিহার স্বামীর সংখ্যা অতিশয় অল্প এবং এই পদ পাওয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য। যাঁহারা এই পদের অধিকারী তাঁহারাই কেবল সংঘের যাবতীয় দ্রব্যের সত্ত্বাধিকারী। অন্য সকলের কেবল ভরণ পোষণ পাইবার দাবী। তৎপর তাঁহারা নালন্দ ও তিলাঢ়ক (১৭) বিহারে গমন করেন। নানা বৌদ্ধশাস্ত্র ব্যতীত তিনি যোগশাস্ত্র, কোষশাস্ত্র ও হেতুবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। নালন্দায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

(১৬) চীনদেশীয় মানচিত্র অনুসারে হরিকেল, তাম্রলিপ্তি ও উৎকল এই দুই দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কিন্তু ইৎসিংএর বিবরণ অনুসারে ইহা পূর্ব্ববঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান হয়।

(১৭) কানিংহামের মতে ফল্গু নদীর তীরবর্ত্তী তিলাড়া গ্রাম। এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ হুয়েন সাংয়ের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ভারতে যৌন-সম্বন্ধ।

১। বৈবাহিক-সম্বন্ধ। (২)

আদিম এবং অসভ্য মানব চুরি ডাকাতী অথবা ছল বল কৌশলাদির সাহায্যে পরের পশু অথবা শস্যাদি আহরণের ন্যায় স্ত্রী সংগ্রহও করিত। লর্ড এভিবেরী (সার জন লবক) তাঁহার "সভ্যতার মূল" (*Origin of Civilisation*) নামক পুস্তকে অসভ্য-সমাজ প্রচলিত স্ত্রী সংগ্রহের অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন আর্য্য-সমাজের আচারের যে চিত্র স্মৃতিশাস্ত্র সমূহে পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয় যে এখানেও অতীতযুগে ছল বল কৌশলাদির সাহায্যেই মানবকে স্ত্রী-সংগ্রহ করিতে হইত। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি এবং তদনুগামী পুরাণ শাস্ত্রে বর্ণিত আট প্রকার বিবাহ-ব্যবস্থার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং গর্হিত "পৈশাচ" বিবাহের লক্ষণ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহাতে কন্যার পিতামাতার সম্মান অথবা তাহার নিজের মর্য্যাদার বিচার কিছুই নাই। যে কোনও উপায়ে কোনও অনূঢ়া কন্যার কৌমার্য হরণ করিতে পারিলেই কার্য সিদ্ধি হইত; অন্য কোনরূপ বিচার অথবা বিবেচনার আবশ্যকতা ছিল না। অসভ্য সমাজে নারী নরের মতই কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করিত এবং অবকাশ সময়ে নরের মতই উগ্র সুরা অথবা মদ্যপান করিয়া নৃত্যগীতাদিতে যোগদান করিত; সুতরাং পরিশ্রমের আতিশয্য বশতঃ গাঢ় নিদ্রায় অচেতন অথবা মদ্যপানে বিহ্বল বা অজ্ঞান হওয়া সেকালের নারীর পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক এবং সাধারণ ছিল। কোনও নির্জ্জন লতাকুঞ্জে এরূপ অসহায় অবস্থায় পতিত কোনও যুবতীর কৌমার্য হরণ করা সেই অসভ্য সমাজের যুবকেরা আদৌ দোষের বিষয় মনে করিত না; সুতরাং সুবিধা পাইলে এই উপায়েই তাহারা স্ত্রী সংগ্রহ করিত। এইরূপে কোন নারীর একবার আয়ত্ত করিতে পারিলেই অগত্যা সেই নারী তাহার ধর্ষণকারীকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। এখনও যে ভারতের অসভ্য-মানব-সমাজে এইরূপে স্ত্রী-সংগ্রহের ব্যবস্থা নাই, তাহা বলা যায় না। আর্য-সামাজিক-গণ ক্রমশঃ সুসভ্য হইয়া এই জঘন্য "পৈশাচ-বিবাহ" পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মনু মহারাজ এই ঘৃণিত পৈশা-চিক আচারকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র) কোনও শ্রেণীর আর্যেরই উপযুক্ত বলেন নাই (১)। তাঁহার মতে (আর্য এবং অনার্য) শূদ্রের পক্ষেও এই গর্হিত "পৈশাচ-বিবাহ" অকর্ত্তব্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে (২)। পৌরাণিক ঐতিহ্যের সংবাদ লইলে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বে শূদ্র-বর্ণের পক্ষে এই "পৈশাচ বিবাহ"ই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত (৩)। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আচার যে আর্য্য-সমাজ হইতে শীঘ্রই বিদূরিত হইয়াছিল, তাহা মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের আদেশ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়।—

---

(১) সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহোযত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥৩৪॥
মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

(২) পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন ॥২৫॥
মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

(৩) চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যাস্তথা গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ।
রাজ্ঞস্তথাসুরো বৈশ্যে শূদ্রে চান্ত্যস্তু গর্হিতঃ ॥২১॥
গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৯৫ অধ্যায়।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট রকম বিবাহের মধ্যে প্রথম চারি রকম (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য) ব্রাহ্মণের, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই দুই প্রকার ক্ষত্রিয়ের, আসুর (এই এক রকম) বৈশ্যের এবং অন্ত্য ও গর্হিত পৈশাচ বিবাহ শূদ্রের পক্ষে বিহিত। গরুড় পুরাণ এই শ্লোক যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির নামোল্লেখ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন; পরন্তু মুদ্রিত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আমরা এই শ্লোকটি পাই নাই। "দানসাগর" গ্রন্থে "যোগিযাজ্ঞবল্ক্য" নামে আরও একখানি স্মৃতির উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্লোক কোন যাজ্ঞবল্ক্যের, তাহা সন্দেহের।

প্রকাশ্য বল প্রয়োগ পূর্ব্বক, কন্যার পিতা ভ্রাতা-প্রমুখ আত্মীয়গণকে আহত বধ ও বন্ধন করত গৃহভেদ পূর্ব্বক রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ করিয়া (অর্থাৎ ডাকাইতি করিয়া) আনিয়া বিবাহ করার প্রথাকে আর্য সামাজিকেরা "রাক্ষস-বিবাহ" নাম দিয়াছিলেন (৪)। এইরূপ স্ত্রী-সংগ্রহ যে প্রকৃতই রাক্ষসাচার, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে আর্যসমাজে বাহুবলই একমাত্র বল ছিল, আইন আদালতের সহায়তা তখনও বদ্ধমূল হয় নাই। "বীরভোগ্যা-বসুন্ধরা" মহর্ষি পরাশরের এই বাণী এখনও জগতের সভাসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাজে সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পরেও রূপসী নারীর জন্য যুদ্ধবিগ্রহ সকল দেশেই প্রাচীন কালে ঘটিয়াছে। মিসর, গ্রীস অথবা ভারতখণ্ড প্রভৃতি যে কোনও প্রাচীন সুসভ্য সমাজের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করিলে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। মনুসংহিতা এই "রাক্ষস বিবাহ" কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়-বর্ণের জন্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন (৫)। পৌরাণিক সাহিত্য হইতেও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বাহুবলের উপাসক ক্ষত্রিয় জাতিই এইরূপ বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। মহাভারতের মহাপুরুষ সর্ব্বজ্ঞকল্প ভীষ্মদেব এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই নিজ নিজ বাক্য এবং কার্য্যদ্বারা এই রাক্ষস-বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন। কাশিরাজ কন্যা-ত্রয়ের স্বয়ংবর সভায় ভীষ্মদেব যে উপায়ে অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকা নাম্নী কন্যা তিনটিকে নিজ বৈমাত্রেয় বিচিত্রবীর্যের জন্য আহরণ করিয়াছিলেন, উহা অবিমিশ্র রাক্ষস-বিবাহের দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীহরণ ব্যাপারে স্বয়ং এবং সুভদ্রা-হরণ বিষয়ে অর্জ্জুনের দ্বারা এই রাক্ষসাচার রক্ষা করিয়াছিলেন; তবে এই দুইটি বিবাহেই গান্ধর্ব্ব বিবাহের সংস্পর্শ ছিল। রুক্মিনী দেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবং সুভদ্রা দেবী অর্জ্জুনের প্রতি অনুরাগবতী ছিলেন; কিন্তু উভয়েরই অভিভাবকদিগের সম্পূর্ণ অনভিমতে এবং তাঁহাদিগকে নিগ্রহ করিয়াই উভয়েই কন্যা হরণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সময়ে দিল্লীপতি চৌহান পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক কনৌজ-রাজকন্যা সংযুক্তা দেবীর হরণ-ব্যাপারও গান্ধর্ব্ব-সম্পৃক্ত-রাক্ষস-বিবাহের উত্তম উদাহরণ। প্রাচীন-ভারতের ক্ষত্রিয়-বীরপুরুষগণ এই রাক্ষস-বিবাহকেই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান-জনক বিবেচনা করিতেন, তাহা মহাভারতের ঋষিবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় (৬)। আধুনিক ইংরেজী আইন-শাসিত সমাজে সেকালের "রাক্ষস" এবং "পৈশাচ" এই দুই বিবাহই গুরুতর অপরাধী-রূপে গণ্য হওয়ায় ইহারা যে এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কন্যার অভিভাবকগণকে অথবা কন্যাকেই ধনপ্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করত কন্যা-গ্রহণ ও বিবাহ করাকে

---

(৪) হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥৩৩॥
মনুসংহিতা, তৃতীয়-অধ্যায়।

(৫) "রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকং" ২৪শ শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায়, মনুসংহিতা।

(৬) যাদবদিগের রাজধানীতে অতিথিরূপে সমাদৃত অর্জ্জুন তৎপ্রতি অনুরাগিনী সুভদ্রা দেবীকে সহসা রক্ষক-দিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক রথে তুলিয়া প্রস্থান করিলে বলদেব প্রমুখ যাদববীরগণ বিশেষ অবমানিত বোধ করত অর্জ্জুনের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "অর্জ্জুন এই ব্যবহারের দ্বারা যদুকুলের কোনরূপ অবমাননা করেন নাই; পশুর মত কন্যাকে দান করা কোন্ ভদ্রলোক অনুমোদন করিতে পারেন? আর কোন্ ধার্ম্মিক পুরুষ কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকেন? এই সকল কার্য্যের দোষ জানিয়াই কৌন্তেয় অর্জ্জুন ধর্ম্মানুগত 'বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ' করিয়াছেন। এক্ষণে সকলে সান্ত্বনা ও সম্মানের সহিত অর্জ্জুনকে আহ্বান করত সুভদ্রাকে সমর্পণ কর ইত্যাদি। আদিপর্ব্ব, ২২১ অধ্যায়।

"আসুর-বিবাহ" বলিয়া আর্যশাস্ত্রকারগণ পরিচিত করিয়াছেন (৭)। মহাভারতে ভীষ্ম এই বিবাহকে স্পষ্টভাবেই "অসুরদিগের ধর্ম্ম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন অসুরদেশে (কালডিয়া, বাবেলোনিয়া এবং এসিরীয়ায়) বিবাহ উপলক্ষে কন্যার বিক্রয় হইত বলিয়া য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন (৮)। মনুসংহিতা প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্র কন্যা বিক্রয়ের (পুত্র কন্যা উভয়ের বিক্রয়ই অপত্য বিক্রয়) যথেষ্ট নিন্দা করিয়া কন্যা ক্রয়মূলক "আসুর-বিবাহ" কেবলমাত্র বৈশ্যবর্ণের উপযুক্ত এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আদৌ কর্ত্তব্য নহে বলিয়া স্পষ্টভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন (৯)। ভারতখণ্ডের প্রাচীন ক্ষত্রিয় গণের মধ্যে এই বিক্রয় মূলক বিবাহের প্রচলন খুব অল্পই ছিল বলিয়া বোধ হয়। যাদব-ক্ষত্রিয়-গণের আচার অনেকটা হীন হইলেও তাঁহারা যে ধন লোভে কন্যা-বিক্রয় করিতেন না, তাহার আভাস পাওয়া যায় (১০)। প্রাচীন ক্ষত্রিয়-গণের মধ্যে মদ্রগণ বিবাহোপলক্ষে কন্যাপণ গ্রহণ করিতেন বলিয়া মহাভারতকার লিখিয়া গিয়াছেন। মহাবীর ভীষ্মদেব তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুরাজার বিবাহের জন্য মদ্ররাজ শল্যের নিকট তাঁহার ভগিনী মাদ্রীদেবীকে প্রার্থনা করিলে শল্যরাজ এই কুলাচারের উল্লেখ করেন এবং ভীষ্মদেবও এই কুলাচার স্বীকার করত বহু সুবর্ণ-হয়-হস্তী শল্যরাজকে (তাঁহার কুলমর্য্যাদা স্বরূপ?) প্রদান করিয়া মাদ্রী দেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন (১১)। আমাদের মনে হয়, এই পৌরাণিক মদ্র দেশ প্রাচীন এসিরিয়া দেশের উত্তরাংশ (গ্রীক মিডিয়া) অবস্থিত ছিল এবং এই মদ্রদেশে নরনারীর মধ্যে প্রকাশ্যভাবে সুরাপান, গোমাংস ও লশুনাদি ভক্ষণ প্রচলিত ছিল (১২)। মদ্রগণের আচার যেরূপই হউক, ভারতখণ্ডের কৌরব-যাদবাদি ক্ষত্রিয়-গণের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ চিরকাল অব্যাহত ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। "অসুরদিগের আচার" বলিয়া অভিহিতই হউক, অথবা "ক্রয়-বিক্রয় মূলক" বলিয়া নিন্দিতই হউক, এই "আসুর বিবাহ"ই প্রাচীন আর্য সমাজে ধনবান্ বৈশ্যবর্ণের প্রধান অবলম্বন ছিল,— এবং অবস্থাবিশেষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণেও ইহা প্রচলিত ছিল। এই বিবাহ-প্রথার মূলে মানুষের ধন-লোভ বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং শাস্ত্র যাহাই বলুন, সুবিধা পাইলে অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই আধুনিক পুত্র-পণ গ্রহণের মত যে কন্যা বিক্রয় করিতেন, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

(৭) জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরোধর্ম্ম উচ্যতে ॥৩১॥
তৃতীয় অধ্যায়, মনুসংহিতা।

ধনেন বহুধা ক্রীত্বা সংপ্রলোভ্য চ বান্ধবান্।
অসুরাণাং নৃপৈতং বৈ ধর্ম্মমাহুর্মনীষিণঃ ॥৭॥
৪৫ অধ্যায়, অনুশাসন পর্ব্ব, ভীষ্মবাক্য।

(৮) "The marriage contract amounted in fact, to a formal deed of sale, and the parents of the girl parted with her only in exchange for a proportionate gift from the bride-groom etc etc. "Prof. Maspero's *The Dawn of Civilisation*, pages 734—749. মুসলমানদিগের বিবাহেও কন্যাপণ বা "দেনমোহর" অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

(৯) ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥৫১॥
মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি।
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুল্কেন প্রযচ্ছতি ॥১৮॥
সপ্তাবরে মহাঘোরে নিরয়ে কালসাহ্বয়ে।
স্বেদং মূত্রং পুরীষং চ তস্মিন্ মূঢ়ঃ সমশ্নুতে ॥১৯॥
(যমগাথা) মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৫ অধ্যায়।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন ॥২৫॥
মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

(১০) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, হরণাহরণ পর্ব্বাধ্যায়, ২২১ অধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ বাক্য।

(১১) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১১৩ অধ্যায়।

(১২) মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৪৬ অধ্যায় (বোম্বাই সংস্করণ); ৪৫ অধ্যায় ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

সমাজের উন্নত স্তরে ছল বল অথবা ক্রয় বিক্রয় দ্বারা স্ত্রী সংগ্রহের আচার নিন্দিত এবং পরিত্যক্ত হইলে ক্রমশঃ বিবাহ প্রথা উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। সুসভ্য ক্ষত্রিয় বর্গের মধ্যে যুবক-যুবতীর পরস্পর মনোনয়ন দ্বারা পতি পত্নী নির্ব্বাচন এবং তন্মূলক বিবাহ প্রথার প্রবর্ত্তন হইল। সম্ভবতঃ হিমালয় সন্নিহিত গন্ধর্ব্বদেশে (গান্ধার?) ইহার প্রথম উদ্ভব হওয়ায় ইহার নাম "গান্ধর্ব্ব-বিবাহ" হইয়াছে (১৩)। সুবিখ্যাত দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিবাহ এই "গান্ধর্ব্ব-বিবাহের" প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মহাভারত-কার ভীষ্মদেবের মুখ দিয়া এই বিবাহের বিস্তর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে শিষ্ট ক্ষত্রিয়-গণের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। তাঁহার মত এইরূপ ;—

"কন্যার কোন অভিভাবক যদি নিজের পছন্দমত কোনও পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন, অথচ সেই পাত্র কন্যার মনোহভিমত না হয়, এবং কন্যা পৃথক কোনও ব্যক্তিকে পছন্দ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অভিভাবক নিজের নির্ব্বাচিত বরকে পরিত্যাগ করিয়া কন্যার অভিপ্রেত পাত্রকেই (এবং সেই পাত্রও যদি সেই কন্যার অভিলাষী হইয়া থাকে) কন্যা সম্প্রদান করিবেন (১৪)।" কন্যা ও বর পরস্পর পরস্পরকে মনে মনে নির্ব্বাচন করিয়া যদি গোপনে, (অর্থাৎ পিতামাতা অথবা অভিভাবকগণের সম্মতি না লইয়াই) বিবাহিত হন, তাহা হইলে সেই বিবাহকে "গান্ধর্ব্ব", আর এইরূপ পরস্পরের মনোনয়নের পর অভি-ভাবকগণের সম্মতি লইয়া বিবাহিত হইলে সেই বিবাহকে "প্রাজাপত্য" বিবাহ বলে। কন্যার অভিভাবক বর-কন্যা উভয়কে "তোমরা উভয়ে একত্র হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতি-পালন কর" এইরূপ উপদেশ দিয়া যে বিবাহ দেন, তাহাই "প্রাজাপত্য বিবাহ" (১৫)। এই গান্ধর্ব্ব-বিবাহ ও প্রাজাপত্য বিবাহ বর-কন্যা উভয়েরই পূর্ণ যৌবনে অনুষ্ঠিত হইত।

ধনবান্ বৈশ্যেরা ধনদান পূর্ব্বক কন্যা অথবা তাহার অভিভাবকগণকে প্রলুব্ধ করত যে স্ত্রী সংগ্রহ করিতেন, তাহাকে "আসুর বিবাহ" বলিত, তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রাচীন ঋষিগণের স্বর্ণ রজতাদি ধনের অভাব থাকিলেও "গোধন' অর্থাৎ গোরু অনেক ছিল; তাই, এক যোড়া অথবা দুই যোড়া গোরু বরের নিকট ধর্ম্মতঃ (পীড়ন করিয়া নহে) লইয়া ঋষিরা কন্যা দান করিতেন। এই বিবাহের নাম ছিল "আর্ষ" বিবাহ (১৬)। এই বিবাহ বনবাসী ঋষি সমাজে প্রচলিত হওয়ায় উহার নাম "আর্ষ" হইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ গোরু লওয়ার প্রথাকেও একরূপ শুল্ক গ্রহণ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; আবার কাহারও মতে ইহা আদৌ নিন্দার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। (১৬)

বৈদিক যাগযজ্ঞের বহু প্রচলন কালে ঋত্বিক্ (অথবা পুরোহিত) তাঁহার যজমানের নিকট হইতে প্রচুর ধন-রত্ন গাভী-গ্রাম ইত্যাদি দক্ষিণা স্বরূপে প্রাপ্ত হইতেন। কোন কোনও নিষ্ঠাবান্ যজমান যজ্ঞশেষে যজ্ঞ কর্ম্মঠ ঋত্বিককে অলংকৃতা কন্যা-দান করিয়া দক্ষিণা সম্পূর্ণ করিতেন; এই বিবাহকে আর্যশাস্ত্রকারগণ "দৈব-বিবাহ" বলিয়া-

(১৩) ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥৩২॥
মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

(১৪) শিষ্টানাং ক্ষত্রিয়াণাং চ ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ।
আত্মাভিপ্রেতমুৎসৃজ্য কন্যাভিপ্রেত এব যঃ ॥৫॥
অভিপ্রেতা চ যা যস্য তস্মৈ দেয়া যুধিষ্ঠির।
গান্ধর্ব্বমিতি তং ধর্ম্মং প্রাহুর্বেদবিদোজনাঃ ॥৬॥
মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়।

(১৫) সহোভৌ চরতং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৩০॥
মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

(১৬) একং গো মিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥২৯॥
ঐ, ঐ, ৫৩-৫৪ শ্লোক, ঐ, ঐ।

ছেন (১৭)। সেকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজবর্ণই বৈদিক যজ্ঞের যজমান্ এবং ঋত্বিক্ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণই হইতেন; সুতরাং দৈব বিবাহের বর ব্রাহ্মণ এবং কন্যা যে কোনও দ্বিজবর্ণের হইতে পারিতেন।

বেদ-বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং সচ্চরিত্র অপ্রার্থক বরকে কন্যার অভিভাবক সসম্মান আহ্বান করত বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা অর্চনা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলে, সেই বিবাহকে "ব্রাহ্ম" বিবাহ বলিত (১৮)। আর্যস্মৃতিশাস্ত্র এই বিবাহকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন এবং এই বিবাহে উৎপন্ন সুপুত্র বিবাহ কর্ত্তাকে তাঁহার ঊর্দ্ধতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষ সহিত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন (১৯)।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহের বর্ণনা করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন "যে প্রথম ছয় প্রকার (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব) ব্রাহ্মণের, শেষ চারিপ্রকার (আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ) ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে রাক্ষস ভিন্ন সেইরূপই (আসুর, গান্ধর্ব্ব ও ও পৈশাচ) জানিবে"। পণ্ডিতেরা বলেন, "ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চারিপ্রকার, (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য), ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র রাক্ষস এবং বৈশ্য শূদ্রের একমাত্র আসুর বিবাহই শ্রেষ্ঠ" (২০)। ইহার পরে বলা হইয়াছে "পৈশাচ ও আসুর" (দ্বিজগণের) কদাপি আচরনীয় নহে; আর অবিমিশ্র অথবা মিশ্রভাবে রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ ক্ষত্রিয় গণের পক্ষে ধর্ম্ম সঙ্গত" (২১)। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র, মহাভারত এবং মহাপুরাণ গ্রন্থাবলীর মত এ সম্বন্ধে প্রায়ই একরূপ (২২)।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে মদ্রদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজ গণের ভিতর কন্যা শুল্ক গ্রহণের আচার সুপ্রচলিত ছিল এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজকুলে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু ধনরত্নাদি শুল্কের পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে রাজ্যশুল্ক এবং বীর্য্যশুল্কেরও প্রচলন ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়-সমাজে সে কালে বহু বিবাহের অতি প্রচলন-নিবন্ধন কোন কোন কন্যার অভিভাবক (অথবা কন্যা নিজেই) কন্যাদানের পূর্ব্বে বরের নিকট রাজ্যশুল্কের (অর্থাৎ সেই কন্যার গর্ভস্থ পুত্রই রাজা হইবে এইরূপ) প্রতিজ্ঞা আদায় করিয়া লইতেন। রামায়ণে দেখা যায় যে কেকয়রাজ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া তবে দশরথের করে কেকয়ীকে

---

(১৭) যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলংকৃত্য সুতাদানং দৈবধর্ম্ম প্রচক্ষতে ॥২৮॥
ঐ, ঐ।

(১৮) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহুয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥
ঐ, ঐ।

(১৯) দশপূর্ব্বান্ পরান্‌বংশ্যানাত্মানং চৈকবিংশতিম্।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ সুকৃতকৃন্মোচয়েদেনসঃ পিতৄন্ ॥৩৭॥
ঐ, ঐ।

(২০) ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যানরাক্ষসান্ ॥২৩॥
চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥২৪॥
মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

(২১) পঞ্চানাং তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন ॥২৫॥
পৃথক্ পৃথগ্ বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব্বচোদিতৌ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ ॥২৬॥ ঐ, ঐ

(২২) যাজ্ঞবল্ক্য, আচারাধ্যায়, মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৩ম অধ্যায়, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়, বিষ্ণু মৎস্যাদি মহাপুরাণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

দান করিয়াছিলেন (২৩); এবং মহাভারতে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তকে এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া গান্ধর্ব-বিবাহে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন (২৪)। সীতা এবং দ্রৌপদীর সুবিখ্যাত স্বয়ংবর বীর্যশুল্কমূলক বিবাহের উত্তম দৃষ্টান্ত। অন্যান্য স্বয়ংবরে একতরফা (কন্যার দ্বারা নির্বাচিত) গান্ধর্ব এবং প্রাজাপত্য বিধানের মিশ্রণে বিবাহ হইত; কচিৎ বা (ভীষ্মকর্তৃক কাশিরাজ কন্যাত্রয়ের স্বয়ংবরে যেরূপ হইয়াছিল) রাক্ষস-বিধানেরও সম্মান রক্ষা হইত। সুভদ্রা দেবী এবং রুক্মিনী দেবীর বিবাহ (মধ্যযুগের কনৌজ রাজকন্যা সংযুক্তার বিবাহও বটে) গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিধানের মিশ্রণ মূলক বিবাহ হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে এইরূপ বিবাহই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে (২৫)। ফলতঃ ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ ভিন্ন স্বয়ংবর বিবাহে আর কাহারও অধিকার ছিল না।

প্রাচীন আর্যসমাজে প্রধানতঃ যৌবন-বিবাহই প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়; পরে সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের সমাজে বালিকা-বিবাহ উৎকৃষ্ট কল্প বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রকার গোভিল "নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" বলিয়াছেন এবং তাহার পুত্র (গোভিলপুত্র) পিতার সূত্রকে নানা যুক্তি সহায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঋক্, যজুঃ ও অথর্ববেদী কাহারও গৃহ্যসূত্রে এরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। আর ব্রাহ্মণ সমাজ ভিন্ন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-সমাজে যে অপ্রৌঢ়া বালিকা বিবাহের প্রচলন ছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পুরাতন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৈদিক গৃহ্যসূত্রগুলিও বিবাহের মন্ত্রাদি বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পাওয়া যায় যে যুবক যুবতীর বিবাহই সে কালে স্বাভাবিক এবং সাধারণ ছিল।

বিবাহ-বিধি সমাজে সুপ্রচলিত হওয়ার পর নারীর স্বেচ্ছাচার অথবা অনাবৃতত্ব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। একেবারেই অবশ্য সীতা সাবিত্রীর আদর্শ সমাজে স্থাপিত হইতে পারে নাই; এবং প্রথম প্রথম নারীর অনেকটা স্বাধীনতা সমাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষের পক্ষে একই সময়ে একাধিক নারীকে বিবাহ করার অধিকার প্রদত্ত হইলেও নারীকে স্পষ্টভাষায় যুগপৎ একাধিক স্বামী বা বরকে বিবাহ করার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। বেদের নাম করিয়া শাস্ত্রকার বলিলেন, "যজ্ঞকালে যেমন এক যূপে দুইটি রশনা (দড়ি) বাঁধা যায়, সেইরূপ এক ব্যক্তির একই কালে দুই জায়া থাকিতে পারে, কিন্তু যেমন একগাছি রশনা (দড়ি) দ্বারা দুইটি যূপ বাঁধা যায় না, তদ্রূপ এক নারী এক সময়ে দুই পতি গ্রহণ করিতে পারে না (২৬)।" মহাভারতের দ্রৌপদী-বিবাহ উপলক্ষে

---

(২৩) পুরাভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্ ॥৩॥
রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ (বঙ্গবাসী)
চিত্রকূট পর্ব্বতে ভরতের প্রতি রামের বাক্য।

(২৪) সত্যং মে প্রতিজানীহি যথা বক্ষ্যাম্যহং রহঃ।
ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেত্ত্বদনন্তরঃ ॥১৬॥
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
যদ্যেতদেবং দুষ্মন্ত অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া ॥১৭॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৩ অধ্যায় দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা বাক্য।

(২৫) মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ২৬ শ্লোক, (উপরি-ধৃত), মহাভারত আদিপর্ব্ব ৭৩ অধ্যায় ১৩শ ও অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়ের ৫।৬ (পূর্ব্বে ১৪ সংখ্যক টীকায় উদ্ধৃত) শ্লোক।

(২৬) যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত।
যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মা-
ন্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত ॥
মাধব পরাশরীয় ভাষ্যে এবং ৺বিদ্যাসাগর কৃত বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে ধৃত। আমাদের নিকট বৈদিক মন্ত্রের কোন সূচি না থাকায় এই মন্ত্রের আকরের উল্লেখ করিতে পারা গেল না।

যুধিষ্ঠির পঞ্চভ্রাতার মিলিয়া পঞ্চাল রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে মহারাজ দ্রুপদ বিস্মিত চিত্তে বলিয়াছিলেন, "এক ব্যক্তির বহু স্ত্রীর কথা শাস্ত্র-সম্মত ঘটে কিন্তু এক নারীর বহু পতিত্বের কথা ত বেদে নাই; তুমি ধর্ম্মবিৎ ও শুচি হইয়াও এরূপ লোক-বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পার না। এরূপ বুদ্ধি তোমার কোথা হইতে আসিল? (২৭)" টীকাকার শ্রীমন্ নীলকণ্ঠ এই স্থলে "এক নারীর এক সময়ে বহুপতি হইতে পারে না" (২৮) ইত্যাকার বেদবাক্য তুলিয়া ব্যাখ্যা মুখে বলিয়াছেন যে "যুগপৎ বহুপতিত্ব নিষেধ করা হইয়াছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পতি গ্রহণ (একজনের মৃত্যু অথবা ত্যাগের পর) নিষিদ্ধ হয় নাই" (২৮)। দ্রৌপদীর বিবাহের বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

নারীগণের এইরূপে যুগপৎ বহু-পতিকে বিবাহ করা (আইন মত) নিষিদ্ধ হইলেও ইচ্ছা অথবা সুবিধামত পুরুষান্তর-সংসর্গ একেবারে নিবারিত হয় নাই। দেবরগণের সহিত বিবাহিতা নারীর সম্পর্কের বিষয় মমতা-বৃহস্পতির উপাখ্যান হইতে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। দেবর ভিন্ন (অর্থাৎ নিঃসম্পর্কিত) পুরুষের সম্বন্ধে প্রাচীন আচারের পরিচয় বেদব্যাস পাণ্ডুরাজার মুখে যেরূপ দিয়াছেন তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বিবাহিতা নারীর যৌন-সম্পর্কও সেকালে অতিশয় শিথিল ছিল। কুন্তীদেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক পাণ্ডু রাজা বলিয়াছেন, "হে পতিব্রতে রাজকুমারি, নারীগণের পক্ষে ঋতুস্নানের পরই স্বামীকে অতিবর্ত্তন (স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সংসর্গ) করা উচিত নহে; অন্য আর সমস্ত কালেই কিন্তু নারী নিশ্চয়ই স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তিবৃন্দ এই আচারকে পুরাতন ধর্ম্ম বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন (২৯)"। সন্তানের পিতার সম্বন্ধে কোনওরূপ সংশয় না হয়, এই উদ্দেশ্যেই যে উক্ত নিয়ম হইয়াছিল; তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, এই আচারের মূলে যে অবাধ স্বেচ্ছাচার বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। প্রাচীন স্মৃতিকার অত্রি ঋষি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে নারীগণের আচার সমালোচনা বহির্ভূত। স্ত্রী কখনও পরপুরুষ সংসর্গে দূষিত হন না। পূর্ব্বকালে নারীকে সোম গন্ধর্ব্ব ও বহ্নি এই তিন দেব উপভোগ করেন, পরে ত মানুষ তাহাকে পায়, সুতরাং নারী কিছুতেই দূষিত হয় না। সোমের নিকট শৌচ, গন্ধর্ব্বের নিকট মিষ্টবাক্য এবং অগ্নির নিকট সর্ব্ববিষয়ে পবিত্রতা লাভ

(২৭) একস্য বহ্বো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ ॥২৭॥
ইত্যাদি। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৯৫ অধ্যায়।

(৮) "নৈকস্যা বহবঃ [illegible]" (মাধব-পরাশরীয়েও ধৃত হইয়াছে) এই শ্রুতির ভাষ্যে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "সহেতি যুগপদ্ বহু পতিত্ব নিষেধো বিহিতো পত্যু সময় ভেদেন"। দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠিরের উক্ত প্রস্তাবে একেবারে অসম্মত হইলে স্বয়ং ব্যাসদেব বহু যুক্তি প্রয়োগে কন্যার পিতা পঞ্চাল-রাজকে এই বিবাহে সম্মত করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত স্বয়ংবর ও বৈবাহিক পর্ব্ব দুইটি কৌতূহলী পাঠকের অনুসন্ধেয়।

(২৯) ঋতাবৃতৌ রাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্ত্তা পতিব্রতে ॥২৫॥
নাতিবর্ত্তব্য ইত্যেবং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ।
শেষেষ্বন্যেষু কালেষু স্বাতন্ত্র্যং স্ত্রী কিলার্হতি ॥২৬॥
ধর্ম্মমেব জনাঃ সন্তঃ পুরাণং পরিচক্ষতে।
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২২ অধ্যায়।

এই সব বক্তৃতা দ্বারাই পাণ্ডু রাজা কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিতে সম্মত করিয়াছিলেন। পাণ্ডু রাজার প্রথম প্রস্তাবে কুন্তীদেবী কানে আঙ্গুল দিয়া "ছি! ছি! তাও কি হয়!" এইরূপে একেবারে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে রাজা আপনাদের জন্ম বিবরণ ও অন্যান্য অনেক পুরাতন গল্প বলিয়া নারীগণের সতীত্ব যে convention মাত্র তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

করিয়াছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বকালেই পবিত্র (৩০)। মহর্ষি অত্রির এই মতের প্রতিধ্বনি প্রায় সকল স্মৃতিকারই কিছু কিছু করিয়াছেন। আধুনিক হিন্দুসমাজে ছলবল কৌশলাদি কারণে অথবা দৈবাৎ প্রমাদবশতঃ নারী (তিনি কুমারীই হউন, অথবা বিবাহিতা বা বিধবাই হউন) পরপুরুষ সংস্পৃষ্টা হইলে একেবারে পতিতা এবং পরিত্যাজ্যা হইয়া থাকেন,—কিন্তু প্রাচীন আর্য সমাজে এরূপ অনুদার ব্যবহার ছিল না। মনু এবং অত্রি প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক কলির ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তা মহর্ষি পরাশরও এ সম্বন্ধে অতি উদার নীতির প্রচার করিয়াছেন (৩১) পৌরাণিক আখ্যানেও দেখা যায় যে মোহ প্রযুক্তও কোন নারী পতির গৃহত্যাগ করিলে তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতেন। বিখ্যাত দেবগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক তারাদেবীর সাগ্রহে পুনর্গ্রহণ প্রায় সকল মহাপুরাণেই কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্দেবীভাগবতপুরাণের উপাখ্যানে চন্দ্রদেব দেবগুরুকে 'ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ" শাস্ত্রবাক্য তুলিয়া নিরস্ত করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায় (৩১ ক)।

(৩০) গোকুলে কন্দশালায়াং তৈল চক্রেক্ষু চক্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীনাং চ ব্যাধিতস্য চ॥ ১৮৮॥
ন স্ত্রীদুষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোহবেদ কর্ম্মণা।
নাপো মূত্র পুরীষাভ্যাং নাগ্নি র্দহতি কর্ম্মণা ॥১৮৯॥
পূর্ব্বং স্ত্রীয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ব্ববহ্নিভিঃ।
ভুঞ্জতে মানবাঃ পশ্চাৎ ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥১৯০॥
সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্বমেধ্যত্বং মেধ্যং বৈ যোষিতাং সদা ॥১৯১॥ অত্রিসংহিতা।

(৩১) অত্রিসংহিতা, ১৯১—১৯৪ শ্লোক, পরাশর সংহিতা, দশম অধ্যায়, ২৪-২৬ শ্লোক ইত্যাদি।

(৩১ক) স্বয়েবোদাহৃতং পূর্ব্বং ধর্ম্মশাস্ত্রমতং তথা।
ন স্ত্রী দুষ্যতিজারেন ন বিপ্রোহবেদকর্ম্মণা ॥২২॥
প্রথম স্কন্ধ, ১১শ অধ্যায়।

বিবাহিতা নারীর স্বামী স্বকীয় ভার্য্যার যথাবিহিত বৃত্তির ব্যবস্থা না করিয়া কোনও কার্য্যের জন্য দীর্ঘ প্রবাস-গমন করিলে বৃত্তির অভাব বশতঃ নারীর যে অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহার সংশয় নাই। প্রাচীন সমাজের আচার্য্য এই আপৎকালের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা একালের ভদ্রসমাজে একেবারেই অচল। সুপ্রাচীন বাসিষ্ঠ স্মৃতি এ সম্বন্ধে বলিতেছেন—যে নারীর স্বামী বিদেশে গিয়াছেন, যদি তিনি অকামা হন, তাহা হইলে পাঁচ বৎসর কাল বিধবার ন্যায় কাল যাপন করিবেন। (সকামা হইলে) সেই নারী পুত্রকন্যার জননী হইলেও বর্ণানুসারে (ব্রাহ্মণের পক্ষে পাঁচ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে চারি, বৈশ্যের পক্ষে তিন এবং শূদ্রের পক্ষে দুই) যথাক্রমে পাঁচ, চারি, তিন ও দুই বৎসর অপেক্ষা করিবে; তৎপরে সমানোদক, সপিণ্ড, সগোত্র প্রবর, সকুল্য ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভাবে পর পর পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিবে (৩২) মনু মহারাজ এবং নারদ ঋষিও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন; তবে তাঁহাদের মতে প্রবাসী স্বামীর প্রবাস বাসের উদ্দেশ্যের ভেদ বশতঃ স্ত্রীর অপেক্ষারও তারতম্য ঘটিবে মনুর মতে ধর্ম্মকার্য্যার্থী প্রবাসী স্বামীর পুনরাগমন জন্য আট বৎসর, বিদ্যার্থীর জন্য ছয় বৎসর, যশঃ অর্থ অথবা অন্য কোন কামনার উদ্দেশ্যে প্রবাসীর জন্য তিন বৎসর অপেক্ষা করা উচিত (৩৩)। এইরূপে প্রবাসী স্বামীর ভার্য্যা

(৩২) প্রোষিতপত্নী পঞ্চবর্ষা প্রবসেদ্ যদ্যকামা যথা প্রেতস্য এবঞ্চ বর্ত্তিতব্যং স্যাৎ—এবং পঞ্চ ব্রাহ্মনী প্রজাতা চত্বারি রাজন্যাপ্রজাতা ত্রীণি বৈশ্যাপ্রজাতা দ্বেশূদ্রাপ্রজাতা অতউর্দ্ধ্বং সমানোদকপিণ্ডজন্মর্ষিগোত্রাণাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গরীয়ান্ ন খলু কুলীনে বিদ্যমানে পরগামিনী স্যাৎ॥ বসিষ্ঠ-ধর্ম্মশাস্ত্র, সপ্তদশ অধ্যায়।

(৩৩) প্রোষিতো ধর্ম্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড়্ যশোহর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্ ॥৭৬॥ মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়।

নারদ-সংহিতা, ১২শ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে প্রজাতা এবং অপ্রজাতা বিবাহিতা নারীর (চারি বর্ণেরই) প্রবাসী স্বামীর জন্য অপেক্ষা এবং তৎপরে অন্যপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ সম্বন্ধে বিস্তারিত এবং সুস্পষ্ট-উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বামীর পুত্রোৎপাদনের জন্য আবশ্যক বোধ করিলে পর-পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করত বাস করিতেন এবং স্বামী যথাকালে গৃহে ফিরিয়া আসিলে পুনরায় ভর্ত্তৃগৃহে গমন করিতেন। সে কালের সমাজ নারীর এরূপ আচার অনুমোদন করিতেন সন্দেহ নাই (৩৪) বর্ত্তমানকালে ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে সমাজের নিম্নস্তরে এই প্রকার আচার বিদ্যমান আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন সমাজে যে বিধবা বিবাহের যথেষ্ট প্রচার ছিল, স্বামীপরিত্যক্তা নারীও স্বচ্ছন্দে অপর স্বামী কর্ত্তৃক পরিণীতা হইতেন, তাহা ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচারিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব হইতে সকলেই অবগত হইয়াছেন। অক্ষত যোনি বালবিধবার পুনঃসংস্কারত মনু, যাজ্ঞবল্ক্য এবং বশিষ্ঠাদি সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রকারই অনুমোদন করিয়াছেন (৩৪); অন্যবিধ বিধবা ও পতি-পরিত্যক্তা নারীরও পুন বিবাহ-বিধান যে শাস্ত্র বিহিত এবং সুপ্রচলিত ছিল, তাহা ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় সুষ্ঠুরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। বৈদিক কাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় "দিধিষু" বিধবা বিবাহকারী অথবা দুইবার বিবাহিতা নারীর দ্বিতীয় স্বামী "পরপূর্ব্বা" (যে নারীর আর একবার বিবাহ হইয়াছিল) এবং পৌনর্ভব (দ্বিতীয়বার বিবাহিতা নারীর পুত্র) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ ও প্রচলন হইতে এবংপ্রকার সম্বন্ধ যে সমাজানুমোদিত ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজগণের বিবাহিতা মহিষী ভিন্ন আরও অনেক "দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী" থাকিত। কোষ-কার অমর সিংহ এরূপ নারীদিগকে "ভোগিনী" বলিয়াছেন (৩৫)। সেকালের রাজারা নিজ নিজ কন্যার বিবাহ দিবার সময় জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ বহুসংখ্যক কন্যা উপহার দিতেন। রামায়ণের একপত্নীব্রত রামচন্দ্র ও সীতা দেবীকে বিবাহ করিবার সময় বহুসংখ্যক কন্যা উপহার পাইয়া ছিলেন, এবং তাঁহারা তাহার অন্তঃপুরের শোভা বর্দ্ধন করিতেন (৩৬)। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এবং শাক্য রাজকুমার গৌতমের এরূপ শ্রেণীর স্ত্রীর সংখ্যা গণনা করাই দুষ্কর। প্রাচীন ভারতবর্ষের পারসীক, অসুর এবং মিশ্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশের রাজন্যবর্গও এ সম্বন্ধে খুব উদার ছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায়। যযাতি হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের রাজপুত জাতির রাজা মহারাজ সকলেই প্রায় শত শত সীমন্তিনী পরিবেষ্টিত হইয়া কালযাপন করিতেন। যৌতুক উপলক্ষে উপহার ভিন্ন আরও নানারূপ উপায়ে সে কালের নৃপতিগণ নারীরত্ন আহরণ করিতেন। মিসরের ফারোয়াগণ, য়ুদীয় সলোমন প্রমুখ নৃপতি সমূহ, অসুর দেশের রাজগণ অথবা

(৩৬) অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু।
গবাং শত সহস্রাণি বহুনি মিথিলেশ্বরঃ ॥৩॥
দদৌ কন্যা শতং তাসাং দাসী দাস মনুত্তমম্।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ ॥৫॥ রামায়ণ,
আদিকাণ্ড, ৭৪তম সর্গ। (বঙ্গবাসী) এই শত
শত কন্যা দাসী স্বরূপে উপহার প্রদত্ত হন নাই;
তাঁহারা একশ্রেণীর স্ত্রীস্বরূপেই প্রদত্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন কালে, মধ্যযুগে এমন কি একালেও প্রায় সমুদয় স্বাধীন ও অর্দ্ধ স্বাধীন নরপতি বংশে উপ বিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইংরাজেরা এইরূপে Left-handed marriage নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের এবং ভরতেরও যে একাধিক স্ত্রী ছিলেন, তাহা মন্থরার বাক্য হইতেও বুঝিতে পারা যায় যথা—রামাভিষেকারম্ভ সময়ে কৈকেয়ীর প্রতি মন্থরার বাক্য"

পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি ॥১১॥
হৃষ্টাঃ খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অপ্রহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরত ক্ষয়ে ॥১২॥
অযোধ্যা কাণ্ড, ৮ম সর্গ। (বঙ্গবাসী)

(৩৪) মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়, ৯৭, ১৭৬ শ্লোক, বসিষ্ঠ সংহিতা, সপ্তদশ অধ্যায়, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, আচারাধ্যায় ৬৭ শ্লোক বিষ্ণুস্মৃতি ১৫ অধ্যায় ইত্যাদি। পরাশর ও নারদ অক্ষপ্রকার বিধবা বিবাহেরও স্পষ্ট বিধান বিধি বদ্ধ করিয়াছেন (পরাশর ৪র্থ ও নারদ ১২শ অধ্যায়)।

(৩৫) কৃতাভিষেকা মহিষী ভোগিন্যোহন্যা নৃপস্ত্রিয়ঃ।

মধ্যযুগের মুঘল বাদসাহগণের রাণীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা প্রাচীন ক্ষত্রিয়-রাজবৃন্দের রাণীদিগের সংখ্যা ন্যূন ছিল না। এই সকল নারী রাজার কৃতাভিষেকা মহিষীর সম্মান লাভে বঞ্চিত থাকিলেও তাঁহাদের সম্বন্ধ সমাজানুমোদিত ছিল এবং মহিষীর পুত্র না হইলে এরূপ রাণীর পুত্রেরা অবাধে পিতৃ সিংহাসন লাভ করিতেন।

রাজার পুত্রেরাও (বিবাহ উপলক্ষ ব্যতীত) সময়ে সময়ে উপহার স্বরূপ কন্যারত্ন পাইতেন বলিয়া বোধ হয়। বিখ্যাত কবি বান ভট্টের কথা গ্রন্থ কাদম্বরীর নায়ক কুমার চন্দ্রাপীড়কে তাঁহার জননী কুলুত দেশীয় রাজ কন্যা পত্রলেখাকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া ছিলেন। কুমার চন্দ্রাপীড়কে শাপগ্রস্ত চন্দ্রের এবং পত্রলেখাকে তৎপত্নী রোহিনীর অবতার বলিয়া পরিচিত করিয়া কৌশলী কবি চন্দ্রাপীড়ও পত্রলেখার পরস্পর মধুর সম্বন্ধের রহস্য ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। রীতিমত বিবাহ সংস্কার ব্যতিরেকে রাজপুত্রদিগের এরূপ নারী সম্পর্ক সে কালের সমাজে দোষাবহ বিবেচিত হইলে কবি বানভট্ট তাঁহার কাব্যের নায়ক আদর্শ চরিত্র চন্দ্রাপীড়কে এরূপ সম্বন্ধে লিপ্ত করিতেন, বোধ হয় না।

বিবাহ-সম্বন্ধ সমাজে বদ্ধমূল হইবার পর কালক্রমে উহা দুশ্ছেদ্য বন্ধনে পরিণত হইয়াছিল। অন্যান্য নানা সভ্যা সভ্য সমাজে যেরূপ আবশ্যক স্থলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইতে পারিত (এবং এখনও পারে) মনু শাসিত আর্য্য সমাজে সেরূপ হইত না। মনু মহারাজ সুস্পষ্ট বলিয়াছেন যে ত্যাগ দান অথবা বিক্রয়াদির দ্বারা পতি পত্নী-সম্বন্ধ ছিন্ন হইতে পারে না অতএব মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন কারণ বশতঃ পতি পত্নী পরস্পর পৃথক্ হইলে সেরূপ নারীর পুনর্বিবাহ নারদ ও পরাশর কথিত কয়েক স্থল ব্যতীত (৩৪) হইত বলিয়া বোধ হয় না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে ইচ্ছামত পতি বা পত্নী ত্যাগ এবং সেরূপ নরনারীর পুনঃ পুনঃ বিবাহ অন্যান্য দেশ বা সমাজের মত আর্য সমাজে সর্ব্বদা ঘটিত না।

মনু মহারাজ স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য সম্বন্ধের দৃঢ়তা সম্পাদন অভিপ্রায়ে বিবাহিত দম্পতী-কে একাত্মা, অভেদ এবং বিক্রয় অথবা পরিত্যাগ করিলেও সেই পবিত্র পতি-পত্নী সম্বন্ধ-ছিন্ন হইতে পারিবে না (৩৭) বলিয়া স্পষ্ট বিধান লিপিবদ্ধ করিলেও সমাজে এরূপ আদর্শ সম্বন্ধ সর্ব্বদা থাকিতে পারে না। তিনি দম্পতীর মধ্যে পরস্পর আমরণ প্রীতি প্রেমযুক্ত ব্যবহার, অবিচ্ছেদ ও অন্য স্ত্রী বা পুরুষ সংপর্ক দোষ বর্জন করিবার জন্য অতি সুন্দর নীতির প্রচার করিলেও (৩৮) সংসারে সময়ে সময়ে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যাভিচার, কলহ ও বিভ্রাট ঘটনা কখনই একেবারে নিরাকৃত হইবার নহে। নর নারীকে নীতির নিগড়ে নিয়মিত করিবার যেরূপ চেষ্টাই করা হউক, পরস্পরের প্রকৃতি, রুচি, শিক্ষা দীক্ষা এবং নানা প্রকার নৈমিত্তিক অবস্থা প্রভৃতি অসংখ্য কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভেদ হইবার সম্ভাবনা এবং সকল সমাজে অল্পই হউক আর অধিকই হউক এরূপ ভেদ হওয়া অনিবার্য। "স্বামী যদি কোনও কারণে স্ত্রীর মনোঽভিমত না হয়, এবং তজ্জন্য স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করতঃ পৃথক্ কালযাপন করে, (পুরুষান্তরের সম্পর্ক ব্যাতিরেকে-বলিয়াই অনুমিত হয়) তাহা হইলে স্বামী এক বৎসর কাল স্রেইরূপ দ্বেষকারিনী স্ত্রীর মত পরিবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিবেন (এবং মনোরঞ্জনের জন্য চেষ্টা করিবেন) ; যদি এক বৎসরেও তাঁহার রুচির পরিবর্ত্তন না হয় তাহাহইলে তাঁহার যৌতকধন কাড়িয়া লইতে ও তাহার সহিত একত্র বাস না করিতে স্বামীর অধিকার জন্মিবে। যদি কোন বিবাহিতা নারী তাঁহার উন্মত্ত, রোগী অথবা মদমত্ত

(৩৭) এতাবানেক পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্‌যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥৪৫॥
ন নিষ্ক্রয় বিসর্গাভ্যাং ভর্তুর্ভার্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানী মঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্মিতম্ ॥৪৬॥
মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়।

(৩৮) অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রী পুংসয়োঃ পরঃ ॥১০১॥
যথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রী-পুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্ ॥১০২॥
ঐ, ঐ।

(Drunkard) স্বামীকে অতিবর্ত্তন করেন, তবে তিন মাসের জন্য স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ (Suspension) করিতে পারিবেন। কিন্তু স্বামী যদি উন্মত্ত, পতিত (জাতি-চ্যুত) ক্লীব, অবীজ (বন্ধ্য) অথবা গলৎ কুষ্ঠাদি পাপরোগে আক্রান্ত হন, এবং তাঁহার পত্নী তজ্জন্য তাঁহাকে দ্বেষ করিয়া (পছন্দ না করিয়া) তাঁহার সহবাস ত্যাগ করেন, সেরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষে যৌতুক হরণ অথবা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অপর পক্ষে যদি স্ত্রী মদ পানে (একান্ত) অভ্যস্তা, অসচ্চরিত্রা, অনর্থক (স্বামীর কোন অপরাধ না থাকিলেও) দ্বেষকারিনী, হিংস্র স্বভাবা (মা'র ধ'র করেন,), অর্থ-বিনাশ-কারিনী (টাকা পয়সা সব স্বেচ্ছামত বাজেখরচ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাঁহার স্বভাব) এবং অচিকিৎস্য-চিররোগগ্রস্তা (পত্নীর কর্ত্তব্য কার্য—সন্তান উৎপাদন ও গৃহকার্য করিতে অক্ষমা) হন, তাহা হইলে স্বামী মহাশয় (সেরূপ পত্নীসত্ত্বেও) দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে অধিকারী। কাহারও পত্নী বন্ধ্যা বলিয়া নিশ্চিত জানা গেলে আট বৎসর, মৃতপ্রজা বলিয়া স্থির হইলে দশবৎসর এবং কেবলমাত্র কন্যাসন্তান বারংবার উৎপাদন করিলে (অর্থাৎ একটিও পুত্র না হইলে, যেহেতু পুত্রের জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন আর্যশাস্ত্র বলিয়াছেন) বার বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া তবে সেই ব্যক্তি দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবেন ; কিন্তু স্ত্রী যদি অনর্থক দ্বেষকারিনী হন, তাহাহইলে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে আর কোনরূপ প্রতীক্ষার আবশ্যকতা নাই। পরন্তু চিররোগিনী পত্নী যদি স্বামীর হিত-কারিনী এবং সচ্চরিত্রা হন, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি লইয়া তবে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য, কদাচ তাঁহার অবমাননা করা উচিত নহে" (৩৯)।

মনু-মহারাজের এই নীতিই সামান্যতঃ প্রাচীন আর্য-সমাজের দাম্পত্য ব্যবহারের প্রচলিত আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

ক্রমে ক্রমে আর্য-সমাজে বিবাহ-ব্যবস্থার দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলে নারীর আচার ব্যবহারের শিথিলতা নিরাকৃত হইয়া গেল এবং পূর্ব্ব-কালের অবাধ স্বেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে শুচিতার বিষম বন্ধন তাঁহাকে চারিদিক হইতে অতি কঠোর ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল। যাঁহাদের অবাধ স্বেচ্ছাচার নিবারণের জন্য মহর্ষি শ্বেতকেতু এবং দীর্ঘতমা প্রমুখ বৈদিক কালের সংস্কারকগণ মর্য্যাদা বাঁধিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন,—ক্রমশঃ সেই বন্ধন কষিতে কষিতে এমন এক সময় আসিয়া পড়িল যে নারীকে তাহার জীবনের সকল কার্যের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইল। আর্য সামাজিকগণ আদেশ দিলেন যে "নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রাদির অধীনতায় কাল-যাপন করিবেন, কোনও সময়েই (কোন গৃহকার্য্যেও) তাঁহারা কোনওরূপ স্বতন্ত্রতার যোগ্য নহেন (৪০)"। যৌবন-কালে আপনার মনোঽভিমত

(৩৯) সংবৎসরং প্রতীক্ষেত দ্বিষন্তীং যোষিতং পতিঃ।
ঊর্দ্ধং সংবৎসরাত্ত্বেনাং দায়ং হৃত্বা ন সংবসেৎ ॥৭৭॥
অতিক্রামেৎ প্রমত্তং যা মত্তং রোগার্ত্তমেব বা।
সা ত্রীন্ মাসান্ পরিত্যাজ্যা বিভূষণ-পরিচ্ছদা ॥৭৮॥
উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণম্।
ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্ত্তনম্ ॥৭৯॥
মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতাবাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥৮০॥
বন্ধ্যাঽষ্টমেঽধি বেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥৮১॥
যা রোগিনী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ ॥৮২॥
ঐ, ঐ।

(৪০) বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়াবাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎকার্যং গৃহেষ্বপি ॥১৪৭॥
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥১৪৮॥ মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়। নবম অধ্যায়ের ২য় এবং ৩য় শ্লোকও ঠিক এই অর্থই প্রকাশ করিয়াছে।

পতি নির্ব্বাচনে যাঁহাদিগের প্রকৃতিদত্ত অধিকার ছিল, শাস্ত্রকার সেই অধিকার লোপ করিয়া আদেশ দিলেন যে "দশবৎসর বয়স অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, নচেৎ কন্যার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং স্বামী ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে বিষম জুগুপ্সিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন (৪১)"। সন্তান-উৎপাদনের কাল ভিন্ন অন্য সময়ে বিবাহিতা নারীর যে স্বাধীন ও অবাধ অধিকার ছিল, স্বামীর মৃত্যু, পাতিত্য, প্রবজ্যা, ক্লীবত্ব অথবা অন্য কোনও তদ্রূপ আপদ উপস্থিত হইলে তাহার পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ করা অথবা না করা যে নিজের ইচ্ছার অধীন ছিল (৪১ক) তাহা সম্পূর্ণ ভাবে রহিত করিয়া শাস্ত্রকার বিধান দিলেন যে "যে সাধ্বী, সচ্চরিত্রা,—পতির অনুবর্ত্তন কারিনীকেই 'সাধ্বী' বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে,—অন্য বিষয়ে নানারূপ অধর্ম্মাচারিণী নারী যদি পতিব্রত ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সমাজ তাঁহাকেও 'সাধ্বী' বলিবেন) পতিলোক (মৃত্যুর পর পতির সহ কোনও অমানুষিক পরলোকে বা স্বর্গলোকে বাস করার সৌভাগ্য) প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি জীবিত অথবা মৃত পতির কোনওরূপ অপ্রিয় কার্য করিবেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর নারী পবিত্র ফুল-ফল ও মূল ইত্যাদি ভক্ষণ করত শরীরকে কৃশ করিবেন, কিন্তু কখনও পর-পুরুষের নামও (স্বাভাবিক-প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্ত্তিনী হইয়া) উচ্চারণ করিবেন না। একপত্নী ব্রতধারিনীর (এক পতিব্রত ও একপত্নীব্রত—উভয়ের একই অর্থ) উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম (পরলোকে পতির সহিত একত্রবাস রূপ পুরস্কার ইচ্ছা করিলে এই ধর্ম্ম পালন করা আবশ্যক—শাস্ত্রকারের ইহাই অভিপ্রায়) যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি স্বামীর বিয়োগে আমরণ ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিবেন। (যদিও সাধারণতঃ অপুত্র নরনারীর স্বর্গলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই তথাচ) বিধবা ব্রহ্মচারিনীগণ সনক সনন্দ ও সনাতনাদি সেই দিব্য কৌমার ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। বিবাহিত স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের দ্বারা উৎপন্ন সন্তান ধর্ম্মতঃ সেই নারীর সন্তান হয় না,—এবং বিবাহিত স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রও জন্মদাতার পুত্র বলিয়া ধর্ম্মতঃ গৃহীত হয় না;—সাধ্বী নারীদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহও কোন শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। যে নারী পুত্রলোভে ও (প্রবৃত্তিবশে হইলে ত কথাই নাই) নিজ স্বামীকে অতিবর্ত্তন করে, সে ইহলোকে নিন্দিত এবং পরলোকে পতি-সহবাস হইতে বঞ্চিত হয় (৪২)।"

---

(৪১) অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিনী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥৬॥

ইত্যাদি পরাশর সংহিতা, ৭ম অধ্যায়। এইরূপ অঙ্গিরা স্মৃতি (স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ধৃত, উদ্বাহ তত্ত্বে) এবং স্মার্ত্ত স্মৃতি, ৬৬—৬৮ শ্লোক, এবং অনেক পদ্যময়ী স্মৃতিতেই এই বচনগুলি আছে। দশ বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিলে কন্যার পিতা ("মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্" ॥২২॥ যম সংহিতা) অকথ্য নরক যন্ত্রণা পান।

(৪১ক) নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতি রন্যো বিধীয়তে॥

পরাশর স্মৃতি ৪র্থ অধ্যায় ও নারদ স্মৃতি ১২শ অধ্যায়, মাধব কৃত পরাশর ভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধু ধৃত কাত্যায়ন বাক্য, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ধৃত বসিষ্ঠ বাক্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৪২) পাণি গ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥১৫৬॥
কামং তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূল ফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্যতু ॥১৫৭॥
আসীতা মরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিনী।
যো ধর্ম্ম এক পত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্ ॥১৫৮॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥১৬০॥

ইত্যাদি ১৬৫ শ্লোক (মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়) পর্য্যন্ত এই সকল বিধান আছে। যাজ্ঞবল্ক্য আচারাধ্যায়ের ৭৫ শ্লোক, এবং অন্যান্য স্মৃতিতেও অনুরূপ শাসন আছে।

নারীর নিজ অধিকার রহিত করিয়া শাস্ত্রকার অবশেষে বালিকার পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণকেও নানারূপ কঠিন নিয়মের নিগড়ে বন্ধ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার ইহ পর লোকের কঠিন শাস্তির ভয় দেখাইয়া দশ বৎসরের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য করিয়াছেন (৪১); পরে কোনও কারণে সেই বালিকার তথা-কথিত স্বামীর অভাব হইলে প্রাচীন বসিষ্ঠাদি ঋষির স্পষ্ট আদেশক্রমে তাহাদের যে পুর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা ছিল (৪৩) নূতন শাস্ত্রকারেরা সেইসকল নিয়ম একেবারেই রহিত করিয়া দিলেন; এমন কি যদি কেহ মনে মনেও কোন পাত্রকে তাঁহার বালিকা কন্যার উপযুক্ত বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, এবং ঘটনাচক্রে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও সেই বালিকাকে আমরণ ব্রহ্মচর্য করাইবার জন্য ব্যবস্থা দিয়া শাস্ত্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন (৪৪)। এইরূপে ক্রমশঃ ভরত-খণ্ডের সমাজ কর্তৃগণ আর্য-দ্বিজসমাজের বিশুদ্ধি রক্ষার (!) উপায় করিয়া দেশে এরূপ লোকমত গড়িয়া তুলিয়া গিয়াছেন যে শতাধিক বৎসরের য়ুরোপীয় শিক্ষার ও আচারের প্রভাব, তথাকথিত স্বাধীন "ব্যক্তিত্ব" বাদের আদর, সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থাদির বহুল প্রচার এবং ৺ বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারকগণের প্রাণপাত পরিশ্রম সকলেই সেই অচল লোকমতের প্রস্তর প্রাচীরে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়া বিফল হইয়াছে। আর্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পীঠস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশে (পূর্ব্ব-পঞ্জাব এবং যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদী বা 'দোয়াবে') আর্যসমাজের চেষ্টার ফলে বরঞ্চ এই লোকমত অনেকটা কোমল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বেদহীন বাঙ্গালা দেশের সমাজ সশঙ্ক শল্যকীর ন্যায় শত-শত কণ্টক বর্ম্মে অঙ্গ আবৃত করিয়া সংস্কারকের সর্ব্বপ্রযত্ন বিফল করিয়া দিতেছে। এসব কথার আলোচনায় আমাদের (ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান কামীর) বিশেষ আবশ্যকতা নাই,—প্রাচীন আচারের অনুসন্ধান মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য; সুতরাং কোন্ আচার উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট, কোনটা গ্রহনীয় অথবা বর্জনীয় তাহার বিচার সামাজিক মহাশয়গণের উপর ন্যাস্ত করিয়া আমরা অতঃপর প্রকৃত-বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

প্রাচীন আর্য-সমাজের বিবাহ ব্যবস্থার সহিত "সহমরণ" প্রথার উল্লেখ না করিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রাচীন জাতিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব-বিদ্যার অনুসন্ধান-কারী য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গ পৃথিবীর নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যেই মৃতব্যক্তির আত্মার পরলোক বাসের সহায়তার উদ্দেশ্যে খাদ্যপানীয়, বস্ত্র, আভরণ, শয্যা ও জল পাত্র ইত্যাদির সহিত তাঁহার ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র বর্ম্ম-চর্ম্ম ঘোটক, দাস দাসী এবং স্ত্রী-দিগকেও মৃতদেহের সহিত সমাহিত করিবার প্রথার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাইয়াছেন। সেই সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে আবার মধ্যএসিয়ার শিথীত বা শকগণের ভিতর এই আচারের প্রভূত প্রচার থাকার অনেক প্রমাণ সেই পণ্ডিতেরা উপস্থিত করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরো ডোটাস হইতে রাজপুত জাতির ঐতিহাসিক কর্ণেল টড পর্য্যন্ত বহু য়ুরোপীয় বিদ্বানই এই প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে

(৪৩) অদ্ভিবাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাহথো বরো যদি।
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥
যাবচ্চে দাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥
পাণিগ্রহে মৃতেবালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চ অক্ষত যোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কার মর্হতীতি॥
সপ্তদশ অধ্যায়, বাসিষ্ঠ-ধর্ম্মশাস্ত্র। কাত্যায়ণ, (মাধবাচার্য কর্তৃক পরাশর ভাষ্যে ও নির্ণয় সিন্ধু ধৃত)।

(৪৪) সপ্তপৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুক মঙ্গলা॥
উদক স্পর্শিতা যা চ যা চ পাণি গৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূ প্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥
৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "Marriage of Hindu widows" ধৃত কাশ্যপ-বাক্য।

অনেক কথা লিখিয়াছেন। রাজপুত জাতির মধ্যেও এই প্রথার বহু প্রচার দেখিয়া টড সাহেব ঐ জাতিকে প্রাচীন শিথীয়গণের দায়াদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যসমাজেও এই সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। ঋগ্‌বেদের একটী সূক্তের মন্ত্রবিশেষ (৪৫) হইতে অনুমান হয় যে অতি প্রাচীন কালে মৃতব্যক্তির পত্নী-স্বামীর সহিত এক চিতাতে ভস্মীভূত হইতেন কিন্তু এই সূক্ত প্রচারের সময়ে সেই সুপ্রাচীন প্রথার লোপ হইয়া আসিতেছিল এবং সেই হেতু কেবল একটা আচার প্রতিপালনের অনুকল্প অথবা প্রতীক মাত্র রক্ষা করিবার পরিচয় ঐ মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় (৪৫)। সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ফলে অবগত হওয়া গিয়াছে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ের কোন কোন আচার লোক মতের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত বা লুপ্ত হইলেও ধার্ম্মিক অথবা সামাজিক ব্যাপারে সেই সেই পরিবর্ত্তিত অথবা লুপ্ত আচারের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। যজ্ঞে অথবা দেবদেবীর পূজায় যে সকল স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্য অথবা পশু পক্ষ্যাদি জীবকে বলিদান করা হইত, ক্রমশঃ সমাজধর্ম্মের পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন তথায় ক্ষীর অথবা পিষ্টতণ্ডুলের নরমূর্ত্তি এবং কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু অথবা মাষ-কলাই বলি দিয়া অনুকল্প রক্ষা করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সকল স্থলে (মধুপর্কে এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায়) গোবধ করা হইত, ক্রমশঃ তথায় আচার রক্ষার জন্য একটা গরুকে আনিয়া (অতিথি অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কর্ত্তার দ্বারা) গোসূক্ত অথবা স্তুতিমন্ত্র পাঠ করাইয়া সেই গরুকে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৪৬) সেইরূপই, ঋগ্বেদীয় দশমমণ্ডলের এই অষ্টাদশ সূক্ত প্রচারের বহু পূর্ব্বে মৃতের পত্নীকে মৃতের সহিত এক চিতাতেই দাহ করা হইত, ক্রমশঃ এই আচার লোকমতের প্রভাবে সমাজ ধর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হওয়ায় এই সূক্ত প্রচারিত হয় এবং মৃতব্যক্তির পত্নীকে নিয়ম রক্ষার উদ্দেশ্যে, একবার সেই মৃতদেহের পার্শ্বে শয়ন করাইয়াই পরক্ষণেই কর্ম্মকর্ত্তার মুখে একটি মন্ত্র উচ্চারণ (৪৭) এবং মৃতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শিষ্য অথবা দাস কর্ত্তৃক সেই বিধবা নারীর বামহস্ত ধারণ করাইয়া তাহার মুখে উক্ত ৮ম মন্ত্র উচ্চারণ (৪৫) করাইয়া তাঁহাকে মৃতদেহের পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া আনার ব্যবস্থা করা হয়। যাঁহারা বৈদিক সাহিত্য

(৪৫) উদীর্ষ্ব নার্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জ নিত্বমভিসং বভূবথ ॥৮॥ ঋগবেদ, ১০মণ্ডল, ১৮শ সূক্ত।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় আরণ্যকে পিতৃ-মেধ প্রকরণেও এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। সায়নাচার্য ভাষ্যসম্মত এই মন্ত্রের অর্থ, "হে নারি, উঠ, তুমি মৃতের সহিত শয়ন করিয়াছ; জীবলোকে আইস, এবং তোমার হস্তধারণকারীও তোমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী ব্যক্তির জায়াত্ব সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হও।

(৪৬) "যে জীবা যে চ মৃতা যে জাতা যে চ জন্যাঃ। তেভ্যো ঘৃতস্য ধারয়িতুং মধুধারা ব্যন্দতী॥ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনা৮ স্বসা ২২ দিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্রণুবোষং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ। পিবতুদকং তৃণন্যত্তু। ওমুৎসৃজেত॥ পিতৃমেধবিধিঃ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় আরণ্যক।

(৪৭) ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা,নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্ত্যপ্রেতম্। ধর্ম্মং পুরাণ মনু পালয়ন্তী-তস্যৈ প্রজাং দ্রবিন ঞ্চেহ ধোই॥ উক্ত পিতৃমেধ বিধি ধৃত অথর্ব্ব বেদের ১৮ কাণ্ড, ৩ অনুবাক্ ১ বর্গের ১ম মন্ত্র। এই মন্ত্রের সায়ন ভাষ্য সম্মত অর্থ "হে মর্ত্ত্য, এই নারী পতিলোক (পতি সহবাস সুখ) কামনা করিয়া তোমার মৃতদেহের পার্শ্বে শুইয়া আছে; তিনি সাধ্বী স্ত্রীর প্রাচীন ধর্ম্ম সকলই পালন করিয়াছেন; তাঁহাকে ইহলোকে থাকিয়া তোমার ধন এবং সন্তান সন্ততি পালন করিবার অনুমতি প্রদান কর।" স্বামী দয়ানন্দ এই মন্ত্রের প্রয়োগ (নিয়োগ-বিষয়ে) নিয়োগ-কর্ত্তামুখে নিযুক্ত ব্যক্তির সম্বোধনে ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উত্তমরূপে অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে সমগ্র ঋগ্‌বেদ-সংহিতার মধ্যে বিধবানারীর সহমরণের সমর্থক একটীও মন্ত্র নাই। খুব সম্ভব যে ঋগ্‌বেদ প্রচারের পর এই প্রথার লোপাপত্তি ঘটিয়াছিল এবং সেইজন্য মনুসংহিতাতেও সহমরণের ব্যবস্থা অথবা তাহার সমর্থন দৃষ্ট হয় না এবং বাল্মীকীয় রামায়ণে (এবং মহাভারতেও মাদ্রীর সহমরণ ভিন্ন অন্য) কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। দীর্ঘকাল পরে আবার এই প্রথার বহু প্রচলন ভারতীয় আর্য্যসমাজে আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণ ও ব্যবস্থামূলক শ্লোকাবলী পরাশর, অত্রি ও বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় (৪৮)। কবি কালিদাস বসিষ্ঠ ঋষিরমুখে প্রিয়তমা-বিয়োগ-তাপিত মহারাজ অজকে যে উপদেশ বাণী শুনাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "তুমি কাঁদিয়া কি তাঁহাকে লাভ করিবে? অধিক কি, তাঁহার অনুগমন করিলেও ত পাইবে না; দেহিগণ পরলোক গমন করতঃ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারিণী গতি লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তোমার পত্নী রাজ্ঞী ইন্দুমতী তাঁহার নিজের কর্ম্মফলে কোন অজ্ঞাত লোকে গিয়াছেন আর তুমি তোমার কর্ম্মের ফলে অন্য কোন স্থানে যাইবে তাহা কে জানে? অতএব পরলোকগতা রাণীর জন্য তুমি আত্মহত্যা করিলেও ত তাঁহাকে লাভ করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই; তবে আর কাঁদিয়া কি করিবে?" (৪৯) সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সখা ও রাজকবি বাণভট্ট তাঁহার কথাগ্রন্থের নায়ক চন্দ্রাপীড়ের মুখে এই সহমরণ অথবা অনুমরণের বিরুদ্ধে যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সমন্বিত এক নাতিদীর্ঘ বিবৃতা দিয়াছেন। "কাদম্বরী" কথা গ্রন্থের অন্যতরা নায়িকা মহাশ্বেতার প্রেমাস্পদ পুণ্ডরীকের মৃত্যুকে উপলক্ষ্যের করিয়া কবি যে উপদেশের প্রচার করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করা দুরূহ। তিনি বলিতেছেন, "দুঃখাভিভূত হইয়া লোকে অনায়াসেই আত্মহত্যা করে, কিন্তু এই কর্ম্মের দ্বারা আত্মাকে গুরুতর ক্লেশই কেবল নিক্ষেপ করা হয় মাত্র। এই যে প্রসিদ্ধ "অনুমরণ" ইহা নিতান্তই নিষ্ফল; এই পথ অবিদ্বান্ জনেরই অবলম্বন, ইহা মোহের বিলাস, এবং অজ্ঞানের সমষ্টি মাত্র; ইহা মনোবিকার ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও অতি প্রমাদের ফল; এই যে পিতা, ভ্রাতা, সুহৃত্ত অথবা স্বামীর মৃত্যুতে আকুল হইয়া লোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, ইহা মূর্খতা জনিত স্খলন মাত্র, প্রাণ আপনা হইতে (স্বাভাবিক কারণবশে) না গেলে কোন মতেই তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। এই বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে লোকে নিজের অসহ্য শোক-বেদনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্যই স্বার্থবশে প্রাণ-পরিত্যাগ করিয়া থাকে; ইহাতে মৃতব্যক্তির কোন উপকারই ত হয় না;—যেহেতু ইহা তাহার পুনরায় জীবন-লাভ করিবার, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবার অথবা উত্তম গতি-প্রাপ্ত হইবার উপায় নহে,—অথবা ইহার দ্বারা নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ অথবা পরস্পরের দর্শন ও সমাগমেরও সম্ভাবনা নাই; মৃতব্যক্তি ত তাহার নিজের কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে অবশ হইয়া সেই সেই কর্ম্মের পুরস্কার অথবা দণ্ড স্বরূপ কোন অজ্ঞাত লোকে নীত হইয়া থাকে,—আর এদিকে এই বৃথা অনুগমনকারী কেবল আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে নিমগ্ন হয়। জীবিত থাকিলে সে তর্পনাদির দ্বারা মৃতের এবং নিজের বহু উপকার করিতে পারে, কিন্তু মরিয়া গেলে উভয়ের মধ্যে কাহারই কোনও উপকার হয় না। স্মরণ করিয়া দেখুন—নিখিল-নারী-জন-হৃদয়-হারক মকরকেতু মদন হর-নেত্রানলে ভস্মীভূত হইলে তাঁহার প্রিয়তমা পাতিব্রতাচারিনী রতি ত প্রাণ-পরিত্যাগ করেন নাই;—অনাবাস-বিজিত-অশেষ নৃপতিমণ্ডলের পুনঃ পুনঃ প্রণাম-নিবন্ধন তাঁহাদের

---

(৪৮) পরাশর স্মৃতি, ৪র্থ অধ্যায়, ২৮-২৯ শ্লোক; বিষ্ণুস্মৃতি ২৫শ অধ্যায়, ১৪শ শ্লোক ও ২০শ অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোক, অত্রিস্মৃতির ২০৯ শ্লোক ইত্যাদি।

(৪৯) রুদতা কুত এব সা পুনর্ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে।
পরলোকজুষাং স্বকর্ম্মভির্গতয়ো ভিন্ন পথা হি দেহিনাম্॥৮৫॥ রঘুবংশ, ৮ম সর্গ।

"পরত্রাপি স্ব স্বকর্ম্মানুরূপফল ভোগায় ভিন্ন দেহগমনান্মৃতেনাপি সভ্যত ইত্যর্থঃ" মল্লিনাথ।

উষ্ণীষ-কুসুমসমূহের সুবাসে যাঁহার পাদপীঠ নিরন্তর সুগন্ধি থাকিত সেই অখিল-ভুবন-পালক অতি মনোহররূপশালী মহারাজ পাণ্ডু কিন্দম নামক মুনির অভিশাপ বশতঃ স্বর্গগত হইলে তাঁহার অপ্রতিম প্রেমবতী পত্নী বৃষ্ণিকুলজাতা শূরসেন সুতা পৃথা (কুন্তী) ত অনুগামিনী হন নাই;—নবোদিত শশধরের মত নয়নানন্দজনক, বিনীত অথচ বিক্রমশালী অভিমন্যু যুদ্ধে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে বিরাট-দুহিতা বালা উত্তরা ত বাঁচিয়া ছিলেন,—মহাদেবের প্রদত্ত বরের প্রসাদে বর্দ্ধিত-বীর্য মহামহিম মনোহর কান্তিসম্পন্ন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অর্জ্জুনের হস্তে লোকান্তর লাভ করিলে শত-সহোদর-ক্রোড়-লালিতা ধৃতরাষ্ট্র-দুহিতা দুঃশলাওত জীবন ত্যাগ করেন নাই। আরও কত শত সহস্র দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-মুনি-মনুষ্য কন্যা স্বামি-বিয়োগে জীবিতা ছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায়" (৫০)। (লেখক কৃত মর্ম্মানুবাদ)।

কবি কালিদাস বাণভট্টের অনেক **পূর্ব্বগামী**; **ভট্টবাণ** ও যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে **বিদ্যমান** ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই (৫১)। এই দুইজন **প্রসিদ্ধ মহাকবি** যে সহমরণ প্রথার বিরোধী ছিলেন, **তাহা দেখা গেল।** অথচ পরাশর ও বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতি **স্মৃতি** গ্রন্থে তাঁহাদের যুক্তির উত্তর পাওয়া যায়। **যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রের** মতে সকল জীবেরই **কর্ম্মানুসারিনী গতি-লাভ হইয়া** থাকে, তথাচ অনুগামিনী স্ত্রীর পক্ষে **তাহার ব্যতিক্রম নির্দিষ্ট** হইয়াছে। শাস্ত্রের মতে পত্নী ভিন্ন **অন্য কোন আত্মীয়ের** (মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, **কন্যা ইত্যাদি**) পক্ষে মৃতের অনুগমন নিষ্ফল; কিন্তু সাপুরে **যেমন জোর করিয়া** গর্ত্ত হইতে সাপকে টানিয়া বাহির করে, **তদ্রূপ অনুগামিনী** পত্নী বলপূর্ব্বক (তাঁহার স্বামী যে **কোনও নরক বা স্বর্গে** থাকুন না কেন) তাঁহার স্বামীকে **উদ্ধার করিয়া তাঁহার** স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার **সহিত স্বর্গসুখ-ভোগ**

(৫০) "অনায়াসেনৈবাত্মা দুঃখাভিহতৈঃ পরিত্যজ্যতে, মহীয়সা তু যত্নে গরীয়সি ক্লেশে নিক্ষিপ্যতে কেবলম্। যদেতমনুমরণং নাম তদতিনিষ্ফলম্, অবিদ্বজ্জনাচরিত এষ মার্গো, মোহবিলসিতমেতৎ, অজ্ঞানপদ্ধতিরিয়ং, রভসাচরিতমিদং, ক্ষুদ্রদৃষ্টিরেষা, অতি প্রমাদোঽয়ং, মৌর্খ-স্খলিতমিদং যত্নুপরতে পিতরি ভ্রাতরি সুহৃদি ভর্ত্তরি বা প্রাণাঃ পরিত্যজ্যন্তে, স্বয়ংচেন্ন জহতি ন পরিত্যাজ্যাঃ। অত্র হি বিচার্য্যমাণে স্বার্থ এব প্রাণপরিত্যাগোঽয়ম্ অসহ্যশোক বেদনা প্রতীকারত্বাদাত্মন, উপরতস্য তু ন কমপি গুণমাবহতি, ন তাবত্তস্যায়ং প্রত্যুজ্জীবনোপায়ঃ, ন ধর্ম্মোপচয়কারণং ন শুভলোকোপার্জ্জনহেতুঃ, ন নিরয়পাত প্রতীকারঃ, ন দর্শনোপায়ঃ, ন পরস্পর-সমাগমনিমিত্তম্, অন্যামেব স্বকর্ম্ম ফলপরিপাকোপচিতামসাববশী নীয়তে ভূমিং, অসাবপ্যাত্মঘাতিনঃ কেবলমেনসা সংযুজ্যতে। জীবংস্তু জলাঞ্জলি দানাদিনা বহুপকরোত্যু পরতস্যাত্মনশ্চ, মৃতস্তু নোভয়স্যাপি। স্মর তাবৎ প্রিয়ামেকপত্নীং রতিং ভগবতি ভর্ত্তরি মকরকেতৌ সকলাবলাজনহৃদয় হারিণি হরনয়নহুতভুজা দগ্ধেঽপ্যবিরহিতাসুভিঃ। পৃথাং চ বার্ষ্ণেয়ীং শূরসেনসুতাং অভিরূপে সাবজ্ঞবিজিত সকল রাজক মৌলিকুসুম বাসিত পাদপীঠে পত্যাবখিলভুবন বলিভাগভুজি পাণ্ডৌ কিন্দমমুনিশাপানলেন্ধনতা মুপগতেঽপ্যপরিত্যক্ত জীবিতাম্। উত্তরাং চ বিরাট দুহিতরং বালাং বালশশিনীব নয়নানন্দহেতৌ বিনয়বতি বিক্রান্তে চ পঞ্চত্বমভিমন্যা বুপগতেঽপি ধৃতদেহাম্। দুঃশলাং চ ধৃতরাষ্ট্র দুহিতরং ভ্রাতৃশতোৎ সঙ্গ লালিতাং অতি মনোহরে হরবরদানবর্ধিতমহিম্নি সিন্ধুরাজে জয়দ্রথেঽর্জ্জুনেন লোকান্তরমুপনীতেঽপাকৃতপ্রাণপরিত্যাগাম্। অন্যাশ্চ যক্ষরক্ষঃ সুরাসুর মুনিমনুজসিদ্ধগন্ধর্ব্বকন্যকা ভর্ত্তৃরহিতাঃ শ্রূয়ন্তে সহস্র শো বিধৃতজীবিতাঃ। কাদম্বরী, পূর্ব্বভাগ, মহাশ্বেতার প্রতি চন্দ্রাপীড় বাক্য।

(৫১) বাণভট্টের সখা ও আশ্রয় সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন খৃঃ ৬০৬ অব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়া ছিলেন। বাণভট্টের হর্ষ-চরিতের উপোদ্ঘাতে প্রাচীন কবি প্রশংসায় কবি কালিদাসের প্রীতিমধুরসান্দ্রা সূক্তির স্তুতি আছে। কালিদাস সংবৎ প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলিয়া (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দের) আমাদের বিশ্বাস; আধুনিক কোনও কোন পণ্ডিত তাঁহাকে খৃঃ ৪র্থ শতাব্দের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং কেহ কেহ খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দের যশোধর্ম্মদেবের সমসাময়িক বলিয়াছেন।

করিয়া থাকেন (৫২)। ধর্ম্মশাস্ত্রকার গণের যুক্তিহীন এই বাক্য মহাকবিগণ গ্রহণ না করিলেও মধ্যযুগে সহমরণ প্রথা ভারতীয় আর্য্যসমাজে যে খুব প্রবল ছিল তাহার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পৌরাণিকগনের মতে শ্রীকৃষ্ণের অগ্র মহিষীগণ অনুমৃতা হইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য পৌরাণিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। রাজপুতানার রাজপুত রাজগণের মৃত্যুর পর শত শত রাণী, পরিচারিকা (উপ-রানী) এমন কি পাচিকা ব্রাহ্মণী পর্য্যন্ত মৃতের সহগমন করিতেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার বার্ণিয়ার, মণিবণিক টাভার্ণিয়ার ও কর্ণেল টড্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে এবং আধুনিক মুন্সিফ্ বিহারী লাল রায় বাহাদুর গৌরী-প্রসাদ হীরাচাঁদ ও কা-প্রমুখ রাজপুত ইতিহাস বিদ্-গণের নিবন্ধাদি হইতে এ-সম্বন্ধে ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা ৺ রাম মোহন রায় প্রমুখ সমাজ সংস্কারক দিগের যত্নে এই-প্রথা রাজ-বিধি-দ্বারা রহিত হওয়ার সময়ে ইহার মৌলিকত্ব লইয়া বহু-বাদানু-বাদ হইয়া গিয়াছে এবং এসিয়াটীক সোসাইটীর জর্নালে এই বিষয়ের বাদ প্রতিবাদ লইয়া বহু প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মৌলিকত্ব অথবা শাস্ত্রিয়ত্ব বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—এই প্রথা যে বহুকাল হইতে সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করাই আমাদের কার্য এবং সেই জন্যই আমরা এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছি। কোন আচার সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গেলে লোকে নির্বিবাদে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই আচারের মূলে কোন শাস্ত্রের আদেশ আছে কি নাই তাহার ও অনুসন্ধানের আবশ্যকতা থাকে না। প্রবল জনমত সেই আচারকে এরূপ ভাবে সমর্থন করিয়া থাকে যে শাস্ত্রীর শাস্ত্র, তার্কিকের যুক্তি অথবা সংস্কার কামীর প্রাণ-পণ প্রযত্ন সকলই নিষ্ফল হইয়া যায়। দণ্ডবিধির কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত না হইলে আজিও যে সহমরণ প্রথার প্রভাব আমাদের সমাজে বিদ্যমান থাকিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বেদ-সংহিতার মধ্যে অনুমরণ অথবা সহমরণ প্রথার সমর্থক একটিও মন্ত্র খুঁজিয়া পান নাই। বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ৺ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তৎ-সঙ্কলিত শুদ্ধিতত্ত্বে যে বৈদিক মন্ত্রটিকে সহমরণের সমর্থক বলিয়া উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৫৩) ঐ টিকেই কিন্তু দশম মণ্ডলের, পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম মন্ত্ররূপে ঋগ্বেদ সংহিতায় এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় আরন্যকের পিতৃমেধ প্রকরণে একটু ভিন্ন আকারে দেখিতে পাওয়া যায় (৫৪) সুপ্রসিদ্ধ সায়নাচার্য এই মন্ত্রটির ভাষ্য উভয় স্থলেই করিয়াছেন এবং উক্ত দুইস্থলে যৎ-সামান্য পাঠান্তর গ্রহণ করিলেও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য ধৃত পাঠের কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ ঋগ্বেদ-সংহিতার ও আরণ্যক ধৃত মন্ত্রের শেষ শব্দটি "**অগ্রে**", অথচ স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য-ধৃত পাঠে উহা "**অগ্নে**" হইয়াছে। এই পাঠবিপর্যয় বশতঃ অশৌচান্তে

---

(৫২) মৃতোঽপি বান্ধবঃ শক্তো নানুগন্তুং নরং মৃতম্।
জায়াবর্জং হি সর্বস্য যাম্যপন্থা বিরুধ্যতে ॥৩৯॥ বিষ্ণু সংহিতা, বিংশ অধ্যায়।

তিস্রঃ কোট্যর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥২৮॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্তারং তেনৈব সহ মোদতে ॥২৯॥
পরাশর সংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।

(৫৩) ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা **সংবিশন্তু**।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জলযোনি **মগ্নে**॥ শুদ্ধিতত্ত্ব, শ্রীরামপুর সংস্করণ।

(৫৪) ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা **সংবিশন্তু**।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্নাঽরোহন্তু জনয়ো যোনি- **মগ্রে** ॥৭॥ ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৮শ সূক্ত।
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা **সম্‌স্পৃশন্তাং**।
অনশ্রবোঽনমীবা সুশেবা আরোহন্তু জনয়ো যোনি- **মগ্রে** ॥ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় আরণ্যকে পিতৃমেধ প্রকরণে শান্তিকর্ম্ম ধৃত পাঠ। বৃহদক্ষরে মুদ্রিত অংশগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শান্তিকর্ম্মের উপযুক্ত মহিলাগণের মঙ্গলাচার বিশেষের উপদেশকে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য তাঁহাদিগকে জীবিত অবস্থায় চিতানলে দগ্ধ করিবার বৈদিক ব্যবস্থা অথবা ভগবানের আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বদেশী ও বিদেশী কোনও কোন পণ্ডিত এই পাঠ বিপর্য্যয়কে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া বুঝিয়াছেন, কিন্তু আমরা কিছুতেই তাহা মনে করিতে পারি না। দেশাচার ভক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় লিপি প্রমাদগ্রস্ত এই পাঠকে তাঁহার সমসাময়িক দেশাচারের অতি সুন্দর আপ্ত প্রমাণ মনে করিয়াই সোৎসাহে ইহার প্রচার ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বৌধায়ন, ভরদ্বাজ এবং হিরণ্যকেশী প্রমুখ প্রাচীন সূত্রকারগণের গৃহীত পাঠ এবং ব্যাখ্যার সহিত পরিচিত থাকিয়াও সে সকলকেই অগ্রাহ্য করতঃ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য স্বার্থ প্রণোদিত চিত্তে যে এইরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা প্রাচীনদিগের পদানুসরণ করতঃ সংক্ষেপে উক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ এবং অর্থ বিচার করিতেছি।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় আরণ্যকের পিতৃমেধ প্রকরণের শান্তি কর্ম্মে এই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে এবং উক্ত শাখার সূত্রকার বৌধায়ন, ভরদ্বাজ ও হিরণ্যকেশী ঐ মন্ত্রের গ্রহণ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মৃত্যুর পর নয় রাত্রি গত হইলে দশম দিবসের প্রাতে (অর্থাৎ অশৌচান্তে নখ কেশাদি পরিত্যাগের দিন) এই শান্তিকর্ম্ম করিতে হয়। ঐ দিবস প্রাতে নগরের বা গ্রামের বাহিরের কোনও স্থানে মৃতের আত্মীয় ও আত্মীয়া বর্গের অধ্বর্যু অথবা পুরোহিতের সহিত একত্র সমবেত হইয়া অগ্নি প্রজ্বালন করতঃ লোহিত বৃষচর্ম্মের উপর উপবেশন ও হোম ইত্যাদি আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর কার্য করিতে হয়। প্রত্যেক কার্যের উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ বৈদিক মন্ত্র পাঠ করতঃ অবশেষে সকলে উঠিয়া অগ্নির উত্তর দিকে পূর্ব্বাভিমুখে একটি লোহিত বর্ণের বৃষকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া একটি মন্ত্রপাঠ করিবার পর মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অথবা তদ্রূপ নিকট আত্মীয় তথায় উপস্থিত সধবা নারীদিগকে নিজ নিজ চক্ষুতে অঞ্জন দিবার জন্য (মাঙ্গলিক কর্ম্মের উপলক্ষণ) অনুরোধের সহিত এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা
সম্মৃশন্তাম্।
অনশ্রবো অনমীবঃ সুশেবা আরোহন্তু জনয়ো
যোনিমগ্রে ॥"

এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সায়ন ইহার ভাষ্য করিয়াছেন,—(প্রথমতঃ আরণ্যকের ধৃত উপরিলিখিত পাঠের ভাষ্য) ১। "ইমা নারীঃ (এতাস্ত্রিয়ঃ) অবিধবাঃ (বৈধব্যরহিতাঃ) সুপত্নীঃ (শোভনপতিযুক্তাঃ সত্যঃ) আঞ্জনেন (অঞ্জন হেতুনা) সর্পিষা (ঘৃতেন) সম্মৃশন্তাম্ (চক্ষুষী সংস্পৃশন্তু)। অনশ্রবঃ (অশ্রুরহিতাঃ) অনমীবাঃ (রোগরহিতাঃ) সুশেবা (সুষ্টু সেবিতুং যোগ্যাঃ) জনয়ঃ (জায়াঃ) অগ্রে (ইতঃ পরং) যোনিং (স্বস্থানং) আরোহন্তু (প্রাপ্নুবন্তু) ॥"

২। সেই সায়ন ঋগ্বেদের ধৃত মন্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"ইমা নারীরিতি। অবিধবাঃ (ধবঃ পতিঃ অবিগত-পতিকাঃ জীবদ্ভর্ত্তৃকাঃ ইত্যর্থঃ) সুপত্নীঃ (শোভন পতিকাঃ) ইমা নারীঃ (নার্যঃ) আঞ্জনেন (সর্ব্বতো ইঞ্জন সাধনেন) সর্পিষা (ঘৃতেন আক্ত নেত্রাঃ সত্যঃ) সংবিশন্তু (স্বগৃহান প্রবিশন্তু)। (তথা) অনশ্রবঃ (অশ্রুবর্জ্জিতাঃ অরুদত্যঃ) অনমীবাঃ (অমীবা রোগস্তদ্বর্জ্জিতা মানস দুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ) সুরত্নাঃ (শোভনধন সহিতাঃ) জনয়ঃ (জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্যাঃ) (তা) অগ্রে (সর্ব্বেষাং প্রথমত এব) যোনিং (গৃহং) আরোহন্তু (আগচ্ছন্তু) ॥ দেবরাদিকঃ প্রেতপত্নীমুদীর্ষ্ব নারীতানয়া ভর্ত্তৃসকাশাদুত্থাপয়েৎ সূত্রিতঞ্চ।

এই ভাষ্যের সহিত পূর্ব্ব ১। চিহ্নিত ভাষ্যের প্রভেদ (ক) "সম্মৃশন্তাম্" স্থলে "সংবিসন্তু" (খ) "সুরত্নাঃ" স্থলে "সুশেবাঃ" পাঠান্তরের জন্য যাহা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ; কিন্তু কোনও মন্ত্রেই "অগ্নে" পাঠ নাই, পরন্তু "অগ্রে" আছে।

এই মন্ত্র উচ্চারণের সম্বন্ধে বৌধায়ন বলিয়াছেন "অংগত্বাঃ পত্নয়ো নয়নে সর্পিষা সম্মৃশন্তী" ভরদ্বাজ বলেন "স্ত্রীনাং অঞ্জলিষু

সম্পাতানবনয়তী মা নারীরিতি", প্রয়োগকারের মতে "ততঃ সম্পাতপাত্রমাদায় সভর্ত্তৃকস্ত্রীনাম্ অঞ্জলীষু সম্পাতমবনয়তি ইমা নারীরিতি"। প্রাচীনেরা সকলেই বলিতেছেন, সধবা নারীদিগের হস্তে আঞ্জন-পাত্র (সম্পাত-পাত্র,—যে পাত্রে কাজল পাড়া হইয়াছে তাহা) দিয়া তাঁহাদিগকে বলিবে—"এই অবিধবা এবং উত্তম পতি-শালিনী মহিলা সকলে অঞ্জন (কজ্জল)-যুক্ত ঘৃত তাঁহাদের নয়নে প্রদান করুন; অশ্রুরহিত, রোগবর্জ্জিত এবং উত্তমরূপে সেবার উপযুক্ত এই পত্নীগণ অগ্রে গৃহে প্রবেশ করুন।" তিনটি কুশ (অবিকসিত মধ্যপত্র) কূর্চের মত ধরিয়া এই অঞ্জন চক্ষুতে লাগাইবারও বিধান প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার পর, মৃতের সমুদায় আত্মীয়বর্গ পূর্ব্বোক্ত লোহিতবর্ণ বৃষকে অগ্রে করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে করিতে এই মর্ম্মের একটি মন্ত্র পাঠ করিবেন, "এই সকল নরনারী মৃতকে পরিত্যাগ করত ফিরিয়া আসিতেছে; অদ্য আমরা আমাদের মঙ্গল, শত্রু বিজয় এবং আনন্দ উদ্দেশ্যে দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি; আমরা দীর্ঘ আয়ু লাভ করত পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি (৫৫)।"

মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র (অথবা তদ্রূপ কোন নিকট আত্মীয়) অন্যান্য নর নারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি শমীবৃক্ষের শাখা দিয়া পূর্ব্বোক্ত লোহিত বৃষের পদচিহ্নগুলি মুছিতে মুছিতে যাইবেন। এ সম্বন্ধেও তাঁহার পাঠ্য একটি মন্ত্র আছে। এই সর্ব্বশেষ ব্যক্তির প্রস্থানের পর অধ্বর্য্যু তাঁহার নিজের পশ্চাদ্দিকে (অর্থাৎ অধ্বর্য্যুই সকলের শেষে ফিরিবেন) কতকগুলি পাথরের নুড়ি দিয়া একটী গোলাকার বেষ্টনী করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মর্ম্মের মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা, "আমি জীবিত ব্যক্তিবৃন্দের জন্য এই বেষ্টনী (পরিধি) স্থাপিত করিতেছি; আমরা এবং অপরেও যেন অর্দ্ধবয়সে উহার পর পারে না যাই; যেন এই প্রস্তর-পর্ব্বতের বেষ্টনী দ্বারা আমরা মৃত্যুকে অভিভব করত শত বৎসর জীবিত থাকি (৫৬)"। এই মন্ত্র পাঠের পর সকলে যজমানের গৃহে গিয়া তথাকার উপযুক্ত কতকগুলি কার্য করিবেন ইত্যাকার বিধান উক্ত আরণ্যকে দেখিতে পাওয়া যায়। যজুর্ব্বেদীয় সূত্রকার বৌধায়ন, ভরদ্বাজ ও হিরণ্যকেশী (ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন ও অনেকস্থলে এইরূপই) অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অন্তর্গত অশৌচান্তের পর শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠেয় মহিলাগণের এই মঙ্গলাচরণের মন্ত্রকে তাঁহাদের ভীষণ মৃত্যু দণ্ডের আদেশে পরিণত করা নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কোনও মূর্খ লেখকের হস্তে মন্ত্রের শেষে "অগ্রে" শব্দটী "অগ্নে" পরিণত হওয়ায় অন্ততঃ বঙ্গদেশে যে শত শত নিরপরাধা নারীর পক্ষে উক্ত ভ্রম বিষম শ্মশানাগ্নিতে পরিণত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। মূর্খতা এবং ভ্রমের এরূপ নিদারুণ ভয়াবহ দৃষ্টান্ত জগতে আর কোথায়ও সংঘটিত হইয়াছে কি না ভগবান্ জানেন; পরন্তু আমাদের দেশে ইহার এই সাংঘাতিক পরিণামের কথা ভাবিয়া দেখিলে এখনও আমাদের শরীর শিহরিত হইয়া উঠে! (৫৭) বিশ্বধ্বংসী আগ্নেয় পর্ব্বতের বিষম অগ্ন্যুদিগরণ

(৫৫) ইমে জীবা বি মৃতৈরাববর্ত্তিন্নভূদ্ ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরাং দধানাঃ॥
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১৮শ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র; আরণ্যকের ধৃতপাঠ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। বৈদিক মন্ত্রে সামান্য পাঠান্তর আছে।

(৫৬) ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মা নোঽনুগাদ পরো অর্দ্ধমেতম্।
শতং জীবন্তু শরদঃ পুরূচীস্তিরো মৃত্যুং দধ্মহে পর্বতেন॥ আরণ্যক ধৃতপাঠ।

(৫৭) "সহমরণ" সম্বন্ধে আমাদের এই প্রস্তাবের উপকরণের নিমিত্ত আমরা পরলোকগত ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ের "*Indo-Aryans*" Vol. II তে প্রকাশিত "Funeral-Ceromony in Ancient India" নামক একাদশ প্রস্তাবের নিকট

শান্ত হইয়া গেলেও ধরিত্রীবক্ষে যেমন তাহার ধ্বংসকীর্ত্তির বহু চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, ভরতখণ্ডের আর্য-সমাজ হইতে ইংরেজের রাজবিধির সলিল-প্রয়োগে সহমরণের চিতানল নির্ব্বাপিত হইলেও তদ্রূপ অদ্য পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্রই তাহার ভস্মরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

প্রাচীন গৃহ্যসূত্রগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া গদ্য পদ্যময়ী স্মৃতিসংহিতা এবং পৌরাণিক গ্রন্থাবলীতে ভরতখণ্ডের প্রাচীন আর্য-সমাজের বিবাহ-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ এবং জৈন-সমাজের সূত্র, স্মৃতি এবং পৌরাণিক গ্রন্থাদিতেও এই বৈবাহিক-বিধি ব্যবস্থার আরও নানারূপ মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত (ভরত-খণ্ডের লোকে যতদিন পর্য্যন্ত বৈদেশিক রাজার অধীন না হইয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত) ভরতখণ্ডে বিবাহ-সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আবশ্যকতা অনুসারে প্রাচীন ব্যবস্থা গুলির সময়ানুরূপ সংস্কার, প্রসার, অথবা পরিত্যাগ প্রভৃতি যে সকল অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার আমূল ইতিহাস এবং বিবরণ ঐ সকল শাস্ত্র হইতে সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়। ছন্দোবদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থে সামাজিক বিধি ব্যবস্থার যে অবস্থা আমরা আজ দেখিতে পাইতেছি, এবং রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাপুরাণ গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন আর্য-সমাজের যে সকল চিত্র এখন প্রকটিত দেখা যাইতেছে, উহাতে বহুকালের বহুরূপ অবস্থার উন্নতি, অবনতি এবং পরিবর্ত্তনের ধারা একত্র সংগৃহীত অথবা সঙ্কলিত আছে। এই হেতু একই গ্রন্থের কোথাও প্রাগ্‌বৈবাহিক সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থার ইতিহাস আছে, আবার তাহারই অন্যত্র বর্ণাশ্রমের বিহিত এবং সপিণ্ড-সগোত্রাদি সম্পর্ক বিবর্জ্জিত সম্পূর্ণ পরিণত অবস্থার "হিন্দু আইনের" বৈবাহিক ব্যবস্থার চুল চেরা নিয়ম পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়, এই শাস্ত্রগ্রন্থ গুলিকে আধুনিক ইংরাজী ভাষায় Social codes with all amendments (সাময়িক পরিবর্ত্তন-সম্বলিত সামাজিক ব্যবস্থা সংগ্রহ) বলা যাইতে পারে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এবং ভিন্নরূপ সভ্যতার ও সামাজিক ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী নব্য আরব অথবা পারসীক প্রভৃতি (মুসলমান আখ্যাধারী) জাতি যখন এদেশে আসিয়া রাজনৈতিক ভীষণ পরিবর্ত্তনের সহিত সামাজিক সমস্যাকেও বিষম জটিল করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণের সাহায্যে, কোথাও বা শাস্ত্রীরা স্বয়ংই দেশকাল পাত্রের উপযোগী প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের নবীন-নিবন্ধ প্রস্তুত করত সেই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র, তাহাদের ভাষ্য এবং টীকাদি সম্বলিত এবং সংগ্রহ-কারগণের বিদ্যাবুদ্ধিমত বিচার সমন্বিত এই সকল নিবন্ধগুলিই যে ক্রমশঃ আমাদের দেশের শ্রুতি, সূত্র এবং স্মৃতি সমূহের স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান সময়ে "হিন্দু-আইনের" কার্য্য করিতেছে, (অবশ্য ইংরেজের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের মতই এখন শ্রুতি বাক্য অপেক্ষাও প্রবল) তাহা সকলেই জানেন। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে মনুসংহিতার মত প্রাচীন শাস্ত্রেও সামাজিক নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্যস্বরূপ প্রাচীন ও নবীন নানা প্রকার ব্যবস্থা সঙ্কলিত হইয়াছে।

সেই হেতুই সমাজের বিবাহ-ব্যবস্থায় "অনাবৃত" (Communal) "এবং পারি-বারিক" (Fraternal. Polyandry) ইত্যাদি ক্রম হইতে উন্নত হইয়া ক্রমশঃ একারত্ত-স্বামিত্বের প্রতিষ্ঠা হইলে প্রথমতঃ নিকট আত্মীয়কুল, দল, গোত্র ইত্যাদি সীমার মধ্যেই বিবাহ চলিত। য়ুরোপীয় ভাষায় ইহাকে

স্বনী। এই পুস্তক অতি অল্পদিন হইল, আমাদের হস্তগত হইয়াছে; এখন দেখিতেছি পরলোকগত ডাক্তার মিত্র মহাশয় প্রাচীন ভারতে মদ্যপান, ভোজনোৎসব, গোমাংস-ভক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের লিখিত "প্রাচীন ভারতে মদ্যপান" (প্রতিভায় প্রকাশিত) ও "প্রাচীন ভারতে মাংসাহার (প্রতিভায় প্রকাশিত) এই দুই প্রস্তাবে লিখিবার সময় এই উপাদেয় পুস্তক আমাদের হস্তগত হয় নাই।

Endogamy. (অন্তর্বিবাহ ?) বলে। ইহাতে ভ্রাতা-ভগিনী (সহোদর সহোদরা হইতে পিতৃব্য এবং মাতুল পুত্র কন্যা পর্যন্ত) সকুল ও সগোত্র সম্বন্ধ চলিত। ইক্ষ্বাকু বংশীয় শাক্যশাখায় সহোদর-সহোদরা বিবাহ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; এবং শাক্যেরা নিজ কুল ব্যতীত পার্যমাণে অপর কুলে কন্যাদান করিতেন না। রামচন্দ্রাদি চারি ভ্রাতার বিবাহ ও রামায়ণের মতে সকুলে (বৈবস্বত মনুর বংশীয় নিমি বংশে, মহাপুরাণ গুলির মতে এই নিমি ইক্ষ্বাকু পুত্র এবং রঘুবংশের মূল পুরুষ বিকুক্ষির ভ্রাতা) হইয়াছিল এবং জৈন ও বৌদ্ধ মতে ত সীতা প্রকৃতই রামের "জনক-তনয়া" অথবা ভগিনী ছিলেন। যদুবংশের মতে সপিণ্ড, সকুল এবং মাতুল সম্বন্ধ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণাপথে ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও মাতুল-কন্যা বিবাহের সমর্থক শাস্ত্র বাক্য পাওয়া যায়। পাণ্ডব অর্জ্জুন সাক্ষাৎ মাতুল-কন্যা সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুরাণের বিখ্যাত রাজ-বংশে সকুল, সগোত্র এবং মাতুল সম্বন্ধের নিদর্শন আদৌ দুর্লভ নহে। ঐতিহাসিক সময়ের প্রথিতনামা চৌহান্ বীর পৃথ্বীরাজ তাঁহার মাতৃষস্রেয় জয় চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় যে ভাগি নেয়কে কন্যাদান করা সে সময়ে সুপ্রচলিত সামা-জিক ব্যবহার ছিল।

ক্রমশঃ এইরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সকুল এবং সগোত্রে বিবাহ (আর্য বা দ্বিজগণের) একেবারে নিষিদ্ধ ত হইলই, অপরন্তু মাতামহ কুলেও আর যথেচ্ছ কন্যা সংগ্রহ করিবার উপায় রহিল না। এই সব খুঁটি নাটির কথা স্মৃতি শাস্ত্রে ও পুরাণে অনেক আছে এবং নিবন্ধকারেরা ইহা লইয়া খুব চুল-চেরা বিচারের ঘটা করিয়াছেন। অধিক কি, বিবাহিতা পত্নীর নাম যদি দৈবক্রমে বরের মাতার নামের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলেও সেই নিরাপরাধা বালিকাকে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিবার (এবং সে চিরকাল ঐরূপ না-বিবাহিত, না-অবিবাহিত, এবং না-বিধবা এবম্প্রকার অবর্ণনীয় অবস্থায় থাকিবে ইত্যাকার) ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সে সব কৌতূহল জনক বিষয়ের বিচারে স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয়-গণের অধিকার, ঐতিহাসিক বিদ্যার্থীর তাহাতে নিষ্প্রয়োজন এবং অনধিকারও বটে। এইরূপ সকুলের গণ্ডীর বাহিরে বিবাহ করার প্রথাকে য়ুরোপীয়গণ Exogamy. (বহির্বি-বাহ ?) বলেন। এইপ্রকার অবিমিশ্র বা নির্ভেজ খাঁটি Exogamy বা বহির্বিবাহ আর্য-সমাজে চলে নাই। বর্ণ, কুল এবং গোত্রাদির বিচার বশতঃ তাঁহাদের বিবাহ অদ্ভুত "Exo-Endo-gamy" আখ্যা পাইবার উপযুক্ত বটে। পুনরপি কৌলীন্য-প্রথার প্রচলন নিবন্ধন বঙ্গদেশের ভদ্র সমাজে যে প্রকার জটিল এবং কুটিল বিবাহ প্রথার প্রতিপত্তি লক্ষিত হয়, বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা Exo এবং Endoর শত সহস্রগুণে গুণিত শব্দের সহিত gamy শব্দের যোগ অথবা সমাজে তাহার কোন নূতন সংজ্ঞা ঘটিত হইয়াছে কি না জানি না। ফলতঃ বর্ত্তমান জরা অথবা জড়তাগ্রস্ত বঙ্গ-সমাজের সম্বন্ধে কোন কথায় প্রস্তুত বিষয়ের কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহার আলোচনা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

সমাজের অতি প্রাচীন অবস্থায় উচ্চস্তরের লোকের মধ্যে পরস্পর কন্যার আদান প্রদান চলিত এবং বর্ণভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পর্য্যন্তও কিছুদিন উক্ত প্রথার প্রচলন ছিল। পৌরাণিক গ্রন্থের অনেক স্থানে ব্রাহ্মণবর্ণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের পরস্পর বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং জিন সংহিতায় ত্রৈবর্ণিকের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) পরস্পর বিবাহের সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায় (৫৮)। পরে, সামাজিকগণ উচ্চবর্ণের বরের সহিত নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহের (অনুলোম) বৈধতা এবং বিপরীত প্রকার (প্রতিলোম বিবাহের অবৈধতা ঘোষনা করিয়াছেন। ক্রমশঃ অনুলোম প্রণালীর বিবাহ পাণিগ্রহণ সংস্কার বর্জ্জিত

(৫৮) "ত্রৈবর্ণিকস্য বোঢ়ব্যা স্যাৎ ত্রৈবর্ণিক-কন্যকা"। জিন-সংহিতা, বিশ্বকোষধৃত। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ইচ্ছামত বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

একপ্রকার কাম্যবিবাহে পরিবর্ত্তিত এবং সেইরূপ বিবাহের সন্তান সন্ততি পিতা মাতার বর্ণ হইতে চ্যুত ও অবনত হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য প্রথমতঃ প্রত্যেক দ্বিজকে সবর্ণ বিবাহ করিবার জন্য স্মৃতি আদেশ দিয়া পরে ইচ্ছা হইলে (কেবলমাত্র সুখভোগের কামনায়) নিম্নবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। মন্বাদি সমুদয় প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে এইরূপ অনুলোম বিবাহের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। অপর পক্ষে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের উপাখ্যান বিশেষে (৫৯) ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে যে যদি কোন দ্বিজ ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্যে সবর্ণা কন্যাকে অগ্রে বিবাহ না করিয়া প্রথমেই কোন দ্বিজধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্যে অসবর্ণা কন্যা পরিগ্রহ করেন, তাহা হইলে তিনি নিজের (উচ্চ) বর্ণ হইতে চ্যুত হইয়া কন্যার (নিম্ন) বর্ণে অবনমিত হইবেন। পরে, তাহার অন্য পুরাণ অথবা উপপুরাণকারগণের দোহাই দিয়া সর্ব্বপ্রকার অসবর্ণ-বিবাহই বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে (৬০)। বর্ত্তমান সমাজ-প্রচলিত নিয়মের ফলে কোন একবর্ণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে (যেমন ব্রাহ্মণ বর্ণের রাঢ়ী বারেন্দ্র, বৈদিক, দ্রাবিড় শাকদ্বীপীয়, শাকলদ্বীপীয়, বর্ণ ব্রাহ্মণ ইত্যাদির মধ্যে,—অথবা শূদ্রবর্ণের ধোপা, নাপিত ইত্যাদির মধ্যে) পরস্পর বিবাহ হইতে পারে কিন্তু ভিন্নবর্ণের মধ্যে (ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে ইত্যাদি) বিবাহ হইতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিবার অভিপ্রায়ে ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ সংস্কারক বর্গের চেষ্টার ফলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু ঐ আইন মত বিবাহ করিতে গেলে বর এবং কন্যা উভয়েই "আমি হিন্দু নই" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা বাক্য পাঠ করিতে হয় বলিয়া উহা সকলের প্রীতিকর হয় নাই। হিন্দু আইনের বন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য সেকালে ঐরূপ উপায়ই সাধু বলিয়া বিবেচিত হইলেও একালের অনেকে ঐরূপ অস্বীকার-মন্ত্র পাঠ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। যাঁহারা "আমরা হিন্দু নই" এরূপ বলিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ অসবর্ণ বিবাহ করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের সুবিধার জন্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত পাটেল মহারাজ উপযুক্ত আইন প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু সামাজিকগণের প্রতিকূলতার জন্য, রাজদ্বারে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত এইচ, এস,

(৫৯) মন্বাদি স্মৃতি সংহিতায় অনুলোম-বিবাহের (কথঞ্চিৎ) বৈধতা ও প্রতিলোম বিবাহের হেয়তা প্রতিপাদন, উভয় বিধ বিবাহোৎপন্ন সন্তানের বর্ণ নির্ণয় অশৌচবিচার ও দায় ভাগের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১১৩ অধ্যায়ে (বঙ্গবাসী) নাভাগ-উপাখ্যানে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র দিষ্টের পুত্র রাজকুমার নাভাগ এক বৈশ্যকন্যার প্রতি অনুরাগ-বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, সে কালের ঋষিগন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন ;—

"রাজপুত্রানুরাগস্তে যদস্যাং বৈশ্যসন্ততৌ।"
তদস্ত ধর্ম্ম এবৈষ কিন্তু ন্যায়ক্রমেণ সঃ ॥১৯॥
মূর্দ্ধাভিষিক্ত তনয়া-পাণিগ্রাহো ভবেৎ পুরা।
ভবত্তনন্তরঞ্চেয়ং তব ভার্য্যা ভবিষ্যতি ॥২০॥
এবং ন দোষো ভবতি তথেমামুপভুঞ্জতঃ।
অন্যথা ভ্রোতি তে জাতিরুৎকৃষ্টা বালিকাং হরন্ ॥২১॥

বঙ্গবাসীর অনুবাদ। হে রাজকুমার, আপনি যদি এই বৈশ্যকন্যার প্রতি অনুরাগী হইয়া থাকেন, অবশ্য অধর্ম্ম নহে কিন্তু যথা ন্যায় হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ মূর্দ্ধাভিষিক্ত (ক্ষত্রিয়, মূর্দ্ধাবসিত নহে) কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তৎপর এই কন্যাকে আপনি ভার্য্যা করুন। এইরূপে এই বৈশ্যকন্যাকে উপভোগ করিলে আপনার কোনওরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই ; নতুবা বালিকা-হরণ জন্য আপনাকে এত উৎকৃষ্ট (ক্ষত্রিয়) জাতি হইতে অবনত হইতে হইবে।"

(৬০) দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা—দ্বিজগণের অসবর্ণা কন্যা বিবাহও অন্যান্য কতিপয় আচারের সহিত নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৃহন্নারদীয়, আদি ও আদিত্যপুরাণের নাম করিয়া মাধবাচার্য্য প্রমুখ ভাষ্য ও নিবন্ধকারগণ এই সকল শ্লোক নিজ নিজ নিবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গৌর মহাশয় ঐরূপ একটি আইন ব্যবস্থাপক সভায় পাশ করাইতে পারিয়াছেন, কিন্তু উহার বিধিবৎ প্রচার এখনও আবদ্ধ হয় নাই। এই আইন মতে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের পরস্পর অন্তর্বিবাহের অনুরাগী ভদ্রমহোদয়গণের অভিলাষানুরূপ বিবাহে হিন্দু-আইন আর কোনও বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। তবে ঐরূপ বিবাহের ফলে সমাজের উপকার অথবা অপকার হইবে, তাহা বলা অসম্ভব।

অতঃপর, পর-প্রস্তাবে আমরা "অবৈবাহিক-যৌন-সম্বন্ধের" কথা আরম্ভ করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলেন্দু ভারতীভূষণ।

—(০)—

পুরাণ-কথা।

আমাদের প্রতিভা পত্রিকায় নূতন কথা বড় একটা বিকায় না—নূতন সাহিত্য, গল্প, মেয়েলী ধরণের নব্যবাঙ্গালির কবিতা, কি অতি নূতন যে এক রকম—Realistic school এর উপন্যাস আজ কাল অনেক মাসিক সাহিত্যের কলেবর প্রায় জুড়িয়া থাকে সে সব ধরণের উপন্যাস—এ সবের উপর আমাদের কর্তৃপক্ষগণ বিরূপ—পত্রিকায় বড় একটা স্থান দেন না। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনাই প্রতিভার বিশেষত্ব। দেশ ভ্রমণ কিছু না করিয়াছি—তাহা নয়। যাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে মাসিক সাহিত্য পাঠকগণের কাণ ঝালা পালা তাঁহাদের অনেকের চেয়ে যে কম ভ্রমণ করিয়াছি তা বলিতে পারি না। অনেক পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকাও দেখিয়াছি। প্রথম বয়সে তার ২।১ খান ইট পাথরও সংগ্রহ না করিয়াছি তাও নয় কিন্তু খাঁটী প্রত্ন তত্ত্বের মত কিছু আলোচনা করি নাই। এদিকে সম্পাদক মহাশয়ের আব্দার পত্রিকায় কিছু দিতেই হইবে। তাই পুরাতন ইট কিম্বা প্রস্তর ফলক উৎকীর্ণ করিয়া আপনাদের নিকট কোন প্রত্নতত্ত্ব উপস্থিত করিতে না পারিয়া মধ্যভাবে গুড়ের মত পুরাণ আমলের ২।৪টী প্রত্নকথা আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। আমি প্রতিভা পত্রিকার ক্ষুদ্র প্রকাশক মাত্র। আমি কোন মৌলিকত্বের দাবী রাখি না,—আপনারাও আমার নিকট তাহা আশা করিতে পারেন না। তাই পুরাণ কাগজ থেকে কয়েকটি পুরাণ কথা আপনাদের জন্য প্রকাশ করিতেছি। একটু বয়স হইলে পুরাণ আমলের কথা শুনতে ভালই লাগে। বোধ হয় মৎপ্রকাশিত কথাগুলি আপনাদের অপ্রীতিকর হইবে না।

∴

আমাদের দেশে সাধারণ সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবার প্রথা পৌরাণিক যুগের পর লুপ্ত হইয়া আবার কত কাল হইল প্রচলিত তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় ইংরেজ রাজত্ব দেশে বদ্ধমূল হইবার সঙ্গে তাঁহাদের অনুকরণে রাজকর্ণে আবেদন নিবেদন জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে দেশে এই বক্তৃতার স্রোত আরম্ভ হয়। বাংলা ১২৬৭ সনে মহারাজা (তখন সুধু "বাবু") যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের যত্নে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের বঙ্গানুবাদের রঙ্গভূমিতে প্রায় ৩৷৷০ ঘণ্টা ব্যাপী এক অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে অভিনেতা গণের বাক্‌চাতুরী ও অঙ্গবিন্যাস দেখিয়া জনৈক দর্শক সোমপ্রকাশ পত্রিকায় যে একখানি পত্র মুদ্রিত করেন তাহা পড়িলে মনে হয় সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া লম্বা বক্তৃতা তখনও দেশে প্রচলন হয় নাই। তিনি লিখিতেছেন—

অস্মদ্দেশে জন সমাজে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করণের প্রথা প্রচলিত নাই; পরন্তু তাহা প্রচলিত করা সর্ব্বতোভাবে কাঙ্ক্ষিত। যাঁহারা অভিনয় করণে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হয়েন, আমি বোধ করি তাঁহারা মনোনিবেশ করিলে তাঁহাদের প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।

∴

ইহার অল্পদিন পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃত নাটকের বাংলায় অনুবাদ হইয়া তাহা নাট্যাকারে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্ব রত্নাবলী প্রভৃতি নাটক কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের বাড়ীতে খুব জাঁক জমকের সঙ্গে অভিনয় হইতেছে। বাংলা ১২৬৪-সাল (১৮৫৭-৫৮) বড়ই

দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন যে দেশের পক্ষে এমন দুর্ব্বৎসর বুঝি আর কখনও হয় নাই। দেশে যেমন একদিকে বিদ্রোহ (সিপাই) দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অন্য দিকে কলিকাতায় বড় লোকদের বাড়ীতে রঙ্গালয়ের তেমনি ধুম। এই "অভদ্র অব্দরাজ" ১২৬৪ সালকে গুপ্তকবি ঈশ্বর চন্দ্র যখন একদিকে কুলো হাতে বিদায় দিতেছেন।

লক্ষীছারা বছরের হোয়ে গেল দায়।
রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে কররে বিদায়॥

তখন অন্যদিকে রঙ্গভূমির-অভিনয় দর্শনে কলিকাতা বাসী রঙ্গরসে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে—

বঙ্গদেশে আজকাল বড় ধুম ধাম।
যেথা সেথা শুনা যায় অভিনয় নাম॥
বঙ্গদেশে রঙ্গবিদ্যা হোতেছে প্রকাশ।
সকলে উৎসাহ কর এই মম আশ॥

তখন পর্য্যন্ত কোন সাধারণ রঙ্গালয় হয় নাই। সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ হইয়া রাজা গজা প্রভৃতি বড় লোকদের বাড়ীতে অভিনয় হইত। মফঃস্বল থেকে অনেকে এই অভিনয় দেখিতে কলিকাতা যাইতেন। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের একজন সৌখীন আমুদে ভদ্রলোকের কাছে শুনিয়াছি যে তিনি এই অভিনয়ের বৃত্তান্ত নিয়া কলিকাতায় গিয়ে একেবারে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়া হাজির—অত দূর থেকে এত আগ্রহ করে নাটক দেখতে গিয়াছেন শুনে মহারাজা তাঁকে সোনা বাঁধা ফুর্সীতে তামাক দেওয়ান এবং কত রকমে যে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। একদিন রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগেছের বাগানে রত্নাবলী নাটকের অভিনয় হয়। প্রভাকরের জনৈক বন্ধু সংবাদ দিতেছেন "তদ্দর্শনে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে বাংলা দেশের ছোট গবর্ণর শ্রীযুক্ত মান্যবর হ্যালিডে সাহেব, মিঃ হিউম সাহেব, ডাক্তার গুডইব্ চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকানেক ইংরাজলোক ও বাঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজাপ্রতাপ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর……পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রাম নারায়ণ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা উপস্থিত ছিলেন। ছোট বাহাদুর মহাশয় নাটক শেষ হওন কালীন অনেক প্রশংসা করিলেন এবং কহিলেন যে এতদ্দেশীয় যুবা ব্যক্তিরা লেখা পড়া শিখিয়া কত শত মহাত্মাকে সুখী করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এতাদৃশ দৃশ্য সুখ অপেক্ষা আরো কত প্রকার গুরুতর ব্যাপার সকল সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা করা যায় তাহার পরিসীমা নাই। যাহাহউক বাঙ্গলা দেশ সভ্য হইয়াছে ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তি-বর্গেরা বিদেশীয় বিদ্যায় ব্যুৎপন্নশালী হইতেছে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে। সর্ব্বশেষে নাট্যোক্ত পুরুষ-দিগকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় হইলেন"। (বাঙ্গালি যে ইংরেজ শাসনের এত অল্প দিনের মধ্যেই কি পরিমাণ সভ্য হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বারান্তরে)।

∴

জার্ম্মানদের সংস্কৃত চর্চ্চার খ্যাতি অনেক দিন থেকে চলতি আছে। ১৮৫৮ সনে প্রভাকরের জনৈক পাঠক লিখিতেছেন "পূর্ব্বে এতদ্দেশের ব্যক্তিবর্গের ভ্রান্তি ছিল যে সংস্কৃত শাস্ত্রে ভারত ভূমির লোক ব্যতীত অন্যস্থান বাসী লোকদের উপার্জ্জন হইবেক না। তাঁহারা দুইজন ইংরেজকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া স্থির করিলেন যে আর কোন স্থানে তাহা প্রণালীপূর্ব্বক উপার্জ্জন হওয়া কঠিন। এক্ষণে শুনিয়া থাকিবেন যে ইয়োরোপ খণ্ডের অন্তঃস্থ জার্ম্মানি দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের এতাদৃশ চলন হইয়াছে যে তাঁহারা সংস্কৃত ভিন্ন প্রায় অন্য ভাষার চালনা করেন না।"

∴

১৮৫৭ সনের নিরস্ত্র করণ প্রস্তাব Arms Bill লইয়া যখন দেশে তুমূল আন্দোলন রাজপুরুষেরা ইয়োরোপীয়-দিগকে বাদ দিয়া কেবল ভারতবাসী দিগের প্রতি নিরস্ত্র করণ বিধি প্রয়োজিত করিতে কৃত সঙ্কল্প—তখন স্বনাম-ধন্য প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি ক্লার্ক। সার বার্ণস পিকক তখন পর্য্যন্ত চিফজষ্টিস হন নাই—ভারত গবর্ণমেণ্টে। সার বার্ণস পিকক তাঁহাকে লোভ

দেখাইয়া ছিলেন যে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে এই আইনের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিলেন। তাহাতে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর সগর্ব্বে এই উত্তর দেন যে আমি আপনার নিকট কোন বিশেষ অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষী নাই। আমার দেশের লোকের উন্নতি হউক বা অবনতি হউক যে গতি হইবে আমারও সেই গতি। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর অনেকবার এইরূপ অকপট স্বদেশানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

∴

পুলীশ সংস্কার এবং দারোগা ভীতি বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে। ১৮৬০ সনের ৩রা সেপ্টেম্বরের সোমপ্রকাশ বলিতেছেন—ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্র জন্তুর ভয় অপেক্ষাও দারোগার ভয় অধিক। ব্যাঘ্রের ভয় সকল পল্লী গ্রামে সকল সময়ে হয় না। সর্প ভয়ও কোন কোন সময়ে হয়। কিন্তু দারোগার ভয় প্রায় সমুদয় পল্লী গ্রামে সকল সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সম্পাদক মহাশয় কতকগুলি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রমাণ করিয়াছেন।

∴

পূর্ব্বে বিলাত এবং আমেরিকা হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া বরফ কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইত। টেরিটি বাজারে কোথায় যেন তার গুদাম ছিল। ১৮৬০ সনের মে মাসের একখানা সোম প্রকাশ ফিনিকস্ পত্রিকা হইতে সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছেন,—বরফ বোঝাই একখানা জাহাজ কলিকাতায় আসিয়াছে। বোধ হয় বরফ এখন পূর্ব্ব মূল্যেই বিক্রয় হইবে। এখনকার যুবকদের ইহা, শুনিলে কেমন আশ্চর্য্য বোধ হইবে?

∴

এইতো সে দিনের কথা সুপ্রীম কাউন্সিলে Seditious meetings Bill পাসের প্রস্তাব লইয়া যখন তুমুল আন্দোলন তখন Sir Harvy Adamson নিজ পক্ষ সমর্থন ও ঐ আইনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গবাসী তাঁহার জনৈক শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বন্ধুর লিখিত এক খানা চিঠি কাউন্সিল সভায় পাঠ করেন। Adamson সাহেব তাঁহার এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুটীকে সাধারণের নিকট অনাম গোত্রই রাখিয়া গেলেন। লোকে চাওয়া চাওই, কানাকানি করিতে লাগিল এ দেশ হিতৈষী old friend টীকে? পূর্ব্ব বঙ্গবাসী অনেকে ভাবে সপ্তমী করিয়া মনে মনে লোকটীকে ঠাওরাইল। পশ্চিম বঙ্গের অনেকেই হয়ত হাতরাইয়া কিছুই ঠাওর করিতে পারিল না। ন্যায় যুক্তি তর্ক লোক মত উপেক্ষা করিয়া রাজ নৈতিক Policy চালাইতে হইলে এইরূপ একটা কিছু অবলম্বন আঁকড়ে ধরা বোধ হয় স্বাভাবিক। এটা মানব হৃদয়ে ঈশ্বর দত্ত একটা দুর্ব্বলতা কিনা তা মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিতে পারেন। আমরা দেখিতে পাই যে সিপাই বিদ্রোহের পর শূন্য রাজ কোষ পূরণ করিবার জন্য যখন প্রজার উপর নূতন কর ধার্য্য করা আবশ্যক হইয়াছিল তখন উইলসন সাহেব দেশের রাজাপ্রজা লোক মত অগ্রাহ্য করিয়া ইনকাম ট্যাকস আইন পাস করিতে কৃত সংকল্প হইয়া নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণ অবলম্বনের মত বর্দ্ধমানের মহারাজার লিখিত এইরূপ একখানা চিঠি ব্যবস্থাপক সভায় পাঠ করেন। বর্দ্ধমানাধিরাজ নিজে ট্যাকস দিতে প্রস্তুত এবং ইহার উপকারিতা দর্শাইয়া এই ট্যাকস প্রচলন জন্য গভর্ণমেন্টকে এই অনুরোধ পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্র সম্বন্ধে তৎকালীন সোমপ্রকাশ লিখিতেছেন—

উইলসন সাহেব শুনিয়াছেন ভারতবর্ষীয় জমীদারেরা এই আপত্তি করিতেছেন তাঁহাদের নিকট হইতে যদি নূতন কর গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইবে। উইলসন সাহেব এই আপত্তির খণ্ডন উদ্দেশ্য করিয়াই এই পত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রদর্শন করেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই তাঁহার প্রস্তাব যদি মন্দ হইবে তাহা হইলে বর্দ্ধমানের রাজা একজন প্রধানতম জমীদার হইয়া তাহাতে অনুমোদন করিবেন কেন? Poor Wilson! একজন নামার্থী ব্যক্তির অদূর দর্শিতা দোষ দূষিত বাক্য প্রমাণ দিয়া আপনার অনুচিত প্রস্তাবের ঔচিত্য প্রমাণ করা যায় না।—ভারতবর্ষীয় সহস্র সহস্র জমীদার তাঁহার কৃত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন, উইলসন সাহেব তাহার উল্লেখ করিলেন না কেন?—

সুপ্রীম কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট সেই পত্র অনুমোদন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং ভারত গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি সাহেব যথারীতি সেই সন্তোষ প্রকাশ পত্র বর্দ্ধমান মহারাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজ পুরুষ মহলে মহারাজকে লইয়া টি টি পড়িয়া গেল, দেশের লোক অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল!

এ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কথা আর এখন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ। বর্দ্ধমান রাজ এ tradition সমভাবে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং রাজপুরুষেরাও এ রাজ নৈতিক চাল হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হন নাই।

(বারান্তরে)

——০——

বাঙ্গালা বানান সমস্যা।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন বাঙ্গালীর উপর একটা বড় রকম কলঙ্ক চাপাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী নাকি—

প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়,
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ॥

অর্থাৎ কিনা বাঙ্গালীর কাজে কথায় ঠিক নাই। বাঙ্গালী হইয়া অবশ্য আমরা নিজের মুখে এই কালী মাখিতে রাজি নই, কথাটা সত্যই হউক আর যাহাই হউক। বাঙ্গালী নবীন সেন বলিয়াছিলেন তাই আমরা উচ্চবাচ্য করি নাই, বড়লাট কর্জ্জন ঐ রকম একটা কথা বলায় আমরা কিন্তু বেজায় চটিয়া গিয়াছিলাম। সে যাহা হউক একটা কথা কিন্তু খুব খাঁটি যে বাঙ্গালীর লেখায় আর পড়ায় ঠিক নাই, বাঙ্গালী আগুন লিখিয়া জল পড়ে না কিম্বা চাঁদ লিখিয়া ফাঁদ দেখে না, কিন্তু অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমাদের লেখা আর পড়া, বা বলা আর লেখা এক নয়। "অনেক" আর "এক" এই দুইএর "এ" আমরা এক রকম পড়ি না। বর্ত্তমান "কাল", "কাল" চোখ—এই দুই জায়গায় "কা ল" এর উচ্চারণে অনেক তফাৎ। সে তোমার "মত", তোমার "মত" কি—এখানেও দুই "ম তে"র দুই উচ্চারণ।

আমাদের যে কেবল স্বরেই শঠতা তাহা নয়, ব্যঞ্জনেও আমাদের গোলযোগ কম নয়। গৃহলক্ষ্মীরা ব্যঞ্জনের দোষের কথা শুনিয়া অবশ্য আমার উপর চটিবেন না। এ ব্যঞ্জন ভাষার ব্যঞ্জন। কানে শোনা আর কানের সোনা—এখানে "শোনা" আর "সোনা" শুনিতে একই, কিন্তু চেহারায় আলাদা। তিনি যান, তুমি জান,—এখানেও আমাদের বলা ও লেখা এক নয়। এই রকম আরও অনেক গরমিল পাওয়া যাইবে।

স্বরাজ্য দল নাকি দো-ইয়ারকি ভাঙ্গিয়া এক-ইয়ারকি করিবেন। বাঙ্গালার বানান রাজ্যে যখন দো-ইয়ারকি দেখা যাইতেছে, তখন যদি কেহ তাহাকে এক-ইয়ারকি করিতে চায় সে কাজটা নিশ্চয়ই সময় স্রোতাবেক হইবে। পয়লা কথা এই যে, যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব অর্থাৎ যাহা সংস্কৃত থেকে ধার করিয়া বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লওয়া হয় নাই সেখানে বাঙ্গালার স্বরাজ্য চলিবে। ইহাতে বোধ হয় পুরানী রোশনীদের কোন অমত হইবে না। এই ধরুন ষত্ব ণত্বের কথা, ঐ দুইটা সংস্কৃতের জন্যই বাঁধা থাকিবে। অর্থাৎ কিনা এই দুইটা হইল সংস্কৃত বিভাগের জন্য রিজার্ভড্। ইহাতে অবশ্য নরম দল কোন আপত্তি করিবেন না। কিন্তু যখন দেখি নরম দলেরাই জিনিষ, পোষাক, কোরাণ, গভর্ণমেণ্ট, প্রভৃতি এলাকার বাহিরের বিষয়েও ষত্ব, ণত্বের কড়াকড়ি চালাইতেছেন, তখন মনটা বিদ্রোহী না হইয়া থাকিতে পারে না।

রূপক অলঙ্কার বাদ দিয়া সোজা কথায় বলিতে গেলে আমরা জানিতে চাই বাঙ্গালা বানান কি সংস্কৃতের হুবহু নকল হইবে, না উচ্চারণ অনুযায়ী হইবে? যদি বল সংস্কৃত অনুযায়ী হইবে, তবে প্রশ্ন উঠিবে সংস্কৃত অনুযায়ী কেন? তুমি হয়ত বলিবে সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষার জননী। এখানেই কিন্তু এক মহা খট্‌কা। বাঙ্গালা যদি সংস্কৃতের মেয়ে হইল তবে যে সময় সংস্কৃত বাঁচিয়াছিল সেই সময়েই বা ভাষাতত্ত্বের হিসাবে ঠিক তার পরেই বাঙ্গালার জন্মান দরকার ছিল। কিন্তু মহারাজ অশোকের পাথরের লেখা হইতেই প্রমাণ হইবে যে দু হাজার বছরের আগেই গোটা ভারতে সংস্কৃত মরিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা কিছু তত প্রাচীন নয়। বাঙ্গালার বয়স জোর হাজার বছর। এ কথা আমরা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্যাণে জানিয়াছি। বাঙ্গালার আগে অপভ্রংশ, প্রাকৃত, প্রাচীন প্রাকৃত (পালি যাহার একটি বুলি ছিল। কাজেই সংস্কৃতকে বাঙ্গালার মা না বলিয়া তাহাকে দিদিমার দিদিমা বলা যাইতে পারিত, যদি পালি ইত্যাদি প্রাচীন প্রাকৃত সংস্কৃতের মেয়ে বলিয়া সাব্যস্ত হইত। কিন্তু পালির কোষ্ঠী বিচার করিয়া অটো ফ্রাঙ্কে প্রভৃতি পণ্ডিতেরা

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সংস্কৃত পালির মা নয়। পিশেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন খালি তাহাই নয়, সংস্কৃত প্রাকৃতেরও মা নয়। তবুও তর্কের খাতিরে, যদি মানা যায় বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতেই বাহির হইয়াছে, তাহা হইলে বাঙ্গালার বানান যে সংস্কৃতের মতন হইবে তাহার হদিস কি? পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ কোনটাই ত সংস্কৃতের বানান মানে না। বাঙ্গালা মানিতে যাইবে কেন? পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ লিখে ভিক্‌খা, আমরা কেন লিখিব ভিক্ষা অর্থাৎ ভিক্‌ষা? পালি, প্রাকৃত লিখে দক্‌খিণ, আমরা কেন লিখিব দক্ষণ? পালি লিখে ঞাতি, ঞাণ, প্রাকৃত লিখে ণাই, ণাণ; আমরা কেন লিখিব জ্ঞাতি, জ্ঞান? মাগধী প্রাকৃত লিখে "শে", আমরা কেন লিখিব "সে"? পালি লিখে জিব্‌হা প্রাকৃত লিখে জিব্ভা, আমরা কেন লিখিব জিহ্বা? যদি সাবেক নজির মানিতে হয়, তবে বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের শাসনে আনা চলে না।

তবুও না হয় মানিয়া লইলাম যে সকল শব্দ সংস্কৃতেরই মত, অর্থাৎ যাহাকে বৈয়াকরণেরা বলেন "তৎসম" যেমন কোণ, শণ, যদি, সকল, ইত্যাদি—এগুলিকে সংস্কৃতের নিয়মেই লিখা উচিত। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, বরং একটু সূক্ষ্মরূপে বলিতে গেলে যে সকল শব্দ সংস্কৃতেও দেখা যায় আর বাঙ্গালাতেও কিছু বিগড়ান অবস্থায় দেখা যায় অর্থাৎ যাহাকে বৈয়াকরণেরা বলেন "তদ্ভব" যেমন কাণ, সোণা, ইত্যাদি,—সে গুলির বানান কেমন হইবে? যাঁহারা 'তৎসম' শব্দে সংস্কৃত বানান চালান, "তদ্ভব" শব্দ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিন্তু দুইমত দেখা যায়। একদল বলেন কর্ণে "ণ" আছে কাজেই "কাণে"ও "ণ" থাকিবে, স্বর্ণে "স" ও "ণ" আছে, কাজেই "সোণা"য় ও "স" ও "ণ" থাকিবে, বাঙ্গালায় প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে "স" এবং "ণ" এর "শ" ও "ন" উচ্চারণ হইলেই বা কি হয়? অর্থাৎ সংস্কৃতের বানান চালাও, উচ্চারণ টুচ্চারণ কিছুই দেখিবার দরকার নাই। ইঁহাদের মত কিন্তু ঠিক বুঝা যায় না। কারণ ইঁহারাই "যখন" "তখন" ইত্যাদি স্থানেও "ন" লিখেন। অথচ সংস্কৃতের "যৎক্ষণ" "তৎক্ষণ" আর বাঙ্গালার "যখন" "তখন" একই। এইমতে সে শোনে—এখানে ণ কেন হইবে না? শৃণোতি আর শোনে একই। ইঁহারা "রাণী"তে "ণ" লিখেন, অথচ সংস্কৃত রাজ্ঞীতে "ণ" নাই। আর এক দল বলেন সংস্কৃতে ণত্বের কারণ যে "র", তাহা যখন বাঙ্গালা তদ্ভব শব্দে নাই, তখন "এখন", "কান" ইত্যাদি রূপ "ন" যুক্ত বানানই শুদ্ধ। এটা একটা ন্যায়ের ফাঁকি। কারণ ণত্বের কারণ আগের "র" বা 'ষ" নয়, বরং সংস্কৃত ভাষায় র বা ষ এর পর ন এর উচ্চারণ বদলাইয়া ণ হইত, এই জন্য সেই ভাষায় উচ্চারণ অনুযায়ী ণ লেখা হইত। কোণ, গণ ইত্যাদি অন্য জায়গায়ও যেখানে সংস্কৃতের উচ্চারণ মত ণ হইত, সেখানেও আগে র, ষ না থাকিলে ণ লেখা হইত। আমরা যদি বাঙ্গালার খাঁটি উচ্চারণ না ধরি, তবে মূল বানান কেন রাখা যাইবে না? আর যদি বাঙ্গালার উচ্চারণ মানিয়া চলি, তবে "সোণা"র স এ আসিয়া থামিলে চলিবে না, একেবারে "শোনা"য় গিয়া তবে রেহাই পাইবে। যদি বল এ কি হইল স্বর্ণ আর শ্রবণ করা দুইই যদি শোনা হয়, তবে মানে বুঝিব কেমন করিয়া? আমি বলিব যদি গায়ের তিলে আর গাছের তিলে কোন গোল না ঠেকে, যদি গানের তালে আর গাছের তালে ঠোকাঠুঁকি না ঘটে; তবে স্বর্ণ শোনায় আর শ্রবণ শোনায়ও কোন হাঙ্গামা হইবে না। আসল কথা, ভাষার অক্ষরের মত শব্দ কখন দল ছাড়া হইয়া একেলা আসে না অক্ষর থাকে শব্দের সঙ্গে জড়াইয়া আর শব্দ থাকে বাক্যের মধ্যে মিশাইয়া। কাজেই মানে যদি আলাদা আলাদা হয়, তবে বানান বা উচ্চারণ এক হইলেও বুঝিবার গোলমাল বড় একটা হয় না।

যে দুই দলের কথা বলিতে ছিলাম, ইঁহাদের উভয়েরই কিন্তু কয়েকটী বে-আইনী কাজে বেশ মিল

দেখা যায়। তাহার মধ্যে একটা মস্ত ব্যাপার হইতেছে বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব এক করা। সংস্কৃতে এই দুয়ের উচ্চারণে ও কাজে অনেক তফাৎ। বর্গীয় ব এর উচ্চারণের জায়গা ঠোঁঠ আর অন্তঃস্থ ব এর ঠোঁঠ আর দাঁত। বর্গীয় বএর আগে ম্, মই থাকে, কিন্তু অন্তঃস্থ বএর আগে ম্ ং হয়; যেমন কিংবা। অন্তঃস্থ ব অবস্থা বিশেষে উ হয়; যেমন বাক্, উক্ত; কিন্তু বর্গীয় ব একেবারে নির্বিকার। যদি বল বাঙ্গালায় ত দুয়েরই উচ্চারণ এক। তবে আমি বলিব, বেশ কথা, যদি এই অজুহাতে দুই ব এক কর, তবে জ য, ণ ন, শ ষ স (স্থান, স্রোত ইত্যাদি শব্দ ছাড়া স) এক কর না কেন, সকল লেঠা চুকিয়া যাইবে।

দুই দলই লিখেন চুল, অথচ ইহা চূড়া হইতে। শোওয়া, অথচ ইহা স্বপ্ ধাতু হইতে, শী ধাতু হইতে নয়। বসা, অথচ ইহা উপবিশ্ হইতে, বস্ ধাতু হইতে নয়। গরু অথচ ইহা গো শব্দের উত্তর স্বার্থে রু প্রত্যয়দ্বারা সিদ্ধ। মূল অনুযায়ী বানান করিতে হইলে লিখিতে হইবে চুল, সোওয়া, বশা, গোরু।

আমরা দেখিলাম পুরানী রৌশনীদের অর্থাৎ সংস্কৃত-ভক্তদের (আমিও বাদ নই) মতের ঠিক নাই, বলা ও লেখার মিল নাই, লেখা ও পড়ার ঐক্য নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি বানান জিনিসটা কি? বানান কি অক্ষর দিয়া একটি ভাষার শব্দ প্রকাশ বা পরিচয় করিবার নাম নয়? তাহা হইলে বানান সেই ভাষার উচ্চারণের পরিচয়কারী হওয়া দরকার। এই হইল বানানের আসল উদ্দেশ্য। গোড়ায় বানান এই রকম উচ্চারণ অনুযায়ীই (phonetic) থাকে। কিন্তু যখন উচ্চারণ কালক্রমে বদলাইয়া যায়, তখন যদ্ধি সাবেক বানানই বজায় রাখা হয়, তবে বানান একটা আচারের মত (conventional) হইয়া দাঁড়ায়। তখন বানান শব্দের উচ্চারণকে সাক্ষাদ্রূপে না চিনাইয়া বরং তার ব্যুৎপত্তি বা ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া দাঁড়ায়। ইংরাজির বানান এইরূপ। Know, Knee, Knave প্রভৃতির K এক সময় উচ্চারণ করা হইত। K থাকাতে Know, Knee যে সংস্কৃত জ্ঞা, জানুর সঙ্গে এক এবং Knee, Knave জার্ম্মান ভাষার Kniu, Knabe র সহিত এক বুঝিতে পারি। বলা আবশ্যক জার্ম্মান ভাষায় এইরূপ জায়গায় K র উচ্চারণ আছে। সে যাহাই হউক এইরূপ বানানকে আমরা কখন বর্ত্তমান ইংরাজির প্রকৃত বানান বলিতে পারি না। বাঙ্গালা বানানেরও অবস্থা তাই। ইংল্যাণ্ডে এই বানান দুরস্ত করিবার জন্য সভা সমিতি করিয়া চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু ইংরাজ জাতির গোঁড়ামির জন্য বড় বেশী কাজ হইয়া উঠে নাই। বাঙ্গালা বানানেরও মেরামত হওয়া দরকার। পালি প্রাকৃতের বানান যেমন উচ্চারণ অনুযায়ী ছিল, বাঙ্গালার বানানও তেমনটি হওয়া চাই। বাস্তবিক আমাদের যে বানান, তাহা এক মুঠা লোকের জন্য; দেশের আপামর সাধারণ তাহা এখন মানে না, আগেও মানিত না। যদি বিশ্বাস না হয়, যে কোন পুরান পুঁথি বা আদালতের নথি কিংবা ডাকঘরের চিঠির বাক্স সার্চ করিয়া দেখ। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হইলে যে এখন পাঁচ বছর বাঙ্গালা শিখিয়াও বানান ভুল করিয়া ফেলে, সে দু এক মাসে বানান শিখিতে পারিবে। ইহা আমাদের মত মূর্খের দেশে বড় কম একটা লাভ নয়। উচ্চারণ মত বানান সংস্কার করিলে বানান কি রকম হইবে, এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব।

প্রথমে বাঙ্গালা স্বরের কথা ধরা হউক। আগে ছিল বর্ণমালায় যোলটি স্বর—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ৯, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণমালা হইতে ৠ, ৡ, একেবারে বাদ দিয়া এবং "ং", "ঃ"কে ব্যঞ্জন বর্ণের ভিতর পুরিয়া স্বরবর্ণকে বারটি করেন। তিনি ৯ কে অনায়াসে বাদ দিতে পারিতেন। কেন দেন নাই জানি না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালায় একটি

(Monophthong) হ্রস্ব স্বর আছে নয়টি এবং জোড় (Diphthong) হ্রস্বস্বর আছে উনিশটী, মোট এই ২৮টি হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘও আছে আটাইশটি। এক্ষুনে বাঙ্গালার স্বর ছাপ্পান্নটি। হ্রস্ব স্বরগুলি নিয়ে লিখিতেছি।

(ক) একটি স্বর—

হ্রস্ব	আ	যেমন	আমি
	অ		অকাল
	ই		তুমি
	উ		রুটি
হ্রস্ব	ও		মোটা
বিকৃত হ্রস্ব ও			ক'নে (কন্যা), ব'লে (বলিয়া)
বিকৃত হ্রস্ব আ			চা'লের (চাউলের)
বিকৃত হ্রস্ব এ			কে'মন
হ্রস্ব এ			রাখে

(খ) জোড় স্বর—

	অএ	যেমন	পয়সা
	অও		হও
	আই		দাই
	আউ		ঝাউ
	আও		পাওনা
	আএ		হায়
	ইই		আমিই
	ইউ		শিউলী
	উই		দুই
	ওই		মই (=মোই)
	ওউ		মউ (=মোউ)
	ওএ		দোয় (দোহন করে)
	ওও		দোও (দোহন কর)
বিকৃত	এও		দে'ও
বিকৃত	এএ		দে'য়
	এই		খেই
	এউ		ঢেউ
	এএ		পেয় (পান করে)
	এও		পেও (পান কর)

একটি নয়টি স্বরের মধ্যে কেবল মাত্র তিনটি বর্ত্তমান অক্ষর দ্বারা দেখান যাইতে পারে। বাকী গুলি দেখান যায় না। সংস্কৃতের আ, এ, ও দীর্ঘ। বাঙ্গালায় কিন্তু এইগুলি হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়ই। প্রাকৃতেও হ্রস্ব এ, হ্রস্ব ও ছিল। নয়টি একটি দীর্ঘস্বরের মধ্যে কেবল পাঁচটি বাঙ্গালা অক্ষরে দেখান যায় যেমন আ,ঈ,ঊ,এ,ও। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে মোট আঠারটি একটি স্বরের জন্য আটটি মাত্র হরফ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ঋ, ৯র খাঁটি উচ্চারণ নাই। পালি প্রাকৃতেও ছিল না। সংস্কৃত বাঙ্গালা হরফে লিখিবার জন্য এই দুইটির দরকার হইতে পারে। সেই রকম ৠ, বৈদিক ল, ঃ প্রভৃতি অক্ষরের দরকার পড়িতে পারে। তাই বলিয়া এগুলি বাঙ্গালা বর্ণমালায় থাকিতে পারে না। জোড় স্বরের মধ্যে বাঙ্গালা হরফের কেবল ঐ, ঔ আছে। কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ সংস্কৃতের মত আই, আউ নয়, ওই ওউ। বাকীগুলির জন্য কোনও হরফ নাই। এখন যদি আমাদিগকে উচ্চারণ অনুযায়ী বাঙ্গালায় লিখিতে হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে নয়টি একটি হ্রস্বস্বর এবং উনিশটি জোড় হ্রস্বস্বরের জন্য আলাদা আলাদা হরফ চাই। আমাদের পুঁজি কিন্তু একটি হ্রস্ব তিনটি হরফ এবং জোড় হ্রস্ব দুটি হরফ। তাহা হইলে তেইশটি হরফ নূতন গড়া দরকার। কিন্তু সে ত এক বিরাট ব্যাপার।

আমরা কৌশল করিয়া অল্প অক্ষর দ্বারা এই সব উচ্চারণ দেখাইতে পারি। এখন প্রায় সকলেই বিকৃত "ও" বিকৃত 'আ'-র জন্য apostrophe দিয়া লিখেন, যেমন ব'লে (বলিয়া) কা'ল (কল্য)। আমরা ইহা মঞ্জুর করিয়া লইতে পারি। তবে বিকৃত "এ"-র জন্য 'অ্যা' দেওয়া মোটেই সঙ্গত হয় না। এক (অ্যাক) লিখা কিম্ভূত কিমাকার। তারচেয়ে বিকৃত "আ" ও বিকৃত "ও" র ন্যায় বিকৃত "এ"র জন্য এ' লেখা মন্দ নয়। জর্ম্মান

ভাষার ä ö ü র মত বাঙ্গালায় অ' আ' এ' চলিতে আপত্তি কি? যত তত প্রভৃতি শব্দের শেষের হ্রস্ব ওকার দেখাইবার জন্য অক্ষরের নীচে কষি দিলেই চলিতে পারে যেমন যত্, তত্, অতি, ছোট্ ইত্যাদি। এই প্রস্তাবটি অবশ্য নূতন নয়। কেহ কেহ শেষের উচ্চারিত হ্রস্ব ওকারের জন্য ওকার লিখেন যেমন মতো। কিন্তু আগের হ্রস্ব ওকার দেখাইবার উপায় কি? যদি সেখানেও ওকার লিখি, তাহা হইলে মত স্থানে মোতো, অতি স্থানে ওতি লিখা দরকার হইবে এবং মতি লিখিতে মোতি, করি লিখিতে কোরি লিখিতে হইবে। জোড় হ্রস্ব স্বরের জন্য বাঙ্গালা স্বরবর্ণের ঐ, ঔ বাদ দিয়া সতরটি হরফ দরকার। এই সতরটি হরফ না গড়িয়া বরং আমরা ঐ, ঔ-কে বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে বাদ দিতে পারি। পালি ও প্রাকৃতেও ঐ, ঔ নাই। তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাব অনুসারে হ্রস্ব স্বরগুলি এই হইবে যথা—অ আ ই উ এ ও অ' আ' এ'। ইহার সহিত পালি ও প্রাকৃতের স্বরবর্ণ আমরা তুলনা করিতে পারি,—অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও। দীর্ঘস্বরের জন্য কোন আলাদা হরফের দরকার নাই। তবে দীর্ঘস্বর বুঝাইবার জন্য কোন চিহ্ন হইবে কিনা? যেমন সংস্কৃত ইত্যাদির রোমান অক্ষরে অনুলেখনে (transliteration) স্বরবর্ণের উপর দীর্ঘ চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে, আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালায় তাহার কোন দরকার নাই। বাঙ্গালা উচ্চারণের নিয়মেই হ্রস্ব দীর্ঘ ধরা পড়ে—যেমন হসন্ত বর্ণের আগের স্বর দীর্ঘ হয়। বাস্তবিক যেখানে আমরা সংস্কৃতের অনুকরণে হ্রস্বদীর্ঘ লিখি, বাঙ্গালা উচ্চারণ অনেক জায়গায় তাহার বিপরীত-যেমন "সীতা" এবং "মিতা" এখানে "সী" ও "মি" উভয়েরই উচ্চারণ হ্রস্ব। "মীন" "দিন" এখানে "মী" "দি" উভয়েরই উচ্চারণ দীর্ঘ। কাজেই "শিতা" "মিন" লিখিলে বাঙ্গালা উচ্চারণ দস্তুরমত বুঝা যাইবে।

এখন ব্যঞ্জন লইয়া কথা। ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে কতকগুলি বে-দরকারী অক্ষর আছে, যেমন ণ, য, অন্তঃস্থ ব, ষ, স। "স"র খাটি উচ্চারণ ঋ, ত, থ, ন, র এর সঙ্গে মিলা অবস্থায় দেখা যায় যেমন, সৃত, হস্ত, স্থান, স্নান, স্রাব। ঋ র ন এর সহিত "শ" মিলিলেও 'শ' র উচ্চারণ 'স' র মত হয় যেমন শৃগাল, আশ্রিত, প্রশ্ন। কিন্তু সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় 'স' র উচ্চারণ নাই এবং 'শ' র উচ্চারণ আছে। এই জন্য বাঙ্গালা ব্যঞ্জন বর্ণ হইতে ণ, য, ষ, স বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অন্তঃস্থ ব সম্বন্ধে একটু কথা আছে। বিদ্যা, বীণা প্রভৃতি শব্দে যেখানে সংস্কৃতে অন্তঃস্থ ব আছে, বাঙ্গালার উচ্চারণ মত বর্গীয় ব লেখা হয় এবং তাহাই উচিত। কিন্তু খাওয়া, পাওয়া প্রভৃতি বাঙ্গালা শব্দে অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ আছে। সে জন্য আসামীর মত অন্তঃস্থ ব্, বাঙ্গালায় দরকার। পালি ভাষায় শ ষ নাই। মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে ন, শ, ষ, য নাই, মাগধী প্রাকৃতে ন, স ষ, জ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তঃস্থ 'ব'কে বর্গীয় 'ব' র সহিত একাকার করিয়া প্রকারান্তরে এক 'ব' স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আর একটু সাহসী হইলে জ য, ণ ন এবং শ ষ স এগুলিকেও একাকারে আনিতে পারিতেন। ঙ, ঞ-র উচ্চারণ বাঙ্গালায় আছে, কিন্তু হিন্দীর ন্যায় 'ং' দ্বারা এই দুইয়েরই কাজ অনায়াসে চলিতে পারে। অতএব 'ঙ', 'ঞ' বাদ দেওয়া চলে। 'ঃ' এর উচ্চারণ 'হ্' কিম্বা পরের অক্ষরের দ্বিত্ব দ্বারা চলে। যেমন দুঃখ স্থানে দুহ্খ বা দুক্খ। পালি ও প্রাকৃতেও ঃ নাই। আমাদের প্রস্তাবিত ব্যঞ্জনগুলি এই হইবে।

ক খ গ ঘ। চ ছ জ ঝ। ট ঠ ড ঢ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। র ল। শ হ। ং ঁ। ড় ঢ়। য় অন্তঃস্থ ব্।

এখন যুক্তাক্ষরের পালা। বাঙ্গালায় য ফলা ও ব ফলার কোন সার্থকতা নাই। উভয়ের দ্বারা অক্ষরের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। তবে 'য' ফলায় আগের 'অ' 'ও'রূপে এবং 'আ' বিকৃতরূপে উচ্চারিত হয়। 'জ্ঞ'র উচ্চারণ 'গ'র মত। কখনও "গে"র মত, যেমন জ্ঞান বাঙ্গালা উচ্চারণে গেঁন,

কিন্তু বাঙ্গালা উচ্চারণে বিসর্গ। 'ম' ফলায়ও বাঙ্গালার কোন দরকার নাই। উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিতে গেলে শ্মশান হইবে শঁশান, পদ্ম হইবে পদ্দঁ। 'ক্ষ'র উচ্চারণ সংস্কৃতে ক্ষ; কিন্তু বাঙ্গালার ক্‌খ, প্রাকৃতেও এইরূপ ছিল এবং এইরূপ লিখা হইত। বাঙ্গালায় ও 'ক্ষ'র বদলে ক্‌খ চলিবে না কেন? হ্র হৃ বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারিত হয় rha, rhi অর্থাৎ 'র'এর মহাপ্রাণরূপে (aspirate)। এইরূপ 'হ্ল'র উচ্চারণ বাঙ্গলায় lha এবং হ্ন হ্ণ এর উচ্চারণ nha। বাঙ্গালায় তিনটী হরফ এই জন্য না গড়িয়া র্‌হ, ল্‌হ, ন্‌হ দ্বারা কাজ চালান যাইতে পারে। আমি এখন উদাহরণের সহিত যুক্তাক্ষরগুলির সংস্কৃত, পালি, ও প্রাকৃত রূপ দিতেছি।

	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
ক্য	ইত্যাদি শক্য,	ক্ক সক্ক,	ক্ক সক্ক
ক্ক	ইত্যাদি কথিত	ক, ক্ক কথিত্ত	ক, ক্ক, কহিঅ
	পক্ক,	পক্ক,	পক্ক,
গ্ম	ইত্যাদি, ছদ্ম	ছদ্দ	
	যুগ্ম		জুগ্‌গ
য্য	শয্যা	য্য সয্যা	জ্জ সজ্জা
হ্য	সহ্য	য্‌হ, সয্‌হ	জ্‌ঝ সজ্‌ঝ
হ্ব	জিহ্বা	ব্‌হ জিব্‌হা	ব্‌ভ, জিব্‌ভা
হ্ম	জিহ্ম	ম্‌হ জিম্‌হ	ম্‌হ, জিম্‌হ
হ্ন	চিহ্ন	ন্‌হ চিন্‌হ	ণ্‌হ, চিণ্‌হ
হ্ণ	অপরাহ্ণ	ণ্‌হ অপরণ্‌হ	ণ্‌হ অবরণ্‌হ
হ্ল	কহ্লার	কল্লহার	ল্‌হ, কল্‌হার
ক্ষ	ক্ষীর, যক্ষ,	খ, ক্‌খ খীর, যক্‌খ	খ, ক্‌খ খীর, জক্‌খ
জ্ঞ	জ্ঞান, যজ্ঞ	ঞ,ঞ্ঞ,ঞাণ, যঞ্ঞ	ণ, ণ্ণ ণাণ, জণ্ণ
র্য্য	কার্য্য	য্য, কয্য	জ্জ কজ্জ
ক্ষ্ম	লক্ষ্মণ	লক্‌খণ	লক্‌খণ
ক্ষ্ণ	তীক্ষ্ণ	তিখিণ, তিক্‌ণ	তিক্‌খ, তিণ্‌হ

এখন কথা হইতেছে এই উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান চলিবে কি? ইহার সোজা উত্তর দশজনে এই রকম লিখা ধরিলেই ক্রমে চলিবে। ইহার জন্য চাই শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি ও নৈতিক সাহস।

উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের বিপক্ষে কেহ হয় ত বলিবেন যে উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশের সকল জায়গায় এক নয়। কলিকাতার লোকে বলে হাঁশি (হাসি), শ্যাখারি (শাঁখারি) ইত্যাদি; ঢাকা অঞ্চলের লোকে বলে কাপর (কাপড়), পরা (পড়া), বাত (ভাত), Zal (জল), tsal (চল) ইত্যাদি। প্রত্যেক স্থানের উচ্চারণের কিছু না কিছু রকমারি আছে। এখন কোন্ জায়গার উচ্চারণ ধরিয়া বানান করা যাইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে যেমন প্রত্যেক স্থানের বুলির বেশী বা কম তফাৎ থাকিলেও লেখ্য ভাষায় এক সাধারণ ভাষা (standard language) ব্যবহার করা হয়, তেমনি একটা সাধারণ শিষ্ট উচ্চারণ আছে, যাহা স্কুল কলেজে শিখান হয় এবং পাঁচ জায়গার ভদ্রলোক এক জায়গায় হইলে কথাবার্ত্তায় বা বক্তৃতায় ব্যবহার করা হয়। এই সাধারণ শিষ্ট উচ্চারণ মতই লেখা হইবে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন এইরূপ বানানে শব্দের নাড়ীর ঠিক পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি বুঝা যাইবে না। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আনাড়ী না বুঝিতে পারেন, কিন্তু পণ্ডিতের বুঝিতে গোল ঠেকিবে না। যদি ব্যুৎপত্তির উপরই জোর দিতে হয়, তবে বাঙ্গালা ভাষা তিব্বতী ভাষার মত হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিতে হইবে মস্তক পড়িতে হইবে মাথা, লিখিতে হইবে উপাধ্যায় পড়িতে হইবে ওঝা, লিখিতে হইবে ঘোটক পড়িতে হইবে ঘোড়া। এরূপ যদি অসহ্য হয়, তবে ভিক্ষা (ভিক্‌ষা) লিখিয়া কেন ভিক্‌খা পড়া হইবে, জ্ঞান (জ্‌ঞান) লিখিয়া কেন গেঁ'ন (গ্যান) পড়া হইবে? অন্য পক্ষে, যদি পক্ষী স্থানে পাখী লেখা অশুদ্ধ না হয়, তবে ক্ষেত্র, ক্ষীর স্থানে খেত, খীর কেন অশুদ্ধ হইবে? যদি রাজ্ঞী স্থানে রাণী অশুদ্ধ না হয়, তবে জ্ঞাতি স্থানে বা গেঁ'তি কেন অশুদ্ধ হইবে?? সংস্কৃত-অনুযায়ী বানানের পক্ষকে আমরা বলিব, পয়লা বাঙ্গালীর জিভকে সংস্কৃত করুন, তা'রপর বানান সংস্কৃতের মত লিখিবেন। কিন্তু সে কি সম্ভব?

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
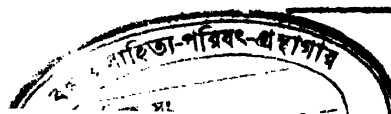
প্রয়াসী।

কবে দৃষ্টি হ'বে থির্
নয়ন হ'বে পলক বিহীন
নিশ্বাস্ ব'বে ধীর্!
ভয় ভাবনা দ্বন্দ্ব কবে
শূণ্যে স্বতঃই বিলীন্ হ'বে,
আকাশ সম হৃদয় র'বে
শান্ত সুগভীর!

হ'য়ে আকাশ সমাসীন্
শুন্‌ব প্রাণে কেমন্ ধ্বনে
মন্-জাগান বীণ্!
দেখ্‌ব ও'সে তিমির মোহে
ভাব বিকাশী বাঞ্ছা ল'য়ে
কেমন জাগে তপ্ত লোহে
বিশ্ব গীতি-মীড়্!

দেখি উদয় অবসান
মুক্ত হ'ব ত্যজ্য করি
সকল অভিমান্!
চিত্ত দিব বিলয় যোগে—
কায কি বৃথা কর্ম্মভোগে
শান্তি পা'ব সকল শোকে
ভূমায় স্থিত ধীর্!
কবে দৃষ্টি হ'বে থির্!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বেদান্ত দর্শন।

অদ্বৈতবাদ।

কুসুমাঞ্জলি লিখিতে বসিয়া সেকালের প্রধান নৈয়ায়িক আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছিলেন,

> ন্যায় চর্চ্চেয় মীসস্য মনন ব্যাপ দেশ ভাক্।
> উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবনানন্তরা গতা॥

আমি ঈশ্বর নিরুপনের অভিলাষী নহে। আত্মাশ্রোতব্যা মন্তব্যঃ নিধিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধ, আত্মার শ্রবনানন্তর কর্ত্তব্য—মননাখ্য উপাসনা মাত্রই করি", আমার পক্ষে ব্রহ্ম নিরুপন বা বেদান্ত দর্শনের উপদেশ দেওয়া ধৃষ্টতামাত্র হইলেও ব্রহ্মোপাসনায় লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই, বেদান্ত দর্শন শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার প্রমাণ পাইয়াছি, কথঞ্চিত সিদ্ধিলাভ করিলে কৃতার্থ হইব।

যদিও আমাদের বেদ মন্ত্রানুসারে এক, তথাপি সাম, যজুঃ, ঋক, ভেদে তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যে সকল মন্ত্র গান করিবার যোগ্য ঐ সকল মন্ত্র লইয়া সামবেদ, যে সকল মন্ত্রের ছন্দো নাই, গান করিবারও উপযুক্ত নহে ঐ সকল মন্ত্র লইয়া যজুর্ব্বেদ, আর যে সকল মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ, ঐ সকল লইয়া ঋক্‌বেদ নামে পরিচিত হইয়াছে, প্রত্যেক বেদেই প্রত্যেক বেদের অল্প বিস্তর মন্ত্র আছে। সামবেদেও ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র আছে—ঋকবেদেও সাম ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র আছে। যজুর্ব্বেদেও সাম ও ঋক বেদের মন্ত্র আছে। যে বেদে যেরূপ মন্ত্রের আধিক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, সেই বেদ সেই ২ নামে পরিচিত হইয়াছে। সামবেদে গানের উপযুক্ত মন্ত্র অধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং উহার নাম সামবেদ হইয়াছে, ঋক্ যজুর্ব্বেদও ঐরূপ মন্ত্রের আধিক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় উহারাও যথাক্রমে ঋকবেদ ও যজুর্ব্বেদ নামে পরিচিত হইয়াছে। কার্য্য বিশেষে প্রয়োগ করিবার

জন্য, উক্ত বেদত্রয় হইতে কতকগুলি মন্ত্র একত্রিত হইয়া অথর্ব্ববেদ নাম লইয়া আর একখানি বেদ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, পরাশরাত্মজ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এইরূপে বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন. বেদ প্রথমতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া বেদের অপর একটা নাম "ত্রয়ী" বেদ নিত্য, নির্দ্দোষ ও সনাতন বস্তু, কোন্ দিন এই বেদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার কোনই নিদর্শন নাই।

ন কশ্চিদ্বেদ কর্ত্তাস্তি বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ।

বেদান্ত-মতে বেদকর্ত্তা কেহ নাই, নিত্য ও নির্দ্দোষ বলিয়া বেদের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য, অন্যান্য মতে বেদের প্রামাণ্য অন্য প্রকারে স্বীকার করিয়াছে, ফলতঃ বেদ-যে সর্ব্বদা প্রমাণ পদার্থ সে বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ নাই, অন্ততঃ তাহা আমরা জানি না, ভ্রম-প্রমাদ শূন্য পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চারিত আপ্ত বাক্য সনাতন নিত্য নির্দ্দোষ বেদ, কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ড ভেদ দুই ভাগে বিভক্ত। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড, আরণ্যক ও উপনিষদ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্ম ব্যতীত যে জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে, তাহারও নিদর্শন এখানেই পাওয়া যাইতেছে, কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানলাভ সম্ভব হইলে বিপর্য্যস্তভাবে উপদেশও সম্ভব হইত, বলিয়া মনে হইতেছে।

জ্ঞান কাণ্ডই বেদের শেষ ভাগ বা অন্ত। সেই শেষ ভাগ লইয়াই বেদান্ত দর্শন প্রণীত হইয়াছে। সেই জন্য এই দর্শনকে বেদান্ত দর্শন বলিয়া থাকে। মীমাংসা দর্শন যেমন সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রূপ বেদ ভাগের বিরোধ ভঞ্জন ও সামঞ্জস্য বিধানে নিযুক্ত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনও তেমনি আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগের বিরোধ ভঞ্জন ও সামঞ্জস্য বিধানে প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনকে কেহ ২ উত্তর মীমাংসাও বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই জন্য বেদান্তকে কেহ ২ ব্রহ্মসূত্রও বলিয়া থাকেন। মহর্ষি বেদব্যাস, বাদরায়ন বা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শন চতুর্থাশ্রমীর আলোচ্য বিষয় বলিয়া ইহাকে ভিক্ষুসূত্রও বলিয়া থাকে; চতুর্থাশ্রমীর অপর নাম ভিক্ষু। বেদান্ত দর্শনে সর্ব্বসমেত ৫৫৬-টী সূত্র আছে। বেদান্ত চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটী করিয়া পাদে বিভক্ত। প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ বেদবাক্য সমূহের সমন্বয় দেখান হইয়াছে। সেই-জন্যই প্রথমাধ্যায়ের নাম, সমন্বয় অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনের মত যুক্তি তর্ক প্রদর্শন পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া বেদান্ত মতের অবিরোধ স্থাপন করা হইয়াছে। সেইজন্য দ্বিতীয়াধ্যায়ের নাম অবিরোধ অধ্যায়। তৃতীয়াধ্যায়ে জীব ও ব্রহ্মের যথাযথ লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সাধনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ হেতু সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। সেইজন্য তৃতীয়াধ্যায়ের নাম সাধন অধ্যায়। চতুর্থাধ্যায়কে ফলাধ্যায় বলিয়া থাকে। চতুর্থাধ্যায় জীবন্মুক্তি জীবের উতক্রান্তি, সগুন নির্গুন ভেদে ব্রহ্মের উপাসনার তারতম্য দেখান হইয়াছে। যথাক্রমে, সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল, অধ্যায় চতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বেদান্ত দর্শনের অনেকগুলি ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য; রামানুজের শ্রীভাষ্য, ও মধ্বাচার্য্যের পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্যই বিশেষরূপ উল্লেখ যোগ্য। যথাক্রমে উক্ত ভাষ্যত্রয়ে অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত, ও দ্বৈতবাদ উক্ত হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে অদ্বৈত বাদ প্রকাশ করিয়াছেন, রামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ সমর্থন করিয়াছেন, মধ্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্যে দ্বৈত বাদ প্রচার করিয়াছেন। বেদব্যাসকৃত বেদান্ত সূত্রগুলি এতই সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে, যে কাহারই স্বস্ব মত সমর্থন করিতে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই। কেবল বেদান্তসূত্র কেন আর্য্য দর্শনই বলুন, বিজ্ঞানই বলুন, ধর্ম্ম শাস্ত্রই বলুন, নিতিশাস্ত্রই হউক, সকলই এমন কি বেদ পর্য্যন্তও অধিকারি ভেদে ভিন্ন ২ ব্যাখ্যায় ভিন্ন ২ পথে চালিত হইয়াছে। সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত প্রকৃত পথ খুঁজিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে সুকঠিন।

অদ্বৈত বাদ প্রচারক আচার্য্য শঙ্করের বেদান্ত দর্শনের

ব্যাখ্যাই সর্ব্বত্র সমধিক প্রচারিত হইয়াছে। রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরও কতক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্বাচার্য্যের পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্যের প্রচলন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, বেদান্ত দর্শনের যত প্রকার ব্যাখ্যা বা ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অদ্বৈত বাদই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেইজন্ত বেদান্ত দর্শন অদ্বৈতবাদী ইহাই অধিকাংশের ধারণা।

অদ্বৈতমতের প্রধানাচার্য্য আচার্য্য শঙ্কর, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধানাচার্য্য আচার্য্য রামানুজ, দ্বৈতবাদের প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্ মধ্বচার্য্য, ইহারা কেহই ঐ ঐ মতের প্রবর্ত্তক নহে, কেহই এই সকল মত সৃষ্টি করেন নাই। শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বচার্য্যের পূর্ব্বেও,ঐ ঐ মত প্রচারিত হইয়াছিল। গৌড়পাদ নির্ম্মিত মাণ্ডুক্য কারিকায় যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বৈতমতের পরিণতাবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। রামানুজের পূর্ব্বেও, বোধায়ন, টঙ্ক প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচার করিয়াছেন, দ্বৈতবাদের তো কথাই নাই, গৌতম কণাদ প্রভৃতি ইহাদের সকলের পূর্ব্বে দ্বৈতবাদপ্রচার করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর কৃত শারীরিক ভাষ্যের টীকাও অনেকগুলি আছে, তন্মধ্যে বাচস্পতিমিশ্রকৃত ভামতী টীকাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, আনন্দ গিরি নামক একখানা টীকারও কতক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। রামানুজকৃত শ্রীভাষ্যেরও টীকা সুদর্শন দেব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ঐ টীকার নাম শ্রুত প্রকাশিকা, বেদান্ত দর্শনের অন্য প্রকার, বহুবিধ ভাষ্য আছে, তন্মধ্যে, বিজ্ঞান ভিক্ষু, যাদব মিশ্র, নিম্বার্ক, ভাস্কর, বল্লভ ও শ্রীকণ্ঠের নামও উল্লেখ যোগ্য।

অদ্বৈতবাদ বুঝিবার সুবিধার জন্য, অদ্বৈতবাদীগণ বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চদশী, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, চিৎসুখী, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলি, প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে অদ্বৈত মত পোষণ করিয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পোষণ করিবার জন্যও বহুবিধ গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তন্মধ্যে বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তপ্রদীপ, বেদান্তসার প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর, উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল, আবর্ত্তবহুল, ঘোর সংসারসাগর নিমগ্ন জীব সকল কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির অতি মাত্র তাড়নায় বিবিধ দুঃখানুবিদ্ধ হইয়া, রোগে শোকে জরাজীর্ণ হইতেছে দেখিয়া, জীবসকলের মঙ্গল কামনায়, অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদী শঙ্কর, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ—এই শ্রুতি বাক্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া অন্যান্য বহুবিধ শ্রুতি ও স্মৃতি,—উক্ত শ্রুতি বাক্যের সহায়কভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন, পরমত সকল যুক্তি ও তর্কদ্বারা নিরাশ করিয়াছেন। নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। "নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাবং প্রত্যক্ চৈতন্য মেব আত্মতত্বং", এই শ্রুতিদ্বারা আত্মবাদের প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ সমর্থনের জন্য শঙ্করাচার্য্য যতগুলি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে, ব্রহ্মবিন্দু হইতে উদ্ধৃত।

একত্রবতু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবত্॥

ছান্দোগ্য হইতে উদ্ধৃত, সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীত্। এক মেবাদ্বিতীয়ং।

ঐতরেয় হইতে উদ্ধৃত, আত্মা বা ইদমেকং এবাগ্রআসীত্।

নৃসিংহতাপনি হইতে উদ্ধৃত। ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং।

বৃহদারণ্যক হইতে উদ্ধৃত। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

শ্বেতাশ্বতর হইতে উদ্ধৃত। যস্মাত্ পরং নাপরং নাস্তি কিঞ্চিত্।

ছান্দোগ্য হইতে উদ্ধৃত, সএবাধস্তাত্, স উপরিষ্টাত্, সপশ্চাত্, সদক্ষিণতঃ। স উত্তরতঃ, সত্রেবেদং সর্ব্বং, এই শ্রুতিগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

উদ্ধৃত শ্রুতি সমূহের দ্বারা বুঝাইতেছে, যে,যেরূপ একমাত্র চন্দ্র, জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু প্রকারে উপলব্ধি গোচর হইয়া থাকে, আত্মা তদ্রূপ এক হইলেও প্রত্যেক ভূতে সমভাবে বিরাজ করিতেছে। প্রথমতঃ একমাত্র সত্ আত্মাই

বিদ্যমান ছিল, জগত্ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। আত্মাতে কোন বস্তুর ভেদ নাই, আত্মা হইতে অপর আর কিছুই নাই। আত্মাই অধোদেশে বিরাজ করিতেছে, আত্মাই উর্দ্ধদেশে অবস্থিত, আত্মাই সম্মুখে রহিয়াছে, পশ্চাতেও আত্মাই আছে, উত্তরে দক্ষিণেও আত্মাই বর্ত্তমান, এই জগত্ এই জীব সকলই আত্মা, এই সকল শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, একমেবাদ্বিতীয়ং, সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, অর্থাত্ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম এক, জীবসকল তাহার ছায়া মাত্র, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু নাই, ব্রহ্মই জগতের উপাদান ব্রহ্মই জগতের উপাদেয়, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত, ব্রহ্মই জগতের নৈমিত্তিক, কার্য্য কারণে কোনই ভেদ নাই, যেরূপ তণ্ডুলঃ পিণ্ড ও রশ্মির কোনরূপ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেরূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টি ব্যতীত বন ও বৃক্ষের ভেদ নাই, যেরূপ জলের আধিক্য ও অল্পতা ব্যতীত নদী ও সমুদ্রের কোনরূপ ভেদ নাই, সেইরূপ নাম সজ্ঞা ও রূপ ব্যতীত জীব ও ব্রহ্মের কোনরূপ ভেদ নাই।

অদ্বৈতবাদী মতে জগতে ত্রিবিধ পদার্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে, কতগুলি তাত্ত্বিক কতগুলি ব্যবহারিক, কতগুলি প্রাতিভাষিক, জগতের লোকের ব্যবহারের জন্য অর্থাত্ সাধারণ লোকের সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহারাই ব্যবহারিক নামের যোগ্য ও ঐ সকল বস্তুই ব্যবহারিসত্ত্বায় সত্তাবান্, ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট বস্তুর উদাহরণ রূপে, মনুষ্য পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সকল বস্তু গুলি কেবলমাত্র ভ্রমের উপাদান যাহা দ্বারা কোনরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়না, তাহারাই প্রাতিভাষিক নামের নামী, যেরূপ রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি, সংসার পরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবার পোষ্যে মমত্ব জ্ঞান, ইহারাই প্রাতিভাষিকের উদাহরণ স্থল। তাত্ত্বিক বস্তুই ব্রহ্ম। যাহাতে সমস্ত দ্বন্দেই চির সমন্বয় হইয়া থাকে, যাহা হইতে জীব সকল বিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহাতে পরিদৃশ্যমান জীব জন্তু সকলই লীন হইয়া যাইবে, যাহার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানে নিখিল বস্তু উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, যাহাকে জানিতে পারিলে জগতে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না, তিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা তিনিই ঈশ্বর ইহাকে অদ্বিতীয় মত্ বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বরূপ নির্ব্বাহক ও তটস্থ। সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, শ্রুতিতে এইরূপ যে সকল বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ব্বাহক লক্ষণ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্, যতোইমানি ভূতানি জায়ন্তে, ইত্যাদি শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। লক্ষণ শব্দের অর্থ ইতর ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম। যে বাক্য দ্বারা একটী বস্তুকে অপর একটী বস্তু হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায় তাহাকে লক্ষণ বলিয়া থাকে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে। "সচ্চিদা নন্দং ব্রহ্ম" এই বাক্যটী দ্বারা ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ ও চৈতন্য স্বরূপ বলা হইয়াছে, অন্য কোন বস্তুই সত্যস্বরূপ নহে, আনন্দ স্বরূপ নহে, জ্ঞান স্বরূপও নহে, কাজেই ঐ ঐ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মপদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া ঐ ঐ বাক্য সকল ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ব্বাহক লক্ষণ হইয়াছে। কার্য্য কারণ দ্বারা একটী বস্তুকে অপর একটী বস্তু হইতে পৃথক করিয়া লইলে, উহাকে তটস্থ লক্ষণ বলিয়া থাকে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" যতোইমানি ভূতানি জায়ন্তে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মই জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত, ব্রহ্মই জগতের কারণ, ব্রহ্মেই জগতের স্থিতি, ব্রহ্মেই জগতের লয় হইয়া থাকে, যাহা হইতে এই সকল ভূতগ্রাম উত্পন্ন হইয়াছে, যাহাতে দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু সকল লয় হইবে, যাহাতে জীব সমূহ অবস্থিত রহিয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম ইহাই বুঝিতে পাওয়া যায়। কাজেই এই শ্রুতি বাক্য সমূহ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতে পারেনা। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। কেবল মাত্র বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। উল্লিখিত শ্রুতি গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত

করিয়া তটস্থ লক্ষণের সহায়ক শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নির্ব্বাহক লক্ষণের সহায়ক শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সেই জন্যই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তংগ্রন্থ কোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

অর্থাৎ তোমরা কোটি ২ গ্রন্থ দ্বারা বলিয়াছ, আমরা তাহা শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা বলিতেছি। ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে অপর কিছু নহে।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য এই মিথ্যা জগত কিরূপে লোক লোচনবর্ত্তী হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য, মায়া শক্তি নামক একটী অনির্ব্বচনীয় পদার্থের অবতারণা করিয়াছেন। মায়ার পরিচয় স্থানে বেদান্ত সার বলিয়াছে।

"সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।"

অর্থাৎ সত্ ও অসত্ বস্তু দ্বারা অনির্ব্বচনীয়, সত্ব রজ তমো গুণাত্মক জ্ঞানের বিরোধি ভাবস্বরূপ কোনও একটা বস্তুই মায়া পদ বাচ্য। এই মায়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মের শক্তি বিশেষই মায়া। শক্তি ও শক্তি বিশিষ্ট বস্তুর কোনই ভেদ নাই। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি তাহার দৃষ্টান্তস্থলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম যখন শক্তি সংযুক্ত হইয়া থাকে তখনই তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান হইয়া ঈশ্বর বা সগুন ব্রহ্ম নাম বা সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন, উক্ত মায়ার দুইটী শক্তি আছে। একটীর নাম আবরণ ও অপরটীর নাম বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তি আমাদের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, তাই উহার নাম আবরণ হইয়াছে। বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা আকাশাদি ক্রমে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিক্ষিপ্ত জগতের কারণ বলিয়া উহাকে বিক্ষেপশক্তি বলিয়া থাকে। এই বিক্ষেপ শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত। বিক্ষেপ শক্তি-বিশিষ্ট সগুন ব্রহ্মও চিন্ময় ব্রহ্ম বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, এক।

অদ্বৈতবাদিগণ সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য, "তস্মাদেতস্মাত আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নি রগ্নে রাপঃ অদভ্যঃ পৃথিবী চৌত্ পন্থতে" ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সগুণ ব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মই অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য নামে অভিহিত হইয়াছে, অজ্ঞানভেদে ঐ অজ্ঞানোপহিত (অজ্ঞানযুক্ত) চৈতন্য বহু হইলেও সমষ্টি দ্বারা ইহা এক, সমষ্টি ও ব্যষ্টিদ্বারা জাগতিক পদার্থ সমূহ এক ও বহু হইয়া থাকে ইহাই অদ্বৈত বাদির মত।

বিভিন্ন দার্শনিকগণ তিন প্রকারে জগতের সৃষ্টি নিরূপণ করিয়াছেন। সেইজন্য দর্শনশাস্ত্রে তিনটী বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আরম্ভবাদ, বিবর্ত্তবাদ ও পরিনামবাদ, ইহাই বাদত্রয়ের নাম। আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক বৈশেষিক ও মৈমাংসিক। বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিক, পরিণামবাদী সাংখ্য ও পতঞ্জলি, ন্যায়দর্শন প্রনেতা গৌতম বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কনাদ রভিলুক, মিমাংসা দর্শনকার, জৈমিনি, বেদান্ত দর্শনকারক ব্যাসদেব, সাংখ্য দর্শনকার কপিল, ও পাতঞ্জল দর্শনকার মুনি পতঞ্জলি। আরম্ভবাদী গৌতমও কনাদ-মতে নিত্য, অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে দ্ব্যনুক; দ্ব্যনুক হইতে ত্রসরেনু, ত্রসরেনু হইতে কতগুলি অবয়ব ও কতকগুলি অবয়ব হইতে স্থূলাতিস্থূল ক্রমে জগত উৎপন্ন হইয়াছে। চেতন ঈশ্বরাদির প্রেরনায় ঐ ঐ রূপে পরমাণুগুলি মিলিত হইয়াছে। পরিণাম বাদী কপিল পতঞ্জলির মতে দুগ্ধ যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া দধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে সেইরূপ প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া মহত্ অহংকারাদি ক্রমে জগত্ রূপে পরিণত হইয়াছে, প্রকৃতি অচেতনা হইলেও, পুরুষের চৈতন্য প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকৃতি সক্রিয় হইয়া থাকে, উল্লিখিত মতদ্বয় হইতে পৃথক্ ভাবে ব্যাসদেব যে উত্পত্তিক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই বিবর্ত্তবাদনামে বিখ্যাত, বেদান্তদর্শনকার বিবর্ত্তবাদের পরিচয় দেওয়ার জন্য বলিয়াছেন,

সতত্ত্বতোহন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোহন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

অর্থাত্ যে সকল বস্তু রূপান্তরিত হইলেও বাস্তবিক সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাকে বিকার বলিয়া থাকে, ইহারই অপর নাম পরিণাম, যেরূপ দুগ্ধ রূপান্তরিত হইয়া দধিরূপে পরিণত হইলেও, পরিণাম বাদীগণ তাহাকে সত্য বা সত্ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের মতে সকল বস্তুই সত্, সদ্বস্তু হইতেই সদবস্তু উত্পন্ন হইয়া থাকে, অসত্ বা মিথ্যা কোন বস্তুই নাই।

বৈদান্তিক মতে সকল বস্তুই সত্স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উত্পন্ন হইয়াছে, পরন্তু উত্পন্ন সকল বস্তুই, অসত্ বা মিথ্যা, ভ্রমের উপাদান মাত্র, যে সকল পদার্থ সত্স্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থ হইতে উত্পন্ন হইয়া, মিথ্যারূপে রূপান্তরিত হইয়া থাকে তাহাকেই বিবর্ত্ত বলিয়া থাকে, ব্রহ্ম হইতে উত্পন্ন হইলেও, উত্পন্ন কোন দ্রব্যই সত্ নহে।

যেরূপ রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি মিথ্যা, সেইরূপ ব্রহ্মে আরোপিত পরিদৃশ্যমান জগত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও মিথ্যা বা অসৎ। ইহাই বিবর্ত্ত বাদীর মত। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নির্গুণ ব্রহ্ম অজ্ঞান বা মায়াশক্তি দ্বারা আবৃত হইয়াই আকাশাদি ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। এই মায়া বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা চৈতন্য, শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছু নহে। একই বস্তু। যেহেতু উৎপন্ন বস্তু মাত্রই মিথ্যা বা মায়া কল্পিত অসৎ, ইহাদের নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক কোনরূপ সত্তা নাই। অদ্বৈতবাদিগণ বিবর্ত্তের আরও একটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বিবর্ত্তত্বং স্বস্বরূপা পরিত্যাগেন রূপান্তর প্রদর্শকত্বং" অর্থাৎ যে পদার্থ নিজরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্য রূপের প্রদর্শক হইয়া থাকে, তাহাকেই বিবর্ত্ত বলিয়া জানিবে। যেরূপ রজ্জু নিজরূপ পরিত্যাগ না করিয়া সর্পাদি স্বরূপান্তরের প্রদর্শক হইয়া থাকে তদ্রূপ, প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত মতেও ব্রহ্ম পদার্থ, নিজরূপ পরিত্যাগ না করিয়া জীব বা জগত রূপের প্রদর্শক, বস্তুতঃ জীব বা জগত হইতে সতস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, একমেব।

অদ্বৈতবাদিগণ আরও একরূপে ভিন্ন ২ জীব ও জগতের ঐক্য স্থাপনের প্রণালী দেখাইয়াছেন। তাহারা বলেন।

কোষো পাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈ ব জীবতাং।

অর্থাৎ কোষরূপ উপাধি (অর্থাত্ ভেদক ধর্ম্ম) দ্বারা ব্রহ্মই জীব রূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় ভেদে, কোষ নামক, ব্রহ্মের পারিভাষিক উপাধি, পাঁচ ভাগে বিভক্ত। অজ্ঞান বা মায়ার পরিচয় পূর্ব্বে যথা সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মায়া বা অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই আনন্দময় কোষ নামে বিখ্যাত। অজ্ঞানোহিত অর্থাৎ অজ্ঞান বিশিষ্ট চৈতন্যই, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান। সর্ব্ব নিয়ন্তা, সগুন, অব্যক্ত, অন্তর্যামী, জগৎ কারণ ঈশ্বর। অনাদি সাংসারিক জীবের জন্মান্তর কৃত কর্ম্মফলই, ব্রহ্ম ও অজ্ঞানের সংযোগের প্রতি কারণ। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ জগত প্রপঞ্চ এই ঈশ্বরেই লীন হইয়া থাকে। কথিত আনন্দময় কোষ ও ঈশ্বর ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে অনেকও এক হইয়া থাকে। যিনি সমষ্টি তিনিই ঈশ্বর ও যিনি ব্যষ্টি, তাহাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া থাকে। ব্যষ্ট্যুপহিত চৈতন্যের পারিভাষিক নাম প্রাজ্ঞ। অপ্রাজ্ঞ ও অনীশ্বর ইহারই আর একটী নাম বা সংজ্ঞা। ইহারা উভয়ই আবার বন ও বৃক্ষের ন্যায় (অর্থাৎ বৃক্ষ সমষ্টি যেরূপ বন সেইরূপ) সমষ্টি ও ব্যষ্টি দ্বারা ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে বহু ও সমষ্টি অভিপ্রায়ে এক। বস্তুতঃ ইহারা কেহই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। এক অদ্বৈত ব্রহ্মই ঈশ্বর প্রাজ্ঞ প্রভৃতি আবার ভেদে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বর বা প্রাজ্ঞ কেহই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। মায়া বিনির্মুক্ত শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্ম নামে বিখ্যাত। ঈশ্বর নামক অজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে আকাশাদি ক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। জীবের শরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ।

সূক্ষ্ম শরীর সপ্ত দশটী উপাদানে গঠিত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী বুদ্ধি ও মন, সূক্ষ্ম আকাশ বায়ু জল তেজ ও পৃথিবীরূপ ভূত পঞ্চক একত্র মিলিত হইয়া, একটী সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্তঃকরণ বৃত্তিকেই বুদ্ধি বলিয়া থাকে, এই বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত মিলিত হইয়া, বিজ্ঞানময় কোষ নামে সজ্ঞিত হইয়া থাকে, ইহাকেই জীব বলিয়া থাকে, এই বিজ্ঞানময় কোষই ইহলোকে ও পরলোকে সুখ দুঃখাদির ভোগাভিমান করিয়া থাকে। মনও ঐরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া, মনোময় কোষরূপ নাম ধারণ করিয়া থাকে।

বায়ুকে শাস্ত্রকারগণ চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রাণ, আপান, সমান, উদান, ব্যান, ইহারাই পঞ্চ প্রাণ বায়ু নামে কথিত হইয়া থাকে। নাসাগ্রবর্ত্তী বায়ুকে প্রাণ বায়ু বলিয়া থাকে। এই প্রাণাদি বায়ু পঞ্চক, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হইয়াছে, কথিত কোষ চতুষ্টয়ের মধ্যে, বিজ্ঞানময় জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তৃরূপ মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান, করণরূপ, প্রায় ময় ক্রিয়া শক্তিমান্ কার্য্যরূপ এই কোষত্রয় মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর নামে অভিহিত হইয়াছে ইহারা সকলেই পূর্ব্ব কথিত বন ও বৃক্ষের ন্যায় সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে, এক ও অনেক, বস্তুতঃ ইহারা সকলেই আবার বন ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় সদব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। অপৃথক্ সত্তাবান্, অপঞ্চীকৃত ভূত সকল হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সমূহই সূক্ষ্ম ও পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি স্থূল নামে পরিচিত। এই স্থূল ভূতকেই অন্নময় কোষ বলিয়া থাকে।

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ—
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈ যোজনাং পঞ্চ পঞ্চতে॥

ইত্যাদি কারিকা দ্বারা পঞ্চীকরণের নিয়ম প্রদর্শন করাইয়াছেন। প্রথমতঃ এক একটী ভূত অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ (অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগ) রক্ষা করিবেন, অপর অর্থাৎ (প্রথমভাগ) সমভাবে চারিভাগ করিতে হইবে. এইরূপ প্রত্যেক ভূত পঞ্চক বিভক্ত হইলে, একটী ভূতের অর্থাৎ আকাশাদির অর্দ্ধ ও অন্য ভূত চতুষ্টয়ের দুই আনা করিয়া একত্র মিলিত হইলে, একটী স্থূল ভূত উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ ক্ষিতিরূপ স্থূল ভূতের অর্দ্ধভাগ ও আকাশাদি ভূত চতুষ্টয়ের অর্দ্ধভাগের চতুর্থাংশ, অর্থাৎ দুই আনা করিয়া একত্রিত আট আনা মিলিত হইলে একটী স্থূল পৃথিবী উৎপন্ন হইবে। প্রত্যেক স্থূল ভূতই ভূত পঞ্চকের সমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে যে দ্রব্যে যাহার অর্থাৎ যে ভূতের ভাগ বেশী (অর্থাৎ অর্দ্ধ পরিমাণ) আছে অন্যান্য আকাশাদি প্রত্যেকের দুই আনা করিয়া অর্দ্ধ পরিমাণ আছে, উহাই পৃথিবী নামের নামী হইয়া থাকে, অর্থাৎ পৃথিবী সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ সকল স্থূল ভূতই পঞ্চীকৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই বৈদান্তিকগণ পঞ্চীকরণ বলিয়া থাকেন। এইরূপে ভূত সমূহ দ্বারা পঞ্চীকরণ প্রভাবে উৎপন্ন, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতিই দৃশ্যমান জগৎ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে পরিদৃশ্যমান জগত এক ও অনেক, মনুষ্যাদি শরীর যেরূপ পঞ্চভূত সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভূত সমবায় সেরূপ সগুণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। সগুণ ব্রহ্ম বা উপহিত চৈতন্যও সেইরূপ ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে। ফলতঃ "একমেব" ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত। "কোষোপাধি বিবক্ষায়াম্ যাতি ব্রহ্মৈব জীবতামিত্যাদি" কারিকাদ্বারা অদ্বৈতবাদী ভারতীতীর্থ, বলিয়াছেন। কোষপঞ্চকরূপ উপাধি (অর্থাৎ ভেদকধর্ম্ম) দ্বারা নিরুপাধি ব্রহ্মই জীবরূপ ধারণ করিয়াছে। "একমেবাদ্বিতীয়ং"। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। তত্ত্বমসি অয়মাত্মা ব্রহ্ম। সোঽহং। অহং ব্রহ্মাস্মি, এই সকল শ্রুতি দ্বারা জীব যে কেবল ব্রহ্ম স্বজাতীয় পদার্থ নহে, জীবই ব্রহ্ম, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই শ্রুতিটী যে অভ্রান্ত সত্য তাহার আর সন্দেহ কি?

শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত অদ্বৈতবাদের অধিকারী অতি বিরল। ইহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া সাধন মার্গে গমন

করাও অত্যন্ত কঠিন। অনেকেই অদ্বৈত মতে ভ্রান্ত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপ ত্যাগ করিয়া সোঽহং বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন, আচার্য্য শঙ্করের তাৎপর্য্য এরূপ নহে। অদ্বৈতবাদীর উপাসনা ত্রিবিধ। অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ। সাধকের যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্য সমূহে ব্রহ্ম ভাবনাকে অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা বলিয়া থাকে। গীতাও এইরূপ উপাসনায়

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা।

ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মই হোতা, ব্রহ্মই হবি (ঘৃত) অগ্নি ও ব্রহ্ম ইত্যাদি রূপে, যজ্ঞোপকরণ সমূহে ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তন করিবে, ইহা দ্বারা কর্ম্মত্যাগের কোনই উপদেশ দেওয়া হয় নাই। প্রতীক উপাসনার মর্ম্মও এইরূপ, আপাততঃ যাহাকে ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়াই চিন্তা করিবে। অদ্বৈত বাদীর মতে অহংগ্রহ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। আত্মা যে ব্রহ্ম ভিন্ন নহে সোঽহং ব্রহ্মাস্মি, এইরূপ চিন্তাই অহংগ্রহ উপাসনা, এই উপাসনা দ্বারাই ব্রহ্মৈক্য লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মৈক্য চিন্তন দ্বারা ভাবনা যখন অভ্যাস দ্বারা দৃঢ় ও নিশ্চল ভাব ধারণ করিবে, তখনই জীব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তের সকল পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মফল বিনষ্ট হইয়া যায়। আর তাহাকে সংসারাবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

আপ্নোতি স্বারাজ্যং সর্ব্বে দেবাঃ তস্মৈবলিং আহরন্তি।
গন্তব্যং চ পরং সাম্যং, ব্রহ্ম বিদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

এইরূপে জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহপাত হইলে বিদেহ মুক্তি হইয়া থাকে, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া থাকে, নস পুন বার্বর্ত্ততে। আমি এখানেই মুক্তের ভাব গ্রহণ করিলাম।

শ্রীভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

স্মৃতি-পূজা

(স্বভাব সুন্দর রামেন্দ্র সুন্দর)

স্বভাব সুন্দর রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর সহিত আমার চাক্ষুস আলাপ হইবার পূর্ব্বে পত্র ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যপদ প্রার্থী হইয়া প্রবেশিকা ফি ১৲ টাকা মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিষদের অধিবেশনে পাঠ করিবার অভিপ্রায়ে—"যশোহরের ফৌজদার নুরউল্লাখাঁ ও মির্জ্জানগর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সম্পাদকের বরাবর পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। মনিঅর্ডারের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রী পাইলাম—পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ আমি পরিষদের সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছি এ সংবাদ দিলেন, কিন্তু দিলেন না শুধু আমার প্রবন্ধের কোন সংবাদ—এই জন্য একে একে আমি তিনখানি চিঠি লিখিলাম, কিন্তু উত্তর নাই। রামেন্দ্র সুন্দর তখন পরিষদের সম্পাদক, তাই অবশেষে তাহার বাসা ৮নং উইলিয়মস্ লেনের ঠিকানায় তাঁহার নিকট পত্র লিখিলাম। পরিষদের ব্যবহারে আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম সুতরাং রামেন্দ্র বাবুর নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলাম যাহাতে সেই ভাব ব্যঞ্জক দুই একটি কথা ছিল। নিয়মিত সময় চলিয়া গেল, রামেন্দ্র বাবুও কোন উত্তর দিলেন না। তখন আমার মন স্বভাবতই কিছু উষ্ণ হইয়া উঠিল। মনে ভাবিলাম 'ইহাদের দাড়াই বুঝি এই—।'

যেদিন এই প্রকার অনুমান করিয়াছিলাম, তাহার ঠিক্ দুই দিন পরেই একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষর লিখিত চিঠি পাইলাম। কৌতুহলী হইয়া চিঠিখানা খুলিতেই উপরে দেখিলাম-'জেমো' আর নীচে দেখিলাম ভবদীয় শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী। আগ্রহ সহকারে চিঠি খানি পড়িতে গেলাম কিন্তু সহজে পড়িতে পারিলাম না কারণ স্বভাব সুন্দর রামেন্দ্র সুন্দরের হস্তাক্ষর 'সুন্দর' ছিল না। যাহা হউক চিঠিখানি পড়িতে গিয়া প্রথমেই পাঠ দেখিলাম—'সুহৃদ্বরেষু।' দেখিয়া বড় বিস্মিত—বড় অপ্রস্তুত হইলাম। বিস্মিত হইবার কারণ রামেন্দ্র সুন্দরের ন্যায় এখন একজন দেশমান্য ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাকে একেবারেই পাঠ লিখিলেন—'সুহৃদ্বরেষু'—আর অপ্রস্তুত হইলাম আমি এমন লোককেই প্রথম পত্র লিখিয়াছিলাম উষ্ণ ভাষায়। চিঠিতে পড়িলাম—"আমি ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছি। আপনার পত্র কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছে—সেই জন্যই উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। পরিষদ কার্য্যালয়ে প্রবন্ধ পাঠাইয়া ও পরে তিন

খানি চিঠি লিখিয়াও তাঁহার উত্তর পান নাই সংবাদে লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। যাহার ত্রুটীতেই আপনি মনঃকষ্ট পাইয়া থাকেন সমস্ত অপরাধ আমারই কারণ—পরিষদের ভৃত্যবর্গের মধ্যে আমার দায়িত্বই সকলের চেয়ে বেশী। পরিষদ আপনাদেরই, সুতরাং আমাদের ত্রুটীও আপনাদের কাছে অবশ্য মার্জ্জনীয়। আমি কার্য্যালয়ে চিঠি লিখিলাম—প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা আমি কলিকাতায় যাইয়া করিব। মহাশয়ের কুশল সংবাদ পাইলে সুখী হইব। আমার শরীর অপটু হইয়া পড়িতেছে, পরিবারস্থ আর আর সকলে কুশলে আছেন।'—

পত্রের ছত্রে ছত্রে রামেন্দ্র সুন্দরের বিনয়, দীনভাব, দায়িত্বজ্ঞান, ত্রুটী স্বীকারের প্রণালী, অপরিচিতের প্রতি অকপট আত্মীয়তা ও সর্ব্বোপরি পরিষদের প্রতি তাঁহার বিপুল ভক্তির অভিব্যক্তি দেখিয়া আমার অন্তরে তাঁহার উদ্দেশে একটী শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র—বড় ছোট বোধ হইতে লাগিল—কেবলই ভাবিতে লাগিলাম—হায়! কাহার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছি।

ইহার পর কলিকাতায় গিয়া রামেন্দ্র বাবু লিখিলেন—'আপনার প্রবন্ধ পরিষদের ভাদ্র মাসের অধিবেশনে পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে। আপনি নিজে উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধ পাঠ করিলে সুখী হইব' শুধু প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্যই নহে, রামেন্দ্র বাবুকে দেখিবার জন্য আমার একটা আন্তরিক আগ্রহ হইয়াছিল তাই পরিষদের অধিবেশনের দিনই সকালের গাড়ীতে আমি বাড়ী হইতে রওনা হইয়া বিকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিলাম ষ্টেশনে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুরেশ চন্দ্র উপস্থিত ছিল—তাহাকে সঙ্গে লইয়াই একেবারে সভার অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট স্থান ১৬৬নং বৌবাজার ষ্ট্রীট জাতীয় শিক্ষা মন্দিরে গিয়া পৌছিলাম। দ্বারে শ্রীযুত রামকমল সিংহ মহাশয় ছিলেন, তিনি আমাকে দ্বিতলে রামেন্দ্র বাবুর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন—'এই যে অশ্বিনী বাবু' রামেন্দ্র বাবু ফরাসের উপর বসিয়াছিলেন তিনি সহাস্য বদনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া 'আপনি এসেছেন, বড় সুখী হলুম।' বলিয়া আমার হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন।

ক্রমে দু'একজন করিয়া লোক আসিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বড় বেশী নয়। তাই রামেন্দ্র বাবুকে একটু বিপন্ন বোধ হইল' তিনি বলিতে লাগিলেন 'তাইত, অশ্বিনী বাবু খুলনা হইতে আসিলেন কিন্তু Quoram অভাবে যদি আজ পরিষদের অধিবেশন না হয় তবে বড় লজ্জা বড় কষ্টের কথা হইবে।' যাহা হউক Quoram হইল, রামেন্দ্র বাবু সুস্থির হইয়া বসিলেন। নূতন পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে আমি আমার প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তখন রামেন্দ্র বাবু উঠিয়া বলিলেন 'প্রবন্ধ লেখক অশ্বিনী বাবু আজ আমাদিগকে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইলেন, সে জন্য আমি পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি যে প্রবন্ধটী এখানে পাঠাইয়া দিয়াই আপন কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, সেই খুলনা হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়া নিজে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন সে জন্যও আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। দেশের খাটী ইতিহাস লিখিতে হইলে যে পল্লী জননীর অঞ্চলচ্ছায় হইতে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এ বিষয়ে আর এখন মতদ্বৈধ নাই অশ্বিনীবাবু তাহা বুঝিয়াছেন বলিয়াই সরকারী গেজেটিয়ার বা বিদেশী লেখকের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর না করিয়া নিপুন হস্তে পল্লীর নিভৃত কক্ষ হইতে টাটকা মাল মশল্লা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উপদেয় প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমাদের আবদার তিনি যেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার পল্লীর অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে 'তাজা' জিনিষ উপহার দিয়া সহরবাসী আমাদিগকে তুষ্ট করিতে কৃপনতা না করেন। এখন ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে আমার কিছু বলিবার আছে তিনি সেচ্ছায় যে ক্ষেত্রকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে প্রবেশ সহজ লভ্য নহে। কবি ও ঔপন্যাসিকেরা নিরঙ্কুশ, কিন্তু ঐতিহাসিকের বিশেষতঃ বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের পথ সুগম নহে। একে কল্পনা বলে মুক্ত পক্ষ বিহগের ন্যায় আপন মনে যথেচ্ছ উধাও হইয়া যাওয়ার অধিকারী, অপরে বাস্তব ঘটনার চাপে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ করিতে বাধ্য কল্পনার পথ অবলম্বন করিতে পারেননা। সুতরাং তাঁহাকে বড় সাবধানতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। সমালোচকের কঠিন ভ্রুকুটি, স্তাবকের অন্যায় প্রশংসা সর্ব্বত্রই তাঁহাকে ঐতিহাসিকের যোগ্য সংযম ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া অকুতোভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে—ইহা করিতে পারিলেই তাঁহার সাধনার সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।" রামেন্দ্র সুন্দর ইহা বলিয়া উপবেশন করিলেন কিন্তু তাঁহার উৎসাহ বানী উপদেশ বাক্য আমার অন্তর বাহির একেবারে পূর্ণ করিয়া দিল। আমি উদ্বেলিত হৃদয়ে ঋষিকল্প মহাত্মার এই আদেশবানী অনুসারেই কার্য্য করিব সঙ্কল্প করিলাম।

সভার শেষে রামেন্দ্র বাবু বলিলেন—'আপনার এ প্রবন্ধ পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।' প্রবন্ধ যখন কার্য্যালয়ে পাঠান হয়, তাহার পরে সে বিষয়ে আরও কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা অন্য কাগজে লিখিয়া আনিয়া প্রবন্ধের সঙ্গেই পাঠ করিয়াছিলাম। এখন প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে শুনিয়া প্রবন্ধটী পরিবর্দ্ধিতাকারে নূতন করিয়া লিখিয়া দেওয়া উচিত মনে হওয়ায়, প্রবন্ধটী আনিবার জন্য পরদিন রামেন্দ্র বাবুর বাসায় গিয়াছিলাম, তিনি তখন পরিষদের কার্য্যেই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমি সেখানে যাওয়া মাত্রই তিনি এমন সহৃদয়তা, সরলতা ও প্রীতিভরে আমাকে গ্রহণ করিলেন যে আমি মুগ্ধ না হইয়াই পারিলামনা। আমি তাঁহাকে প্রবন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই, তিনি নিতান্ত কুণ্ঠার সহিত বলিলেন—প্রবন্ধটী ত আমার কাছে নাই, তাহা সহকারী সম্পাদক হেমবাবুর নিকট পাইবেন। হেমবাবুর ঠিকানা জানেননা বোধ হয়। তিনি ৭০নং ক্যাথিড্রাল মিশন লেনে থাকেন। আপনি অনর্থক এখানে আসিয়া কষ্ট পাইলেন, এজন্য আমি লজ্জিত হইতেছি।

আমি বলিলাম—'আমি আসিয়াছি আমার নিজের কাজে, তাহাতে আপনার লজ্জিত হইবার কি আছে? প্রবন্ধ না পাইলেও আপনার দর্শন লাভই যে আমার পরমলাভ।' এই কথা বলিতেই রামেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আমি নিতান্ত আকিঞ্চন—আমাকে এত বাড়াইতেছেন কেন?' এই কথা বার্ত্তার সুযোগে আমি অতি সন্তর্পনে বলিলাম 'প্রবন্ধের সংবাদ পরিষদ কার্য্যালয় হইতে না পাইয়া আমি বড় অসহিষ্ণু হইয়া আপনকে যে পত্র লিখিয়া ছিলাম, সে পত্রের জন্য আমি বড় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইতেছি।' রামেন্দ্র বাবু বলিলেন—'না, না—তাহাতে আপনার অনুতপ্ত হইবার কি কারণ আছে? আপনি যাহা করিয়াছেন, ও অবস্থায় পড়িলে আমি তাহাই করিতাম। পরিষদ আপনাদের—তাহার কার্য্য পরিচালনার ভার আপনারাই আমাদের উপর দিয়াছেন। আমরা যদি সে কার্য্যে তৎপর না হই—তাহাতে ত্রুটী দেখাই তবে আপনারাই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন—তবেই না আমরা ভাল কাজ করিতে পারিব। এজন্য আপনার লজ্জিত না হইয়া বরং কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করাই উচিত।' রামেন্দ্র সুন্দরের এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম—'ইনি কি বলেন, আসিলাম ত্রুটী স্বীকার করিতে কিন্তু ইনি করেন প্রশংসা। আর ভাবিলাম নিজের ত্রুটীকে এখন বড় ও অপরের ত্রুটীকে এত ছোট করিয়া দেখিতে পারেন বলিয়াই ত ইঁহারা এতবড়—এত মহৎ—এত উদার আর আমরা তাই পারি না বলিয়াই ত এত ক্ষুদ্র—এত সংকীর্ণ—এত অসহিষ্ণু।'

ইহার কয়েকমাস পরে কাসীম বাজার রাজবাড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। সেখানে যাইয়া 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদক শৈলেশ বাবুর সহিত রামেন্দ্র সুন্দরের নিকট যাইতেই তিনি বলিলেন—'এই যে আপনি এসেছেন।' সেখানে সম্মিলনের অভ্যর্থনা সভাপতি রবি বাবু ও প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবী উপস্থিত ছিলেন। রামেন্দ্র বাবুর আত্মীয়তায় কিছু সময়ের জন্য তাঁহাদের মধ্যে থাকিবার অধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহারা দল বাঁধিয়া রাজবাড়ীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত—'রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে' চলিলাম। কাশী নরেশ চৈৎ সিংহের দরজা ও অন্যান্য অনেক স্থান দেখিলাম—আমার যাকিছু জিজ্ঞাস্য রামেন্দ্র সুন্দরকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। প্রথমে তিনি আমাদের সঙ্গী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিল বাবুকে দেখাইয়া—'আমাকে কেন? সচল মুর্শিদাবাদ কাহিনী' আমাদের সঙ্গে আছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন—বলিয়া অতি স্নেহে ও আহ্লাদ সহকারে আমাকে প্রতি দর্শনীয় বস্তুর সম্বন্ধীয় খুটীনাটী সব কথা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সমস্ত দেখিয়া চলিয়া আসিবার সময় তিনি হাসিয়া বলিলেন—'যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া গেলেন তাহার একটা বিবরণ আপনার নিকট চাই।'

কাসীম বাজার হইতে বাড়ী আসিবার কিছুদিন পরে 'প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী' লিখিয়া রামেন্দ্র বাবুকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন—'ইহা পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।' কিন্তু তা' হয় নাই—আমিও প্রথমবারের অভিজ্ঞতায় আর প্রবন্ধের খোঁজও লইনাই। তারপর মাত্র আর দুইবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে দুইবারই সামান্য দুই একটা কুশল প্রশ্ন ব্যতীত তাঁহার সহিত আর কোন কথা হয় নাই কিন্তু না হউক প্রথম বার কলিকাতায় ও দ্বিতীয়বার কাশীম বাজারে তাঁহার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি তাহার জন্য চিরদিনই তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিব।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন।

REGTD. NO. C. 768.

১৪শ বর্ষ | শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩১ | ২য় সংখ্যা

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত

প্রতিভা

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার
এম্-এ, পি-এইচ-ডি, এফ্-সি-এস

সূচী

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২।৵০ | শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রতিভা কার্য্যালয়, ঢাকা। | এই সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সহ ৸৴০

১৪শ বর্ষ শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩১ ২য় সংখ্যা

সাঁওতালী ভাষা।

সাঁওতালেরা বহুকাল এই দেশে বাস করিতেছে,—কতকাল তাহা জানা যায় নাই। আর্য্যগণ যতকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছেন, সাঁওতালগণ সম্ভবতঃ ততকালই তাঁহাদিগের সহিত নানাকার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া বসবাস করিতেছে। কিন্তু তথাপি তাহাদের সামাজিক অনুন্নত অবস্থা বশতঃ তাহাদের ভাষা, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও তাহাদের ইতিহাস বা পুরাণ আমাদিগের নিকট নিতান্তই অনাদৃত ও অবজ্ঞাত। ইহাদিগের ভাষা বা আচার-অনুষ্ঠানের চর্চ্চা করিলে আমরা এদেশে সমাদর পাই না, পাই অনাদর ও উপেক্ষা। সাঁওতাল আবার একটা জাতি! তাহাদের আচার-অনুষ্ঠান বা তাহাদের ভাষা আবার আলোচনার যোগ্য বিষয়! ইহাই আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকের ধারণা। আধুনিক যুগের লোকে যেমন সাঁওতালের ইতিহাস লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহে না, পূর্ব্বযুগেও সেইরূপ কেহই ইহাদের বিষয় লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করে নাই। সেইজন্য ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস বা ভাষার বিকাশ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে আমরা প্রাচীন সাহিত্য হইতে কোনও উপাদান পাই না। অথচ আমাদের ভাষার উপর বহিঃ প্রভাবের আলোচনা করিতে হইলে সাঁওতালী ভাষা ও তাহার ক্রমবিকাশের আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। আবার এই আলোচনার ফলে আমরা ভাষার ক্রমবিকাশের বিষয়েও অনেক কথা জানিতে পারিব। তাই এই প্রবন্ধে সাঁওতালদিগের ভাষা ও ইতিহাসের আলোচনায় বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিব।

সাঁওতালদিগের প্রত্ননিবাস ও তাহাদের প্রাগৈতিহাসিক গতিবিধির বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আমাদের একমাত্র অবলম্বন তাহাদের মৌখিক পুরাণ। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা

করিয়াছিলাম। কিন্তু এ পুরাণের গল্প হইতে কোনও তথ্য আবিষ্কার করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে। এই পুরাণে বলে তাহাদের প্রত্নবিবাস পূর্ব্ব দেশে ছিল। কিন্তু সেই পূর্ব্বদেশ কোথায় এবং কোন্ দেশের পূর্ব্ব তাহাও বুঝিবার কোনও উপায় নাই। বিশ্বব্যাপী অগ্নিবর্ষণরূপ প্রলয় কাণ্ডের পর তাহারা যে দেশে অবস্থান করিতেছিল সেই দেশেরই পূর্ব্বে তাহাদের প্রত্নবিবাস তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এইকালে তাহারা কোন্ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল,—পাঞ্জাবে না সাঁওতাল পরগণায় তাহাও জানা যায় নাই। যদি তাহাদের উপনিবেশ পাঞ্জাবেই হইয়া থাকে তবে তাহারা ভারতবর্ষেরই পূর্ব্বাঞ্চলের আদিম নিবাসী, না আরও পূর্ব্ব দিগ্‌বর্ত্তী কোনও দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে তাহাও জানিবার কোনও উপাদান তাহাদের পুরাণে নাই। তাহাদের পুরাণে বর্ণিত আদি মানব ও মানবী 'পিল্‌চু হাড়াম্' ও 'পিল্‌চু বুঢ়ির' দ্বাদশ বংশধর হইতে সাঁওতালদিগের যে বারোটী বংশ বা গোত্র হইয়াছে, তাহাদের প্রাচীন নিবাস কোথায় ছিল তাহাও জানিবার উপায় আছে কি না জানি না। যে সকল দেশের বা স্থানের নাম তাহাদের পুরাণে পাওয়া যায় সেগুলিকে চিনিয়া লইবারই বা উপায় কি? কল্পনার সাহায্যে পুরাণের আলোচনায় বোধ হয় এ সকল বিষয়ের কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যাইবে না। কিন্তু এসকল বিষয়ের একটা জীবন্ত সাক্ষী তাহাদের ভাষা। সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী কৃষকের নিকট উর্ব্বরা ভূমি যেমন বহু শস্য দান করে, শিক্ষিত ভাষাবিজ্ঞানবিদের নিকট এই ভাষাও তেমনি বহু প্রাচীন কাহিনীর সাক্ষ্য দিবে। কারণ এই অনুন্নত ভাষা পর প্রভাব হইতে যত দূর সম্ভব দূরে দূরে অবস্থান করিয়াই এতকাল কাটাইয়াছে। অথচ বহু দূর-দেশ-বর্ত্তী ভাষাসমূহের নানা লক্ষণ এই ভাষায় পাওয়া যায়।

সর্ব্ব প্রথমে আলোচ্য সাঁওতাল জাতির নাম। 'সাওতাল' নামটী ইহাদের নিজস্ব নহে। 'হিন্দু' নামটী যেমন আমাদের পরপ্রদত্ত নাম, ইহাদের 'সাওতাল' নামটীও সেইরূপ পরপ্রদত্ত। ইহাদের জাতীয় নাম 'হড়্' এই নামই ভাবনিষ্কর্ষ প্রভাবে 'মানব' শব্দের বাচক। ইহা ছাড়া 'মানুষ' শব্দের বাচক অন্য কোনও সাধারণ শব্দ ইহাদের ভাষায় নাই। হাড়ি, হো, কার্, কোড়্, কোল্, কুলি, থায়ের্, খের্, কের্, গার্, গারো, গৌড়্ (গুরখা) খোন্দ্, গোন্দ্, কোড়া প্রভৃতি অনেক নিম্ন জাতির নামে সাঁওতাল দিগের 'হড়্' শব্দের মূল সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া পণ্ডিত গণের বিশ্বাস। আমরা সে বিশ্বাস লইয়া বেশী নাড়া-চাড়া করিব না। তবে এ প্রসঙ্গে এই কথার উল্লেখ আবশ্যক যে ছোট নাগপুর অঞ্চলের 'কোল্' ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার শ্রেণীভুক্ত হইলেও সাঁওতালী ভাষার শব্দ-সম্পদে পূর্ণ এবং সাঁওতালী ব্যাকরণেরলক্ষণ সম্পন্ন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পিতৃ-বাচক 'আপুম্' বা 'আপাৎ' শব্দ কোল্ ভাষায় 'আপু' আকারে সংরক্ষিত আছে। এই 'আপু' শব্দের সহিত উত্তম পুরুষ দ্বিবচনের সর্ব্বনাম 'লিং' যোগ করিলে 'আপু-লিং' (আমাদের পিতা) হয়। এইরূপ 'তোমাদের পিতা' বুঝাইতে কোল্ ভাষার 'আপু-পে' শব্দের প্রয়োগ হয়। এই 'পে' শব্দও সাঁওতালী ভাষার মধ্যম পুরুষের বহুবচনের বাচক সর্ব্বনাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করা যায়। যে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ দ্বারা উপলব্ধি হয়, সেই সকল বস্তুই ইহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত। মনন দ্বারা যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, সে-সকল বস্তুর জ্ঞান বা সে-সকল বস্তুর নাম ইহাদের ভাষায় অল্পই আছে। কারণ ইহাদের মনন-শক্তি অতি দুর্ব্বল। ইহারা বাঙ্গালীকে 'দেখু' বলে, * ব্রাহ্মণকে বাবড়ে বলে, মুসলমানকে 'মুশ্‌লা' বা 'তুড়ুক্' বলে; কিন্তু 'দেখু'ও নহে, 'হড়্' ও নহে, 'তুড়ুক্' ও নহে, বা অন্য কোনও প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য জাতিও নহে, এমন প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ সাধারণ শব্দ 'মনুষ্য' ইহাদের ভাষায় নাই। আধুনিক যুগে বঙ্গভাষা হইতে বহু ভাবনিষ্কর্ষ বাচক শব্দ (abstract word) ইহাদের ভাষায় প্রবেশলাভ করিলেও সেরূপ কোনও মৌলিক

* কেন বলে তাহা ভাবিবার বিষয়।

শব্দ ইহাদের নাই। 'সাঁওতালী বুলি' কে ইহারা 'হড়্-তে রড়্' বলে।

মৌলিক শব্দ সম্পদের আলোচনা করিলেও ইহাদের বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়। ইহারা পার্ব্বত্য প্রদেশ ও আরণ্য ভূমির বহু জীবজন্তু ও বৃক্ষাদির সহিত সুপরিচিত। এই সকল বস্তুর নাম ইহাদের ভাষার মৌলিক শব্দ। ইহারা কোনও বড় সহরের সহিত পরিচিত নহে। সেরূপ স্থানের বস্তুনিচয়ের নাম তাহারা পর-ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃতের যুগে সংস্কৃত ভাষা হইতে তাহারা সে সকল শব্দ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের অর্থ ও উচ্চারণের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দী ও আর্‌বী-পার্‌সী শব্দেরও উচ্চারণ বদ্‌লাইয়াছে, তবে অর্থের পরিবর্ত্তন খুব বেশী হয় নাই। আমরা ক্রমে ক্রমে এই সকল শব্দের আলোচনা করিতেছি।

পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে পরিচিত বস্তুসমূহের মৌলিক নাম।

বাঙ্গালা	সাঁওতালী
পাহাড়	বুরু
মাটি	হাসা
ভূমি	ওৎ
পর্ব্বত গুহা	বুরু-দান্দের্
চূড়া	মুৎনি *
ঢালু	ধাস্‌না
উচ্চ	চট্
পথ	হোর্
গ্রাম্যপথ	কুল্‌হী †
গ্রাম	আতো
সঙ্কীর্ণপথ	চিরিৎ হোর্
ঝরণা	জড়ি
খাল	সড়ো

* ঘরের পাড়কে বাঁকুড়া অঞ্চলে 'মুদুনি' বলে।

† বীরভূমে শব্দটী প্রচলিত আছে।

বাঙ্গালা	সাঁওতালী
নদী	গাডা
ডোবা	হাস্-গাড্‌লা
পাথর	ধিরি
জল	দাঃ
বন	বির্
জঙ্গল	গাঙ্গা
কাদা	লসৎ
বালি	গিতিল্
মেঘ	রিমিল্
সূর্য্য	সিঞ্চান্দো
চন্দ্র	নিন্দ্ চান্দো
আকাশ	সের্‌মা

এই তিনটী নাম হইতে 'দিন' 'রাত্রি' ও বৎসরের নাম হইয়াছে যথাক্রমে সিঞ্, নিন্দ্ ও সের্‌মা। সিঞ্ ও নিন্দ্ ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব ও দেবী।

বাঙ্গালা	সাঁওতালী
তারা	ইপিল্
বিদ্যুৎ	বিজ্‌লী

[শব্দটী বোধ হয় এই ভাষাতেই মৌলিক]

বাঙ্গালা	সাঁওতালী
বজ্র	চেটের্
রামধনু	লিটা
বর্ষা (বাদল)	জাপুৎ
শিলাবৃষ্টি	আরেল্
ঝড়	হয়্‌দা
বাতাস	হয়্ *
আলোক	মারসেল্
অন্ধকার	এন্ধৎ
রৌদ্র	সিতং
ছায়া	উমুল্
জ্যোৎস্না	তেরেদেচ্
কুয়াসা	কুহড়া

* এটী সম্ভবতঃ হাওয়া শব্দজ নহে।

অসংখ্য গাছ গাছড়া ও জীবের নাম ইহারা জানে।

বাংলা	সাঁওতালী
গাছ	দারে
শাখা	ডে'র্
(বাং 'ডাল' শব্দের বোধ হয় এই মূল)	
পাতা	সাকাম্
শিকড়	রেহেদ্
ফুল	বাহা
ফল	জ'
বৃন্ত	বঁক্
পুষ্পকলিকা	মহেঁ
জাম	ক'
ছোটজাম	কোদ্
সুপারি	গুয়া
তেঁতুল	জোজো
আম	উল্
বেল	সিঞ্জো
আতা	মান্দার্‌গম্
কেন্দ্	তিরিল্
খান্দার্, বড়াল	ডাহু
কুল	জেনুম্
শিমুল	এদেল্
বনকুল	কুড়িৎ-রামা (= চিলের নখ)
ডুমুর	লোআ
কোঁচড়াফল	কুইন্তি
আমলকী	মেরাল্
হরিতকী	রল্
বহেড়া	লপং
বটগাছ	বাড়ি
কুঁচ	কাঞ্চএৎ

বাং	সাঁও
অশ্বথ	হেসা
মহুআ	মাতকোম্
বকুল	ঝাড়্
কুসুমগাছ	বারু
আসনগাছ	আতনা
ঝাউক	রাইর্‌ই
পলাস	মুরুৎ
সজ্‌নে	মুনগা
জিউলি	ডোকা
অনন্তমূল	দুধিলোটা
লজ্জাবতী	ঝাপ্‌নী
বিছুটি	সিংজেল্‌সিং
[বিছা	সিঞ্জেল্ মারাদার্]
বেনা	সিরোম
পেতেল	পাটিওল্
নাগফেনী	সাপিন্
বাঁশ	মাঁৎ
পদ্ম	পরায়নি
রক্তপদ্ম	আরাউপল্
কেতকী	কিয়া
চাঁপা	গুলাঞ্চ
গাঁদা	কুশমি বাহা [হল্‌দে ফুল]
করবী	রাজবাহা
চুআ	কুক্‌ড়-চুৎ-বাহা
শাক	আড়া
কচু	সারু (মেরু)
খি-কর্‌লা	কারোলা
উচ্ছে	হাড়হাৎ কারলা (তিক্ত-করলা)
সিম	মাল্‌হান্

[illegible]	সাঁং	বাং	জাং
[illegible]	তাহের	ষাঁড়	বারাড়্
[illegible]	পিডার	ধকড়া	কেঁচাড়্
[illegible]কচু	কান্দাসারু	বাছুর	মিহু
লাউ	হোতোং	ভেড়া	ভিড়ি
পাট	জাঁড়ি	ছাগল	মেরম্
শণ	শুতুরুম্‌জাঁড়ি	পাঁঠা	বোদা
মাষকলাই	রামড়া	সাপ	বিং
কুর্ত্তি	হেড়েচ্	কচ্ছপ	হরু
সরিষা	তুড়ি	কুমীর	তায়ান্
বাঘ	কুল্, তারুপ্	গোসাপ	তেঁহেৎ
সিংহ	ধাচরি কুল্	গোখুরাসাপ	আরাংবিং
ভল্লুক	বানা	বোরা	ধুবরী
হরিণ	জিল্	চিতি	গাঁড়ুৎ
	[মাংস-জে'ল্]	হেলে	ডুড়ুডুং
মহিষ	কাড়া	টিকটিকি	চেরচেটে
মহিষবৎস	কাড়ুরু	গিরগিটি	কাঁকড়া
বকনা মহিষ	সাঁড়ারু	বিছা	সিজেল্‌নাঙ্গার্
শৃগাল	তোয়ু	বোল্‌তা	ডুড়ুম্‌লাং
কুকুর	সেতা	ভীমরুল	বহবুবারাড়িং
বনবিড়াল	রুণ্ডা	ভেক	রোটে
উদ্‌বিড়াল	ওদাম্	বেঙাচি	রোটে হাউকা
[বিড়াল	পুষি]		[= বেঙ মাছ]
কাঠবিড়াল	তোড়্	সোনাবেঙ	বাকজাং
খরগোশ	কুল্যাই	কট্‌কটিয়া বেঙ	পকোৎরোটে
খেকশিয়াল	খিঁকড়ি	মাছি	রু'
বেজি	চেমেং	ডাঁশ	ডাঁচ্
ইঁদুর	গোডো	কুকুরমাছি	[illegible]
ছুঁচা	চুন্দ্	এঁটোলি	তিক্
ঘোড়া	সাদম্	ফড়িং	[illegible]
বলদ	ডাংরা	পঙ্গপাল	গোহেহো
[গাই	গেই]	উইচিমড়া	[illegible]

ব্যাং	ল্যাং
প্রজাপতি	পিপড়িয়াং
তেলাপোকা	চাপড়া
কেন্নো	লেঙোং
ছোটকেন্নো	গেগেতেরেং
বড়মাকড়সা	কুল্ ঝিন্দ
	[= বাঘ মাকড়াসা]
ছোট"	শিন্দি
মশা	শিকড়ি
উকুন	সে'
পিঁপ্‌ড়া	মুটঃ
উই	ঞিন্দির
ঘুণ	হুতি
কেঁচো	লেঙেৎ
পোকা	তিজু
জোনাকীপোকা	বাক্‌জুহু
গুটিপোকা	লুমামতিজু
ঝিঁঝিপোকা	রেরেং
গুব্‌রে পোকা	উরু
ছারপোকা	অড়মরচ
মাছ	হাকো
বাইনমাছ	বাম্বি
পাঁকাল	হুড়ি
কই	রোডগো
চিতল	বাধড়ি
টেংরা	রেডেং
চিংড়ি	গাডাইচা
চ্যাং	চটগচ্
কাঁকড়া	কাটকম্
শামুক	গোংঘা
গুগ্‌লি	রকচ
[পাখী	চেঁড়ে]

বাং	ঝ্যাং
ময়ূর	মারা
মুরগী	সিম্
হাঁস	গেডে
শালিক	ঝিংলি
চড়ুই	ঘাড়রা
বাবুই	ঝিপি
পেঁচা	হুদু
কাঠ ঠোকরা	ফকর্
কাক	কাহু
দাঁড়কাক	বুরু কাহু
	[= পাহাড় কাক]
বাদুড়	কাহু বার্‌দুরুইচ্
চামচিকা	বার্‌দুরুইচ্
বাজ	পাঝাঁড়
বক	কোঁচ্
মাছরাঙা	কিকির্
টিয়া	মিরু
কাকাতুয়া	ভালুআ
ঘুঘু	পোতাম্
[হাড়্‌গিলা	গারুড়]
ধনেশ্বরী	চামাচাকো
[তিতির	চিংরি]
চিল	কুড়িৎ
[শকুনি	গিদি]
সজারু	ঝিঁক্

ইহাদের বাসস্থান ও শয়নাদির আস্‌বাব বেশী নহে। পাকা বাড়ী ইহাদের অপরিচিত বলিলেই হয়। চুণ, সুরকি, ইট প্রভৃতি মসলার মৌলিক নাম ইহাদের ভাষায় নাই। মাটির দেওয়ালে খড়ের চাল বাঁধিয়া ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। দরজা, জানালা বা খরখড়ি, কোনও কিছুই থাকে না। আজকাল ইহারা দরজায় কপাট দেয় বটে, কিন্তু

কিছুকাল পূর্ব পর্য্যন্ত ইহাদের দরজায় আগড় ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। সেইজন্য এ সকল বস্তুরও মৌলিক নাম ইহাদের ভাষায় নাই। দুয়ার, কপাট (কাপাট), শিকল (শিক্‌লি) প্রভৃতি শব্দ ইহাদের ভাষায় উচ্চারণের বিকৃতি সহ গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের শুইবার বিছানা দড়ির খাট। সেই খাটের কাঠে মাথা দিয়া ঝুলিয়া শুইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের বালিশের দরকার হয় না। ইহাদের ভাষায় এ শব্দও নাই। বালিশকে ইহারা 'তাকিয়া' বলে।

বাং	সাঁং
গৃহ	ওড়া (ক্)
চাল	সাড়িম্
দড়ি	বাবের্
দেওয়াল	কাঁথ্
খাট	পার্কম্
গোয়ালঘর	গোড়া
	(=গো+ওড়া)
মটুকা	ভিঁড়িয়া
ছাইচ্	খাতি
ঘরের পশ্চাদ্ভাগ	কুডাম্
বিছানা	আটেদা
উঠান	রাচা
খড়	বসুব্, এ'ড়্
খুঁটা	খুন্টি
আগড়	শিল্‌পি
ঘুড়ি, গবাক্ষ	ভুর্ণি

ইহারা বহুকাল হইতেই কৃষিজীবী। অল্প পরিমাণ ক্ষেত লইয়া ইহারা গাই, বলদ ও কাড়ার সাহায্যে চাষ করে। তরকারির চাষ কিছু বেশী পরিমাণে করে। কাঁকুড়, শোড়া, কুমড়া, লাউ প্রভৃতি আজ কাল ইহারা বিক্রয় করে। কিন্তু ক্রয় বিক্রয়ের কাজ ইহাদের বেশী নহে। এই সকল কার্য্যের উপযোগী আসবাবের মৌলিক নাম ইহাদের ভাষায় আছে।

বাং	সাঁং
লাঙ্গল	নাহেল
যোঁয়াল	আর্‌াঁড়্
ধুর, লিগে	নিংঘা
দা	কেইরা, কেদে
	[বীরভূমে কাস্তে = কেদে]
কুড়াল	কার্‌হা, টাঙ্গা
গোবর	গুরিচ
মূত্র	আড়্
জলজমি	বৈ হোড়ো ক্ষেত
বেগুন	বেঙ্গাড়্
কলা	কাইরা
ইস্	হসি
মই	আড়গম্
লাঠি	ঠেঙ্গা
ছড়ি	হাপা
কোদাল	কুড়ি
ছাই	তরচ্
সার	খৎ
ধান	হোড়ো
ডাঙ্গাজমি	বউদক্ষেত
ঝিঙা	ঝিঙা
ভুট্টা	জোণারা
মিজেন	কোচে-কাঁড়্‌বা
গাড়ী	সাগাড়
চাপা-বাঁশ	আড়াশ
বাটুয়লি	রুকা
কাস্তে	দাত্রম্
	[সংস্কৃত 'দাত্র' শব্দজ?]
বিষ্ঠা	ইচ্
ধান্যজমি	হোড়ো ক্ষেত্

বাং	সাং
আগড়া	পেটেন্ন্
লাউ	হোতোৎ
বুট ¬	ভূট

ইহাদের গৃহস্থালীর আস্‌বাবও অল্পই। আহার্য্য, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও আমোদ প্রমোদের উপকরণও বেশী নহে। সে সকল বস্তুর মৌলিক নাম ;—

বাং	সাং
হাঁড়ি	টুকুই
খড়ম	বাধা
মুড়ি	খেজেরি
ঝোল	বাঁসি
লবণ	বুলুং
কলসী	কাস্তা
বসিবার পিঁড়া	গাণ্ডু
মুড়কি	উথ্‌ড়া
মদ	পাউরা
তেল	সুনুম্, সুলুং
ভাঁড়	চুকাঃ
ভাত	দাকা
দুধ	তোয়া
পচুই মদ	হাঁড়িয়া
মাংস	জিল্
গামলা	বাহানী
চিঁড়া	তাবেন্
তরকারী	উতু
হলুদ	সাসাং
আগুন	সেঙ্গেল্
ঝুড়ি	ফাতিয়া
ঝাঁপি	হাড়্‌কা
পিলসুজ	দিয়ারা (= দিউ + দয়রে)

বাং	সাং
উদুখল	[illegible]
চাক, ঢোল	[illegible]
নাগরা	টমাক
ধুচুনী	টুপলা
মাথালি	ছুপি
ঘুঙুর	ঝুনকা
ওড়না	বাকি
ঢেঁক	ঢিকি
ঢেঁকির মোহলা	মুসলো
বাঁশী	তিরিও
চুপড়ী	থ্যাচলা
সিমনি	ডোপকা
কাপড়	কিচ্‌রিচ্‌
কৌপান	ভাগয়া
খাড়ু	সাকম্
আংটি	মুন্দাম্
মাঁদল	তুমদাঃ
কুলো	হাটা
পাখা	বিনি
জামা	আঙ্গরোপ
ন্যাকড়া	গেন্দেরেচ্‌
হাতা	কাঁড়্‌ছু
লোহা	মেঁড়্‌হেঁৎ

সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ঐহিক সভ্যতার পরিমাণ যেমন অল্প, তেমনি তাহাদের ভাষাতেও এ সকল বিষয়ের বেশী শব্দ নাই। এ সকল জটিল বিষয়েও ভাববাচক শব্দ নাই বলিলেই হয়। যে সকল বস্তুর নাম আছে তাহার অধিকাংশই ইহাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য।

বাং	সাং
রাজা	রাজ
গ্রামের মণ্ডল	মাঝি

বাং	সাং
সহকারী মণ্ডল	পারানিক
বিবাহ নিষ্পত্তিকারক মণ্ডল	যোগমাঝি
ধনবান্ লোক	কিসাঁড়
শরীর	বেঙ্গেচ্ হড়্
ভিক্ষুক	কয়ক্সং হড়
ব্যভিচার	লাট
সন্তোষ	কুসি
আনন্দ	রেস্কো
অপরাধ	ঘ্যাট্
প্রণয়	গাতে
পরগণাধিপতি	পায়্গানা
পূজারী	নাইকী
পরিচর্য্যাকারী	কুড়াম্নাইকী
মৌজা পরিদর্শক গোমস্তা	চাকলাদার
হত্যা	গজগিডি
চুরি	কোম্ড়ো
সত্যকথা	সারি
মিথ্যা	এঁড়ে
আশ্চর্য্য	হাহাড়া
ভয়	বোতোর
জন্ম	জানাম্
মৃত্যু	গজ
ক্ষুধা	রেঙ্গেচ্
পিপাসা	তেতেং
পদাতিক সিপাহী	গুড়িৎ
ঘটক	রায়বার
মাহিন্দার	গুতি
রাখাল	গুপি
স্ত্রী	কাম্‌ড়ি (কামিনী শব্দজ ?)
গালি	রুহেদ
জরিমানা	ডাঁড়ম্ (দণ্ড শব্দজ)

বাং	সাং
জেল	হাজৎ
দ্বীপান্তর	জালাপুরি
[সমুদ্র	জালাপুরি]
মিলন, সম্মতি	গুলুক
বিবাদ, ঝগড়া	কেফারিয়াও, নেঞাও

ইহা ছাড়া ইহাদের ক্রিয়াপদ সমূহে ইহাদের সভ্যতা ও আচার ব্যবহার বিষয়ক অনেক শব্দ আছে। বলা বাহুল্য ইহাদের ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতিতে কোনও প্রভেদ নাই।

একই শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়ারূপে ব্যবহারের একটা উদাহরণ :—

দাড়ে = বল, শক্তি
" = পারা, সমর্থ হওয়া
" = সমর্থ, সবল
" খেৎ = উর্ব্বর জমি
কোম্বড়ো = চোর
কোম্বড়ো সেঙ্গেল = লুকান আগুন, দেশলাই
কোম্বড়ো = চুরি করা

বোধ হয় এই শব্দই প্রাকৃত ভাষায় 'কুম্ভিলঅ' ও সংস্কৃতে 'কুম্ভিলক' আকারে বিস্তৃত হইয়াছে।

কতিপয় মৌলিক ক্রিয়ার তালিকা।

দুড় প—বসা
সেনা—যাওয়া
ঞুর্—পড়িয়া যাওয়া
এহোপ—নমুনা
দিচ—চড়া, আরোহণ
লান্দা—হাস্য করা
রাঃ—কাঁদা
গুজু—মরা
গীতিচ—শোওয়া
এনেচ—খেলা, নৃত্য
জাপিৎ—নিদ্রা
কুলি—জিজ্ঞাসা
রড়্—কথা, বলা
এম্—দান
চিকা—করা
ঞেন্—দেখা
জোম্—খাওয়া
হহই—ডাকা, আহ্বান
হিজু, হেচ—আসা
দহই—রাখা, রক্ষা
আঁজম্—শ্রবণ
ঞাম্—প্রাপ্তি
সাবঃ—ধরা
বাডায়—জানা

ইন্ডিচ—চিমটিকাটা
কোল্—পাঠান
গের—কামড়ান
ওগচ—চিবান
পাগুর্—চর্ব্বিত চর্ব্বন
গাহুর—কণ্ডুয়ন
ঝাঝাৎ—গুং গুং করা
সিকিড়—কুট্‌ কুট্‌ করা
করেৎ—গালি দেওয়া
এগের্—বকা, ধমক
পেটের্—কাণ মলা
থাপা—চপেটাঘাত
কুহাও—কিল মারা
সবঃ—ঘুষি মারা
তাওয়া—আছাড় মারা
লেবেৎ—পা দেওয়া
থেইয়া—লাথি মারা
লিন—টিপিয়ামারা
হেও—কোলেকরা
তিঞ—ঠেলামারা
চাপাৎ—ঝাপটামারা
জোটেৎ—স্পর্শকরা
লাজা—ক্লান্তহওয়া
লোয়াও—কাতর হওয়া
এন্দেরে—রাগকরা
উয়াং—চটা
আডিস্—বিরক্তহওয়া
আকুৎ—বিরক্তহওয়া
ঞেল্—দেখা
ঞেপেল্-দেখাসাক্ষাৎকরা
ঞেম্—দেওয়া
ঞেপেম্‌আদান-প্রদানকরা
তেঞ—বপন করা
গালাং—গাঁথা
য়—সেলাইকরা
[য়—মাছি, ছুঁচ]
ঝাপ—ছাওয়া
তোল্—বাঁধন দেওয়া
উটি—গ্রহণ করা

উনুম্—ডুবা
চাপে—ভাসা
আতুঃ—স্রোতেভাসা
এসেৎ—ঢাকাদেওয়া
তেন্— ”
দাপাল্— ”
হারুপ্—উবুড়করা
উপ—ঢালা
দাল্—মারা
দাপাল—মারামারি-করা
তাপাম্—লড়াইকরা
দাপাল—লড়াইকরা
কে কারিয়াও-ঝগড়াকরা
নেঞাও—কলহ
রপড়—তর্ক
ঞুই—পানকরা
[আমরা জলখাই, ইহারা পান করে]
উৎ—গেলা
লে—গলা
আসেন্—সঙ্গে লইয়া বেড়ান
দাঁড়ান্—বেড়ান
হিজু—যাওয়া
সেন্—যাওয়া
ইরোক্—ধানকাটা
বেঙ্গেৎউরিচ্‌একদৃষ্টেতাকা
ওয়োং—উঁকিমারা
চাহাপ—হাঁকরা
দানাং—আড়াল করা
আড্—উঁৎকরা
ঠোপ—ফোঁটাফেলা
কয়্—ভিক্ষণ করা
কোঘড়ো—চুরিকরা
ওকয়্—লুকান
আরুপ্—ধোওয়া
আক্—দোওয়া
গাউইচ্—হাতের ইসারা
রিপিৎ—চোখের ইসারা

বেচ্—বমিকরা
উছ্‌লাও—বমিকরা
আজোপ্—হাইতোলা
আছিম্—হাঁচি
এড়া—বিষম লাগা
গোল—শিষ দেওয়া
য়েড়—গানের সুরকরা
সেরেং—গানকরা
ওংলোং—সম্পর্কে থাকা
কুরুমুটু—প্রাণ-পণকরা
কেঠনাও—অবশ হওয়া
ডোওরো—মেঘকরা
এভেন্—চেতন থাকা
জুদড়ুম্—ঘুমেধরা, ঢুলা
সাহেৎ—শ্বাসলওয়া
সাকেৎওডোং—শ্বাস ফেলা
সেটের্‌তিয়—পৌঁছান
ঞাম্—পাওয়া
ঞাঞাম্—খোঁজ-করা
বাপ্‌লা—বিবাহ-করা
ইভুৎ—বলপূর্ব্বক সিঁদুর দেওয়া
[কোনও অবিবাহিতা কন্যাকে বলপূর্ব্বক সিঁদুর দিলে আর বিবাহ হয় না। যে সিঁদুর দিয়াছে সেই বিবাহ করিবে। না করিলে সে কন্যা সমাজে পতিত হইবে।]
দোন—লাফান
দেড়্—দৌড়ান
রুই—বাদ্যকরা
হেড়হেৎ—নড়ান
কিংরি—কেনা
আকিংরি—বেচা
সং—ওজন করা
ইরোক্—বপন করা
রহয়—রোপণ করা
সাহঃ—হাল বহন

চাবা—সম্পূর্ণ হওয়া
গং—উত্তর দেওয়া
সাড়ে—শব্দ করা
আড়াং—গলার আওয়াজ করা
সেংওআ—উপাসনা করা
বিদোৎ—তাড়াইয়া দেওয়া
বিটোল—জাতিভ্রষ্ট করা
জাওরা—গচ্ছিত রাখা
হালাং—কুড়াইয়া লওয়া
গিডি—ফেলিয়া দেওয়া
হিরিচ্—পড়িয়া যাওয়া
আং—হারাইয়া যাওয়া
জং—মুছিয়া ফেলা
উম্—স্নান করা
দুল—ঢালা
তাং—ঢালিয়া দেওয়া
ওহোজ—সন্দেহ করা
রেবেৎ—গুজিয়া রাখা
আকা—টাঙ্গাইয়া রাখা
রেবেন—স্বীকার করা
ঘ্যাট—অপরাধ করা
[আমাদের ‘ঘাট’, কি শব্দ ?]
ব্যাগী—পরিত্যাগ করা
পেরেচ—পরিপূর্ণ হওয়া
বাপাগ—বিচ্ছেদ করা
পাটুপ—উপরাইয়া ফেলা
গুলুক—মিলন, মিলিত হওয়া
[বাং প্রবাদ—গুলুকে মুলুক মারে।]
রিৎ—পেষণ করা
তোং—উৎপাটন, তোলা
ওতোং—বাহির হওয়া
বলঃ—প্রবেশ করা
অং—ফু দেওয়া
হাতাও—গ্রহণ
বিডাও—পরীক্ষা করা

ভোপাং—খণ্ড করা
ভোপা—পুড়িয়া ফেলা
লাদে—ভার চাপান
ঢিপিল—মাথায় করা
(বোঝা)
পং—ব্যঙ্গ করা
হেরনেং—কক্ষে করা
হেও—কোলে করা
ভেওয়েং—হাতে ঝুলাইয়া
লওয়া
রাকাপ্—উঠা
আড়্ গুণ—নামা
আরগম—মই (ladder)
হারাঃ—বৃদ্ধি পাওয়া
লাগাতোৎ—তাড়াইয়া
দেওয়া
লাগুচু—লঙ্ঘন
নেহৎ—অমান্য করা
আণ্ডিঃ—ঠকান
আগুল্—প্রতিপালন
রেগসেৎ—ঝগড়াঝাটি করা
হিড়িং—ভুল করা
চেঠেং—শিখা
কামি—কাজ করা
গোড়ো—সাহায্য করা
সাহাই—আশীর্ব্বাদ করা

(আসির্বাও—আশীর্ব্বাদ
করা)
বাঝাও—সংলিপ্ত থাকা
এৎ—সুযোগ করা
ঢিলিসিলি—অবহেলা
সাসেৎ—কষ্ট করা
পোর্‌হো—উপকার করা
ওটাং—উড়িয়া যাওয়া
মেনা—থাকা
বায়ু—না, থাকা
ঝিচ—খুলিয়া দেওয়া
রেপেচ—কাড়াকাড়ি করা
উইহার—মনেকরা
স্বাধীর—চিৎ হইয়া
শোওয়া
শোড়তা—কাৎ হইয়া
শোওয়া
উইং—পাক দেওয়া
হয়ঃ—ক্ষৌর করা
ওডরাও—গড়াইয়া দেওয়া
তেঙ্গো—দাঁড়ান
জাল—চাটা, লেহন
উদ্—গেলা
তাসি—মেলিয়া দেওয়া
জি—চাখা
তুঞ্ঝই—বাণ নিক্ষেপ

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুর প্রাচীনত্ব। *

মুক্তিপীঠ বারাণসীধামে অনুষ্ঠিত বিগত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন কাল হইতে হিন্দু ও অহিন্দু সমাজের চিন্তাশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণের মধ্যে হিন্দু জাতি, হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম্ম সম্পর্কে বেশ একটু সজীব আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। অবসাদ কবলিত জড় প্রায় স্থবির হিন্দু জাতির এটা একটা শুভ লক্ষণ। কিন্তু ভারতীয় অহিন্দু সমাজের অনেক গণ্য মান্য মুখ্য পাত্র ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক স্বার্থশূন্য সার্ব্বজনীন সৌভ্রাত্র বর্দ্ধন এই জাতীয় অনুষ্ঠানকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া ইহার অভ্যন্তরে সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ সিদ্ধির বীজ নিহিত বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের কেহ কেহ আবার মহাসভার নাম করণে "হিন্দু" শব্দের সংশ্রব নিতান্ত অসমীচীন মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দু শব্দটী অতি শিশু ও অতি নির্ব্বোধ অর্থাৎ আধুনিক ও নিকৃষ্টার্থ বাচক। ঐরূপ একটা অর্ব্বাচীন হীনার্থক সঙ্কীর্ণতা মূলক শব্দ মহাসভার উত্তমাঙ্গে যোগ করিয়া দিয়া মহানুভব অনুষ্ঠাতৃবর্গ সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। আমরা এই গুরুতর অভিযোগের মূলে কতখানি সত্য নিহিত আছে, এবং হিন্দু শব্দের প্রাচীনত্ব বিচার ও যুক্তিসহ কিনা, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত। প্রাচীন প্রামাণিক শাস্ত্র নিবন্ধ ও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণই আমাদের এই আলোচনার মুখ্য অবলম্বন। শব্দার্থ নির্ণয় ও প্রয়োগ বিষয়ে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রথম ও প্রধান প্রমাণ। এ মতে শব্দ বিজ্ঞান মহোদধি পাণিনির ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ, ইহার বিখ্যাত বার্ত্তিক ও সুবিখ্যাত মহাভাষ্যে যখন হিন্দু শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, তখন ঐ শব্দ যে পাণিনি প্রচারের কালরূপে সিদ্ধান্তিত খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী, বার্ত্তিক ও মহাভাষ্যের কালরূপে নির্ণীত যথাক্রমে খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় ও ৩য় শতকে ও জন সমাজে অপ্রচলিত ও অজ্ঞাত ছিল ইহা একরূপ নিশ্চিত। পাণিনির পরবর্ত্তী

---

* এই প্রবন্ধ গত শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত।

অধুনাতন ব্যাকরণ সমূহেও হিন্দু শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না। অভিধানের দিক দিয়া দেখিলেও খৃষ্ট পঞ্চম শতকে প্রচারিত বলিয়া নির্দ্ধারিত শাব্দিক সিংহ অমরসিংহ সঙ্কলিত নাম লিঙ্গানু শাসন ও তৎপরগামী বিশ্ব, মেদিনী এমন কি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে সুরিবর হেমচন্দ্র রচিত অভিধান চিন্তামণি নামক বৃহৎ কোষ গ্রন্থেও হিন্দু শব্দের স্থান হয় নাই। ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে অব্যুৎপাদিত কতকগুলি শব্দ "অব্যুৎপন্ন" শব্দ নামে বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত দেখা যায়। হিন্দু শব্দটী ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত এরূপ কোন প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয় না। বেদ, বেদমূলক মন্বাদি স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, প্রামাণিক পুরাণ, তন্ত্র এমন কি কালিদাস ভবভূতি প্রমুখ মহাকবি কৃত অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের মহাকাব্য ও নাটকে হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। অবশ্য মেরুতন্ত্রের "হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া আমি সন্দর্ভের কলেবর অযথা ভারাক্রান্ত করিতে অনিচ্ছুক। কারণ বহু প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের মতে ঐখানি মৌলিক গ্রন্থ নহে। বিশেষতঃ ঐ বচন কয়টী এত অধিক সংগ্রহ গ্রন্থে ও খণ্ড প্রবন্ধে পুনরুক্ত হইয়াছে যে, ঐ চর্ব্বিত চর্ব্বনের রীতি পরিহার করাই সুরুচি সঙ্গত। সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়দের এমনি একটা গুণ বা দোষ আছে যে তাঁহারা সর্ব্বত্র সুলভ অনুস্বার বিসর্গের যোগে খাঁটি বিদেশীয় শব্দকেও বেমালুম স্বদেশীয় করিয়া লইতে অভ্যস্ত। প্রমাণ যেমন "নৃগোতীর্থ নিবাসিনা মোক্ষ মূলর ভট্টেন।" এস্থলে "নৃগোতীর্থ নিবাসিনা" শব্দাংশের অর্থ অক্‌সফোর্ডবাসী। আমরা এই অদ্ভুত আবিষ্কারের সুগম পন্থা ছাড়িয়া সনাতন আর্য্য শাস্ত্রের সুনীচূত বেদাদি শাস্ত্রে হিন্দু শব্দের প্রকৃতিগত কোন বীজ গূঢ় নিহিত ছিল কিনা, যাহা হইতে এই অক্ষয় হিন্দু সমাজ রূপ মহামহীরুহের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে, তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। প্রাচীন ও নবীন অভিধান গ্রন্থে সিন্ধু শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার অর্থ নদ, নদী বা দেশ বিশেষ। "দেশে নদ বিশেষে হব্ধৌ সিন্ধুর্ণাসরিতি স্ত্রিয়াং" অমর, নানার্থ বর্গ। "সিন্ধুঃ সমুদ্রে নদ্যাঞ্চ নদে দেশে চ দানয়োঃ", বিশ্ব। "সিন্ধুর্বমথু দেশাব্ধিনদেষ্বো সরিতি স্ত্রিয়াং", মেদিনী। উদ্ধৃত সুপ্রচলিত কোষত্রয়ের প্রমাণে সিন্ধু শব্দের নদ, নদী ও দেশ বিশেষ অর্থ বেশ সুপরিস্ফুট। শব্দ বিজ্ঞানের মহিমায় অবধারিত হইয়াছে যে এই নদী বাচক সিন্ধু শব্দই আর্য্য বংশধর হিন্দুগণের বীজ পুরুষ। দেশ বাচক সিন্ধু শব্দে প্রাচীন মগধ দেশ বুঝায়। ঐ দেশের প্রাচীন রাজা জয়দ্রথ সিন্ধুরাজ সমাখ্যায় আখ্যাত হইতেন। তাঁহার পুরাতন রাজধানী গিরিব্রজপুর অধুনা বিহার বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ে অন্যতম ষ্টেশন রাজগৃহ বা রাজগিরি নামে পরিচিত। সুতরাং পুরাতন এই সিন্ধু দেশের নাম হইতে বিশাল ভারত তথা ভারতেতর দেশে সুপরিচিত এই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি সর্ব্বথা অসম্ভব বিধায় নদী বিশেষার্থক সিন্ধু শব্দ হইতেই শব্দ বিজ্ঞানের নিয়মে আলোচ্যমান হিন্দু শব্দের আবির্ভাব বহু বিজ্ঞ সম্মত। ঋগ্বেদ সংহিতায় কাবুল নদী, সিন্ধু, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা প্রভৃতি পঞ্চনদ (পঞ্জাব) বাহিনী পঞ্চনদী ও পুণ্যতোয়া সরস্বতীর (হর্‌হ্বতি) পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ও প্রশংসা দেখা যায়। ঐ মহাগ্রন্থের ১।১২৬।১ এবং ৫।৫৩।৯ সূক্ত যুগল এস্থলে প্রমাণার্থ উদ্ধৃত হইল;—

"অমন্দান্ স্তোমান্ প্রভরে মনীষা সিন্ধাবধি।
যোমে সহস্র মমিমীত ক্ষিয়েতো ভাবান্ত।
সবানতু র্ত্তো রাজা শ্রেব ইচ্ছ মানঃ॥"

"আমি বুদ্ধি সহকারে সিন্ধুতীর নিবাসী ভব্য নয় স্তনয়ের উদ্দেশে তেজোবিশিষ্ট স্তুতি সমুদয় উৎপাদন করি। ঐ অপরাজেয় নরপতি প্রতিষ্ঠাভিলাষী হইয়া আমার দ্বারা সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।"

"মাবো রসানিতভা কুভা ক্রমুর্মাবঃ সিন্ধু নিরীরমৎ।
মাবঃ পরিষ্ঠাৎ সরযুঃ পুরীষিনী অস্মে ইৎ সুম্নমস্তবঃ॥"

আজমির, বৈদিক যন্ত্রালয়ের সংস্করণ ৮৩।২৬৭ পৃষ্ঠা :—

"মরুদগণ ! রসা, অনিতভা, কুভা (কাবুল নদী) ক্রমু অথবা সিন্ধু যেন তোমাদের গতিরোধ না করে। সলিলময়ী সরযু তোমাদিগকে যেন রুদ্ধ করিয়া না রাখে। তোমাদের আগমনজনিত সুখপুঞ্জ আমাদের সমীপস্থ হউক।"

ইহা ছাড়া ঋক্ সংহিতার ৩ মণ্ডলের ৩৩ সূক্ত, ৪ মণ্ডলের ৩০ সূক্ত, ৬ মণ্ডলের ৬১ সূক্ত, ৭ মণ্ডলের ১৮।৯৫।৯৬ সূক্ত, ৮ম মণ্ডলের ২০ ও ৬৩ সূক্ত, ১০ম মণ্ডলের ১৫।৬৪।৭৫ সূক্ত ও অপরাপর বহুল সূক্তে সিন্ধু, সরস্বতী এবং পঞ্চ নদ প্রদেশীয় অন্যান্য বহু নদীর উল্লেখ দেখা যায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য। ঋগ্বেদে ভুয়ো ভূয় উল্লিখিত "অধো অক্তাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ" ৩, ২, ১৩, ২।
"সুদেবো অসি বরুণ যস্যতে সপ্ত সিন্ধবঃ" ৬, ৫, ৭, ২।
এই সপ্ত সিন্ধু শব্দ সুপ্রাচীন পারসিক গ্রন্থ আবেস্তায় উচ্চারণ ব্যত্যয়ে "হপ্ত হেন্দু" হইয়াছে। পঞ্চনদ বা পঞ্জাব প্রদেশই ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধু এবং আবেস্তায় হপ্ত হেন্দু নামে পরিচিত। প্রাচীন পারসিকগণ পঞ্চনদ প্রদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন। ভারতের আভ্যন্তরীন জনপদ সমূহ তাঁহাদের নিকট সুপরিচিত ছিল না। তাঁহারা ভিন্ন দেশের অধিবাসী থাকায় প্রাকৃতিক জল বায়ুর প্রভাবে শব্দ উচ্চারণের বৈষম্য যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। এই উচ্চারণ ভেদের ফলে ভারতে উপনিবিষ্ট পারসিকগণ "স" স্থানে "হ" উচ্চারণ করিতেন। এজন্য সিন্ধুতীরবাসী প্রাচীন আর্য্যগণ প্রথমে তাঁহাদের নিকট "হেন্দু বা হিন্দু" নামে পরিচিত ও ক্রমে মুসলমান জগতে ভারতবাসী মাত্রই হিন্দু নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চারণ ভেদ বা বর্ণ ব্যত্যয়ের সমর্থন কল্পে প্রাজ্ঞবর অক্ষয় চন্দ্র লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত ও আবস্তিক ভাষার শব্দ ভেদ বিষয়ে এই একটা নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, শব্দ বিশেষে সংস্কৃত ভাষার সকার স্থানে আবস্তিক ভাষায় হকারের আদেশ হইয়া থাকে। যেমন সংস্কৃত সোম, সিন্ধু ও সুক্রতু শব্দের স্থানে আবস্তিক হোম, হেন্দু ও হুক্রতু হয়।" টি, ক্লার্ক নামধেয় জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের রচিত তুলনা মূলক ব্যাকরণ (T. Cleark's Comparative Grammar) এই সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ। সুপ্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ পাণিনির কাল হইতে এই বর্ণ গম, বর্ণনাত্যয়, বর্ণ বিকৃতি ও বর্ণনাশরূপ নিপাতনের পারিভাষ্য শব্দ শাস্ত্র সম্মত। অষ্টাধ্যায়ীর "পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং" ৬৩।১৯ সূত্রটীর বৃত্তি, টীকা ও উচ্চারণাদির প্রতি চিত্ত নিবেশ করিলে এ বিষয়ের প্রামাণ্য সহজেই উপলব্ধ হইবে। "হিনস্" ধাতু হইতে বর্ণ বিপর্য্যয়ে যেমন "সিংহ" শব্দের উৎপত্তি, তেমনি "সিন্ধু" শব্দ হইতে "হিন্দুর নিষ্পত্তি বুঝিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে সূত্র বা নিয়মের মুখাপেক্ষা নাই। কারণ নিয়মের সাহায্য ব্যতিরেকে পদ নিষ্পন্ন হওয়ার নামান্তর নিপাতন। শব্দ শাস্ত্রের চরম মীমাংসা গ্রন্থ মহাভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, "যৎ লক্ষণেনানুৎপন্নংতৎসর্ব্বং নিপাতনাৎ" ইতি। আমরা সংস্কৃত অসুরের স্থানে অহুর, সপ্তাহের স্থানে হপ্তা, মাসের স্থানে মাহ এখনও ব্যবহৃত হইতে দেখি। অবেস্তার সময়ে হিন্দুদিগের সহিত পারসিকগণের মিলন হইত একথা অবেস্তায় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। ঐ সম্মিলনের ফলে সিন্ধুতীর বাসী আর্য্যগণের বিদেশীগণ কর্ত্তৃক হিন্দু নামে অভিহিত হইতেন। দেশের নামে দেশবাসীর নামকরণ চির প্রচলিত প্রথা। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি উহার জীবন্ত নিদর্শন। দেশান্তরে বর্ণভেদের ন্যায় ভাষা ও উচ্চারণ ভেদের অস্তিত্ব সর্ব্ববাদী সম্মত প্রত্যক্ষ সত্য। পূজ্যপাদ বৃহস্পতি, দেশান্তরের পরিভাষা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন; "যেখানে বাক্যের উচ্চারণ ভেদ হয়, উভয় শব্দের মধ্যে মহাগিরি ব্যবধান থাকে, অথবা মধ্যস্থলে মহানদী বিদ্যমান, তাঁহাকে দেশান্তর কহে।"

সার্থক রঘুবংশের উদ্বাহ তত্ত্ব ধৃত বচন। সংস্কৃত সিন্ধুর গ্রীক ইন্ডাস (Indus) হইতে হিন্দুশব্দের উদ্ভব অসম্ভব নহে। কারণ ভারতে মুসলমান সমাগমের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যবন বা গ্রীকগণ সমাগত হইয়াছিল, ইহার বহুল প্রমাণ প্রচলিত আছে। কালীদাসের কাব্য অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক ভারতীয়গণের মুসলমান সংস্রবের বহু পূর্ব্বে লিখিত। উহাতে আমরা একাধিক স্থলে যবনী বা গ্রীক রমণীগণের উল্লেখ দেখিতে পাই। পাণিনি ব্যাকরণের বার্ত্তিকে যবন স্ত্রী অর্থে যবনী, যবন লিপি অর্থে যবনানী এই শব্দদ্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতে মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ হিন্দু নামে অভিহিত হইতেন, এ উক্তিও যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, হিমালয় ও বিন্দু সরোবরের সন্নিহিত স্থলে ভারতীয় আর্য্যেরা প্রথম উপনিবিষ্ট হন। এজন্য তাঁহারা হিমালয়ের "হি"ও বিন্দুর "ন্দু" যোগে হিন্দু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলতঃ যেদিক দিয়াই দেখা যাউক, ভারতবর্ষ নিবাসী অতি প্রাচীন আর্য্য বংশীয়েরাই যে কালক্রমে হিন্দুনামে বিখ্যাত হইয়াছেন ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ। প্রমাণার্থ এস্থলে আমরা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিলাম। খ্যাতনামা প্রত্নতাত্বিক স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "ভাষা তত্ত্ববিৎ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত মহাশয়গণ স্থির করিয়াছেন, পৃথিবীর অধুনাতন মাননীয় সম্প্রদায় সমূহ পুরাকালে একজাতি ও এক ভাষাভাষী ছিলেন। সেই জাতির নাম আর্য্য।..........ফলতঃ আর্য্য শব্দের গভীর ও বিস্তৃত অর্থে এই বুঝায় যে, আসিয়া ও ইউরোপের প্রায় সমুদায় সভ্যজাতী অর্থাৎ হিন্দু, পারসিক, কেল্টিক, টৈউটনিক, রোমক, গ্রীক, স্লাভোনিক, ও ইলিরীক, প্রভৃতি সমুদয় সভ্য ও শ্রেষ্ঠজাতি প্রাচীন আর্য্যনাম ধারী।" ঐতিহাসিক-কেশরী রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, "অনুমান চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে হিন্দু-কুশ পর্ব্বতের উত্তর আদিম আর্য্যজাতীর বসতি ছিল। হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমিও, ইটালিও, ফরাসী প্রভৃতি অনেক জাতি প্রাচীন আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন।..........এইরূপ গৃহ নিষ্ক্রান্ত একদল আর্য্য সন্তান আধুনিক ভারত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। হিন্দুগণ এই আর্য্যের সন্ততি"। আদিম আর্য্যজাতি শীর্ষক সন্দর্ভ। উক্ত হিন্দুকুশ শব্দ হইতে "হিন্দু" নাম হওয়াও অসম্ভব নহে। প্রতিভার মূর্ত্ত ছবি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, যে ভারতবর্ষ ছয়শত চৌষট্টি খৃষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়।..........আরব্যদিগের প্রথম আক্রমণের ৫৩৯ বৎসর ও তুর্কিদিগের প্রথম ভারত আক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে তৎস্থানীয় পাঠানেরা কখনই আরব্য ও তুর্কী বংশীয় দিগের ন্যায় সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও প্রাতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুর্কীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুর্কী ও পাঠান এই তিন জাতীর যত্ন পারম্পার্য্যে সার্দ্ধ পাঁচশত বৎসরে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লুপ্ত হয়"। বিবিধ প্রবন্ধ। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আরব্য মুসলমান গণের ভারতে আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রচিত সুপ্রাচীন বেদাদি শাস্ত্রে হিন্দু শব্দের অনুল্লেখের ইহাই প্রত্যক্ষ কারণ। ঐ পূর্ব্বতন কালে একমাত্র আর্য্য শব্দই মহনায় প্রাচীন ভারতীয় জাতীর পরিচায়ক ছিল। বিজেতা মুসলমানগণ যেমন যেমন রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধিপত্য প্রসারে কৃত যত্ন হইলেন, তেমনি তেমনি তাহারা বিজীত জাতীর পূর্ব্বগৌরব ব্যঞ্জক আর্য্য পদবীটী উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের নিজ ভাষার "গুলাম" "কাফের" প্রভৃতি হীনার্থ জ্ঞাপক হিন্দু শব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। "মুসলমান সম্রাটের আমলে পারস্য ভাষা রাজ ভাষার আসন অলঙ্কৃত করিল। সুতরাং রাজ কর্ম্মচারী ভারতবাসী মাত্রেই তখন রাজ প্রদত্ত হিন্দু নামে পরিচিত হইতে বাধ্য হইলেন. এইরূপ ক্রমে ক্রমে অনার্য্য জাতি ব্যতীত ভারতবাসী আর্য্য সন্তান মাত্রই আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান কালের ভারতবাসী আর্য্য সন্তান জৈন, বৌদ্ধগণ হিন্দু নামে পরিচিত না হইলেও মুসলমানের আমলে তাঁহারাও হিন্দু বলিয়া পরিচিত

হইতেন। কারণ মুসলমানিক গ্রন্থে এই দুই সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। মুসলমান আমলে চীনদেশে যে সকল বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে ভারতীয় বৌদ্ধগণ হিন্দু বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। হিন্দু বৌদ্ধের ন্যায় "হিন্দু গ্রীক্ ঐ প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্য সমাজের বিশালতার সাক্ষ্যদান করিত। এখন আর্য্য শব্দের ন্যায় হিন্দু শব্দও পারিভাসিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ॥ বিশ্বকোষ হিন্দু শব্দ দ্রষ্টব্য। মহানুভব বঙ্কিম চন্দ্র একাধিক স্থলে প্রাচীন আর্য্য শব্দ ঠিক হিন্দু অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। "যে প্রাচীন হিন্দু জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে শ্রদ্ধা করি, তাঁহারা বেদে আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।.....। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্য ছিলেন, আমরা তাঁহাদিগের সন্তান এজন্য আমরা আর্য্য বংশ। বাঙ্গালীর উৎপত্তি বঙ্গ দর্শন। মনীষী ভূদেব তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের ২য় অধ্যায়ে হিন্দু সমাজ প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুঝাইয়াছেন; ভারতবর্ষ মহাদেশে যে জাতীয় ভাবটী আর্য্য সমাগম কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত এবং অঙ্কুরিত হইয়া মুসলমান প্রবেশে অসঙ্কুচিত প্রত্যুত প্রবলীকৃত হইয়াছে, এবং ইতিহাসাদিতে যাহার মহীয়সী ছায়া দৃষ্ট হইয়াছে, সেই কল্পবৃক্ষর সুমহৎ কাণ্ড হিন্দু সমাজ। এই সমাজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রধান বলিয়া গণ্য। ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্য সংখ্যা যত এক হিন্দু সমাজই তাহার অষ্টমাংশ।" উদ্ধৃত যুগল সন্দর্ভ হইতে ঐ দুই মহাত্মা পুরাতন আর্য্য শব্দের অপেক্ষায় নবীন হিন্দু শব্দের উপর বেশী জোর দিয়াছেন বুঝায়। ইহারা আর্য্য ও হিন্দু শব্দের জাতি গত মর্য্যাদার তারতম্যের বিচার অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন। যুক্তি ও বিচারশীল অক্ষয়কুমার কিন্তু ভিন্ন পথে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নাম ধেয় উপাদেয় গ্রন্থে শব্দ বিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়া হিন্দুনামের গৌরব ও উৎপত্তি তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট বিচার গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে আমরা তাঁহার মতের সার সঙ্কলনের প্রয়াস পাইয়াছি। বৈদিক সিন্ধুর বীজে সনাতন আর্য্যের রক্ত মাংসেই বর্ত্তমান হিন্দু জাতির সমুৎপত্তি, ইহাই লেখকের দৃঢ় ধারনা। এই ধারনা বশতঃ লেখক হিন্দু জাতির বক্ষপুষ্ট প্রসারিনী মহাসভার প্রচেষ্টাকে শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রাচীন পদ্ধতি সম্মত বলিয়া বিশ্বাস করেন। লেখকের এই ধারনা সমূলক কিনা, সুধী পাঠক মণ্ডলী তাহার বিচারের যোগ্য অধিকারী। জাতীয় নব জাগরণের মঙ্গল উষায় স্বজাতীয় অতীত গৌরব কাহিনীর পুণ্য স্মৃতির উদ্বোধন কামনায় জাতীয় সাহিত্যের পবিত্র সম্মিলন ক্ষেত্রে সমবেত সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মণ্ডলী এই গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়টীর প্রতি সাভিনিবেশ মনোযোগ দান করিলে সবিশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

বর্ষার গানে রবীন্দ্রনাথ।

বাঙ্গলার বর্ষার গান রচয়িতাদের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণ স্মরণীয় এবং বরণীয়। কিন্তু আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্র নাথের গান গুলির ভিতর বর্ষা যেমন ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন আর কোথাও নহে। বাঙ্গলার সুনীল আকাশ বর্ষাগমে যেমন নবীন এবং শ্যামতর মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া দলিত-কজ্জল-কান্তি ধারণ করে, ঘনঘোরা নিশীথিনী বিদ্যুৎ চমকে, মেঘ-মৃদঙ্গ বাদনে থাকিয়া থাকিয়া যুগপৎ স্ফুরিত এবং ধ্বনিত হইয়া ওঠে, শ্যামতরু ছায়াচ্ছন্ন পল্লীগুলি নববর্ষাজলে ও ঝর ঝর বারিপাতে থৈ থৈ করিতে থাকে, গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জন শ্রবণে দর্দ্দুর কুল কল রোল আরম্ভ করিয়া দেয়, কদম্ব-কেতকী-যুথীকা-কুঞ্জগুলি নববারিস্পর্শে শিহরিয়া শিহরিয়া ফুলে ফুলে ভরিয়া ওঠে, জলকণাপূর্ণ আর্দ্রবাতাস প্রবল বেগে বহিতে থাকে, পুকুরে পুকুরে পানাগুলি সেই বাতাসে ইতস্ততঃ সরিয়া সরিয়া জমাট বাঁধিতে বা বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে, পুকুর পারের হিজল গাছে বিচিত্র রঙ্গের হিজল ফুলের মালা দুলিতে থাকে,

"গৌরী" গাছে রক্ত চন্দন, কত সুন্দর শ্বেত পুষ্পরাজি গুচ্ছে গুচ্ছে শোভা পাইতে থাকে, খালে বিলে, দীঘিতে দীঘিতে কুমুদ কহ্লার ফুটিয়া ওঠে, বাতাস মাঠে মাঠে—"হরিৎক্ষেত্রে ঢেউ খেলায়ে যায়"—উচ্চ প্রান্তর গুলি নবদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত হইয়া অপূর্ব্ব সবুজ শোভা বিস্তার করিতে থাকে, গাছ লতা তৃণ গুলি শ্যামতর পল্লবে উজ্জ্বল মরকত শোভায় সুশোভিত হয় এবং তাহাদের শ্বেত, পীত, রক্ত, নীল বিচিত্র বর্ণের কুসুম রাজি নীলকান্ত, পদ্মরাগ, প্রভৃতি মণিমালার শোভা ধারণ করে, আমাদের রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান গুলিতেও আমরা তেমনই বিচিত্র চিত্র দেখিতে পাই। বর্ষা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এমন তর ডুবিয়া তলাইয়া গিয়া গান করিতে কবিকুল শিরোমণি কালিদাস ভিন্ন আর কোন ও কবিকে দেখি নাই। এ গান গুলি যেন বর্ষার রসে, গন্ধে, গর্জ্জনে, বর্ষণে, সৌন্দর্য্যে, বিভীষিকায় ভরপুর। এই ভীষণ সুন্দর বর্ষার ভিতর দিয়াই কবি তাঁহার প্রিয়তমের "দরশপরশ" পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। সেই প্রেমিক চূড়ামণির সরস পরশে প্রেম বিহ্বল কবিহৃদয় ময়ূরের মত কলাপ বিস্তার করিয়া নাচিয়া উঠিয়াছে।

একদা 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' 'মেঘ মেদুর অম্বর' এবং 'তমাল দ্রুম শ্যাম বনভূম' দেখিয়া আমাদের কবি পুলকাঞ্চিত দেহে গাইলেন,

মিশ্র কানাড়া—একতালা।

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি,
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
"এসেছে এসেছে" এই কথা বলে প্রাণ,
"এসেছে এসেছে" উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।"

আকাশে বাতাসে, প্রকৃতিরাণীর অঙ্গনে, আপনার নয়নে,—আপনার হৃদয়ে এই নব বর্ষার আগমন, অনুভব করিয়া কবি তাহার প্রিয়তমেরই আবির্ভাব উপলব্ধি করিলেন এবং তাহাকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বলিলেন—ওগো, যদি এসেছ তবে অমনি গোপন সঞ্চারে চলে যেও না, আমার মেঘলা গানের বাদল অন্ধকারে স্থির হইয়া দাঁড়াও।

মিশ্র—ঝিঁঝিট।

"গানের সুরের আসন খানি
পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, ওগো পথিক
তুমি এসে বসবে বারে বারে।
ঐ যে তোমার ভোরের পাখী,—
নিত্য করে ডাকা ডাকি,
অরুণ আলোর খেয়ায় যখন
এস ঘাটের পারে,
মোর প্রভাতীর গান খানিতে
দাঁড়াও আমার দ্বারে।

আজ সকালে মেঘের ছায়া
লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভরেছে ঐ গগনের
নীল নয়নের কোনে।
আজকে এলে নতুন বেশে
তালের বনে মাঠের শেষে,
অমনি চলে যেয়ো না কো
গোপন সঞ্চারে।
দাঁড়িও আমার মেঘলা গানের
বাদল অন্ধকারে।"

প্রিয়তমের অধিষ্ঠান-পূত সুরের ঝঙ্কার দিয়া কবি তখন মেঘকে সাদরে আহ্বান করিয়া গাইলেন,—

মল্লার—ঝাঁপতাল।

"এসহে এস সজলঘন বাদল বরিষণে,
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এসহে এ জীবনে।

এসহে গিরি শিখর চুমি, ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি,
গগন ছেয়ে এসহে তুমি গভীর গরজনে।

ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে,
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে।
এসহে এস হৃদয় ভরা, এসহে এস পিপাসাহরা,
এসহে আঁখি শীতল করা ঘনায়ে এস মনে॥"

দিনের আলো ফুরিয়ে গেল। মেঘেঢাকা সূর্য্যদেব অস্তাচলে হেলিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা সমাগমে দিগ্বধূগন নিবিড় তিমিরাবগুণ্ঠনে বদন মণ্ডল আচ্ছাদিত করিলে কবি গাইলেন,

ইমান্ কল্যাণ আদ্ধা।

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
গেল রে দিন ব'য়ে।
বাঁধন হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে
একলা বসে' ঘরের কোণে, কি ভাবিযে আপন-মনে
সজল হাওয়া যূথীর বনে কি কথা যায় কয়ে'।
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই কূল,
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজেবনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন সুরে আজ
ভরিয়ে তুলি,
কোন ভুলে আজ সকল ভুলি
আছি আকুল হয়ে॥"

ক্রমে ঝড় উঠিল। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। মেঘ গর্জনে গৃহভিত্তি প্রকম্পিত হইতে লাগিল, আকশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিজুলি উন্মাদিনীর মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে—এমনই সময়ে কবি তাঁহার প্রিয়তমের আগমন অনুভব করিয়া গাইলেন,

মিশ্র সিন্ধু—ঝম্পক।

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ সখা বন্ধুহে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলে হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন নদীর পারে,
গহন কোন বনের ধারে,
গভীর কোন অন্ধকারে,
হ'তেছে তুমি পার।"

আর একদিন বাদল রাতে কবি নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার প্রিয়তমের আবির্ভাব অনুভব করিলে জাগ্রতচিত্ত হইয়া গাইলেন,—

নট্ মল্লার—ঝম্পক।

"আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে, ফিরো না কর,
করুণ আঁখি পাত।
নিবিড় বন-শাখার পরে আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদল ভরা আলস ভরে ঘুমায়ে আছে রাত।
বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রা হারা প্রাণ,
বরষা জল ধারার সাথে গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে বাহির হল তিমির তলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে
বাড়ায়ে দুই হাত।"

কবি তখন তাঁহার প্রিয়তমকে—তাঁহার প্রাণ কান্তকে "বাদল" রূপেই দেখিতে পাইলেন। রাধিকাও তাহার নীল নটবর শ্যামসুন্দরকে তরুণ মেঘরূপে দেখিয়া ছিলেন। প্রেম

দৃষ্টিতে সবই প্রেমাস্পদময় হইয়া যায় - বসুধামপিতন্ময়ং। কবি তন্ময় হইয়া গাইলেন,—

মিশ্র—ঠুংরি।

"আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা,
এসহে গোপনে আমার স্বপন লোকের
দিশা হারা।
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন,
দাও ঢেকে মোর পরাণ মন,
আমি চাইনে তপন চাইনে তারা।
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে,
নিয়ো গো, নিয়ো গো,
আমার ঘুম নিওগো হরণ করে।
আমার একলা ঘরে চুপে-চুপে
এস কেবল সুরের রূপে,
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া।"

দেখিতে দেখিতে আষাঢ় শেষ-হইয়া গেল। পিচ্ছিল পথে-সন্তর্পনে পদবিক্ষেপ করিয়া ধীর গমনে শ্রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইল। কবি শ্রাবণ প্রভাতে গাইলেন,

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে' আসে;
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একাধারের পাশে।

কাজের দিনে নানা কাজে, থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে।

তুমি যদি না দেখা দাও কর আমায় হেলা,—
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা?
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।"

শ্রাবণের ঘনঘটার দিকে চাহিতে চাহিতে দেখিলেন তাঁহার নয়নের মণি প্রাণের প্রাণ গোপন পদ সঞ্চারে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু স্বপ্নবৎ এখনই যদি অন্তর্হিত হ'ন এই ভয়ে ভীত হইয়া কবি গাইলেন,—

গৌড় মল্লার—ঝম্পক।

"আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে"
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি, বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে?

কূজনহীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন পথিক তুমি পথিক-হীন পথের পরে।
হে একা সখা হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম যেওনা মোরে হেলায় ঠেলে।"

নাথ তুমি ত চলে গিয়াছিলে? দেখা দিয়া মাঝে মাঝে তুমি কোথায় লুকাও? আসিয়াছ ত এবার আর যাইও না। এইত তোমায় দেখিতেছি,—

মিশ্র—ঠুংরি।

"আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ—আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।

সকল আকাশ সকল ধরা
বর্ষণেরি বাণী ভরা।
ঝর ঝর ধারায় মাতি
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে।"

এসেছ যদি বন্ধু, তবে তোমার কাছে আমার আকুল প্রাণের এই একান্ত প্রার্থনা,—

বেহাগ—আদ্ধা।

"শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝ'রে
তোমারি সুরটী আমার মুখের পরে বুকের পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে,

নিশি দিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে।
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে॥
যে শাখায় ফুল ফোটেনা ফল ধরে না একেবারে,
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে
যা কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবন হারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে।

দেখিতে দেখিতে 'শাওনগগনে ঘনঘোরঘটা' 'ভরাবাদর মাহ ভাদরে' পরিণত হইল। এখনও পর্য্যাপ্ত মেঘ মুক্ত হইয়া আকাশ উজ্জ্বল নীলে উদ্ভাসিত হয় নাই। এখনও কৃষ্ণ মেঘ সকল ঝর্ ঝর্ করিয়া বারি বর্ষণ করিতেছে। এখনও 'ভরানদী ক্ষুর ধারা খরপরশা'। খাল বিল দীঘি সরোবর কূলে কূলে ভরা। এমনি সময়ে একদিন আকাশ মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া মুষল ধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। কবির প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁর প্রাণের দেবতা আজ প্রকৃতির এই তাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে যোগদান করিয়া পাগলের মত সাড়া দিয়া উঠিয়াছেন, তিনি মেঘ মৃদঙ্গে তাল রাখিয়া গাইয়া উঠিলেন,—

ইমন্—তেওরা।

"আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে,
আকাশ ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে;
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন
লুটেছে এই ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কি কল রোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে,
আজ এমন করে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে।"

ভরা ভাদর চলিয়া গেল। আশ্বিনের আরম্ভ। এখন দলে-দলে শুভ্রমেঘ নীল আকাশের মাঝে-মাঝে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান প্রভাত সূর্য্য-কিরণে ঝল-মল করিয়া দুলিতে লাগিল। সেফালিকুঞ্জ ফুলের ঝাড়ের বাজার মিলাইল। স্থলে জলে পদ্মফুলের প্রদর্শনী খুলিয়া গেল। শারদ লক্ষ্মীর আগমনে প্রকৃতি নূতন বেশ ধারণ করিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন একি? সহসা কৃষ্ণমেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কবি গাইলেন,

কেদারা (মিশ্র)—আদ্ধা।

"কোন ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা পাগল হাওয়ার গান সে গায়।
মাঠে মাঠে পুলক লাগে ছায়া নটের নৃত্য রাগে,
শরৎ রবির সোনার আলো উদাস হয়ে মিলিয়ে যায়।
কি কথা সে বলতে এল ভরা ক্ষেতের কানে কানে।
লুটিয়ে পড়া কিসের কাঁদন উঠেছে আজ নবীন ধানে।
মেঘে অধীর আকাশ কেন, ডানা মেলা গরুড় যেন,
পথ ভোলা এক পথিক এসে পথের বেদন আনল ধরায়।"

সে-দিন সারা দিনই বারি বর্ষণ হইল। বেলা শেষেও বিরাম নাই। স্ফীতীভূত নদীবেগ অবিরাম বর্ষণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তমাল তালিবন মসীবর্ণে অন্ধকার হইল। এ যে সেই শ্রাবণেরই পুনরাভিনয়! তাই বুঝি আমার প্রিয়তম তুমি আজ দিন শেষে ভিজিতে ভিজিতে আমার এ গৃহে উপস্থিত হইয়াছ? তবে এস নাথ, আজ আমি সেই

বৃন্দাবনের গোপীগণেরই মত তোমার ঐ সিক্ত চরণ আমার এই আলুলায়িত কুন্তলে মুছিয়া দিব। আর প্রেমের বাতি জ্বালিয়া হে আমার প্রেমময়, আমার 'পরাণ খানি' পাতিয়া দিব, তুমি উহাতে তোমার ঐ চরণ দু'খানি রাখিও। দেখ নাথ,

মিশ্রমল্লার —তেওরা।

"উতল ধারা বাদল ঝরে
সকল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী ওঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমাল বনে আঁধার করে।
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দিব প্রেমের বাতি,
পরাণ খানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার পরে।"

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়।

—•—

কিসের অভাব ?

যাত্রী ছেড়ে যাবে আজ বহুদূর দেশ,
বলতুমি "সেথা গিয়ে থাকি আমি বেশ।"
মুখে বল এইকথা কাজে তাতো নয়,
বিদায়ের আঁখিজল তারি পরিচয়।
নাও সব দেখে শুনে যাহা কিছু চাই,
ভুলে যাও পাছে কিছু বলি আমি তাই।
প্রিয়া মোর সযতনে চাপি' আঁখি জল,
আনমনা এইকথা কহিল কেবল।
বলিলাম আমি ধীরে—"কিছু ভুলি নাই"
শতবার খুঁজে কিন্তু কত কিনা পাই।
বিদায়ের রাঙা আঁখি তারি তারি মুখ,
পিছে রাখি' হইলাম বিদেশ উন্মুখ।
দূর পথে মনে হ'ল যেন কিছু ভুলে,
আসিয়াছি রেখে মোর গৃহ কোণে তুলে।
খুলে সবি দেখিলাম,—কই কিছু নয়,
অভাব কিসের তবে হইল উদয় ?
বুঝালাম কত মনে বুঝিল না মন,
দ্বিগুণ হইল কোন অভাব বেদন ?
বুঝেও বুঝিনে যেন পেয়েও না পাই,
প্রাণ বলে—পাই নাই—আরো কিছু চাই।

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়।

—

পক্ষিতত্ত্ব।

বাজ্।

বাজ শিকারী পাখী। ইহারা ভয়ানক হিংস্র এবং মাংস প্রিয়। জীবদেহ ভক্ষণ করিয়াই বাজ জীবন ধারণ করে।

বাজ দুই প্রকারই আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই। তবে ইহাদের পর্য্যায় ভুক্ত পাখী অনেক আছে। আমাদের দেশে যে পাখী বাজ নামে পরিচিত আমরা তাহাদের কথাই বলিব।

(১) এক শ্রেণীর বাজ আকারে ছোট—কাকের চেয়েও ছোট। কোকিলের প্রায় সমান গড়ন। ইহা-দিগকে টুকী বাজ, কৈতরী বাজ বা ছোট বাজ বলে। এগুলিই প্রকৃত বাজ এবং ভয়ঙ্কর। এই বাজ লেজ সহ ১৫।১৬ ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। ইহাদের মাথা গোল চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা। উভয় চক্ষু হইতে ঠিক সামনে কপালের দিকটা ঢালু। ইহাতে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে ইহারা সমর্থ। বাজের চক্ষু একটা বড় মজারী

কলাইর মত। চঞ্চু পরিষ্কার। উহার বহিরাবরণের চামরা ধুসর এবং অতি পাতলা। তারপর চক্ষুর বেষ্টনী ঈষৎ পীতাভ। তার ভিতরে সাদা ও তারপর কৃষ্ণ বর্ণের বেষ্টনী। বাজ আপন সুবিধামত স্থানে বসিয়া শিকার প্রতীক্ষা করে। তার অপেক্ষা বলিষ্ঠ কাহাকেও দেখিলে চক্ষু ঘুরায়। ফিঙ্গার মত দুরন্ত সয়তানও বাজের ছায়ায় পা দিতে চাহে না।

বাজের পালক ধুসর বর্ণের। তবে উপরের বর্ণ গাঢ়, পালকের নীচের দিকের রং অনেকটা পাতলা। প্রত্যেক পালকের মাথায় ঈষৎ কৃষ্ণাভ রেখা আছে। লেজের বর্ণও তাহাই। বুকের উপরিভাগ হইতে লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নিম্ন দিকে রং সাদা। খুব ধব্‌ধবে সাদা নহে, মেটে সাদা। গলার লোম বা সূক্ষ্ম পালক সকল প্রায় ছাইএর রং, তাহাতে একটু লাল্‌চে আভা।

বাজ খুব মোটা সোটা না হইলেও ইহাদের শরীর শক্ত এবং মজবুত। ডানা দুইটি দৃঢ় এবং পাখা গুলি তাহাতে ঘন সন্নিবিষ্ট। অনেক পক্ষির পাখাই সহজে উঠিয়া আসে, কিন্তু বাজের কাঁচা পালক তুলিতে একটু জোরে লাগে। ইহার শরীরে সূক্ষ্ম অস্থি অনেক। সে গুলিও বেশ শক্ত। বাজের পা দুখানি ৬,৭ ইঞ্চি লম্বা এবং মজবুত। পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ঈষৎ সাদা লোম বা পালকাবৃত। নিম্নের অংশ শুক্‌না কাঠের মত। প্রত্যেক পায় চারিটী আঙ্গুল। প্রত্যেক আঙ্গুলে চারিটী পর্ব্ব। বাজের নখ বিড়ালের নখের মত বা বাঘের নখের মত তীক্ষ্ণ, সুদৃঢ় এবং ঈষৎ বক্র। বাজের ঠোঁটও বাঘের নখেরই মত। ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বাঁকানো তীক্ষ্ণ এবং শক্ত। এই নখ বা ঠোঁট দিয়া বাজ যাহাকে ধরে তাহার জীবন রক্ষা পাওয়ার ভরসা বড় থাকেনা। কবুতর, দয়েল প্রভৃতি পক্ষী ইহাদের শিকার। কবুতর যদিও বাজের চেয়ে বড়, তথাপি ইহারা অনায়াসে এক একটী কবুতরের টুটি ধরিয়া আপন বাসায় লইয়া যায়। হাঁস, মোরগ, বড় ব্যাং প্রভৃতি বাজের প্রিয় শিকার। বাজের সাড়া পাইলেই ইহারা সতর্ক হয়। কিন্তু বাজও এমন দুষ্ট যে সে যখন বসিয়া সে তাহার কর্কশ কণ্ঠে চিড়িং চিড়িং করিয়া ডাকে, সেই স্থান সেই মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিয়া দুই চারিশত গজ ব্যবধানে আপন পছন্দ মত স্থানে লুকাইয়া থাকে। কাজেই অন্য পক্ষী তাহাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না।

বাজ তীরের মত বেগে শিকারের উপরে পতিত হয়। এমন সহসা পড়ে, যে শিকার তৎক্ষণাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়। বাজ প্রধানতঃ ঘাড়েই পতিত হয়। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে তাহার শোচনার আর সীমা থাকে না। সে চিড়িং চিড়িং করিয়া চেঁচাইতে থাকে।

তেঁতুল, গাব, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় গাছের আগডালে বাজ বাসা তৈয়ার করিয়া, তথায় ডিম পাড়ে। ফাল্গুন, চৈত্র মাসই ইহাদের ডিম পাড়িবার সময়। সেই সময় অন্য পক্ষীর পক্ষে সেই গাছে বিশ্রাম করা প্রায়ই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তবে যাহারা বাজের ভক্ষ্য,—তাহারা সিংহ বিবর প্রবিষ্ট শশকের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বাজের ছানা উড়িতে শিখে। বাজ আপন বাচ্চাকে নিরাপদ স্থানে বসাইয়া সেখানে খাদ্য লইয়া যায়। ছোট ব্যাং, পোকা ইত্যাদি তাহার পথ্য। আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে মায়ে পোয়ে স্বাধীন ভাবে শিকারে বাহির হয়। বর্ষার পরে অর্থাৎ পুত্র উপার্জ্জন-ক্ষম হইলে আপন পন্থা আপনিই করিয়া লয়। বাংলার পাখী হইলেও ইহারা বাঙ্গালী মানুষের মত গলগ্রহ থাকিতে ভাল বাসে না।

বাজের ডিম কুলের মত বড়, সাদা এবং দুই প্রান্তে ঈষৎ বাদামী। ইহারা এক সময়ে ২টী হইতে চারিটী ডিম পাড়ে। পক্ষিনী ডিমে তা দেয়, পুং পক্ষী তাহার খাদ্য যোগার করিয়া থাকে। ছানাগুলি প্রথমে হরিদ্রাভ পালকে আবৃত থাকে। কিছুদিন পরেই ক্রমে ধূসরে পরিণত হয়।

বাজ মাছ শিকার ধরে এরূপ কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। কিন্তু যাহারা বাজ পোষণ করে, তাহারা মাছ খাওয়ায়। পোষা বাজ শিকার ধরে কিন্তু প্রতিপালকের

"নকাম্ভ বংশবদ" হয় না। বাজ পালকের হাতমুখ, নাক, এমন কি চক্ষু পর্য্যন্ত সময় সময় খুঁত হয়। ইহাদের মত খাতির নদারত পাখীআর নাই। বাজদ্বারা যাহারা শিকার করে, তাহারা হাঁস প্রভৃতির মাংস ভক্ষণে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে।

পোষা বাজ পলাইয়া গেলে বাড়ীর আশে পাশেই ঘুরিয়া বেড়ায়, ধরা দেয় না। সেই বাড়ীর কবুতর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির দফা, নিকাশ না করিয়া সে ছাড়ে না। তাহাকে তাড়ান বড়শক্ত।

(২) বড় বাজগুলি চিলের চেয়েও বড়। ইহাদিগকে কেহ বলে সাঁচান (ঠিক সাঁচান ইহারা নয়), কেহ বলে বৌল্লা, কেহ বলে চিকয়ালী এবং কেহ বা বলে হাঁড়ি-ভাঙ্গা। ইহারা মোটা সোটা গোল-গাল গড়ন। ঠোট হল্‌দে, চক্ষু বড় এবং পায়েড় রং চাঁড়াল চিলের চেয়ে একটু ফরসা। অর্থাৎ ইহারা লাল আভাযুক্ত ধূসর পালকে আবৃত। প্রত্যেক পাখার শেষ প্রান্ত ঈষৎ কৃষ্ণাভ। লেজ বেঁটে। বুকের রং প্রায় গাছের শুক্‌না পাতারই মত খানিকটা স্থান ঈষৎ সাদা। ইহাদের আওয়াজ চিঁহি চিঁহির মত, ব্যাং গুগ্‌লী প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। কুচিয়া, ঢোড়া-সাপা প্রভৃতি ও ইহারা ভক্ষণ করে। ঝোপের আড়ালে সন্তর্পণে বসবাস করাই ইহাদের প্রকৃতি। গভীর জঙ্গলে বা ঝোপে ইহারা বাসা করে। এই পাখীর বিবরণ আমরা এর চেয়ে বেশী সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

"পঞ্চক"।

কলঙ্ক—(১)

তোমায় যে ভালবাসি, কত ভালবাসি,
এ কথা তোমারে নাহি কহিলে প্রকাশি?
হৃদে যদি থেকে যায় বেদনার ভার,
হে প্রিয়, তবে সে প্রেম কলঙ্ক আমার।

উজ্জ্বল—(২)

তুমি জালিয়াছ যেই পুণ্য প্রেমানল
তাহাতে দহিয়া, নাথ! কর সমুজ্জল
কামনা-পঙ্কিল মম জ্যোতিঃহীন প্রাণ,
স্বর্ণকার করে যথা স্বর্ণেরে অম্লান।

নৈবেদ্য—(৩)

আমার এ হৃদয়ের সর্ব্বপ্রেম রাশি
একটী গোলাপ হয়ে উঠিয়া বিকশি
তোমারি পূজার মন্ত্রে হয়ে পবিত্রিত,
তোমারি চরণে নাথ হউক লুণ্ঠিত।

বিনাশ—(৪)

যে প্রেম জাহ্নবী ধারা ধরা বিপ্লাবিয়া
ও হৃদি হিমাদ্রি হতে এসেছে ছুটিয়া,
সমস্ত কামনা মোর তারি স্রোতঘায়ে
মত্ত মাতঙ্গের মত যাক্ তলাইয়ে।

নির্ব্বান—(৫)

শৈল কক্ষ ভেদ করি শীর্ণ স্রোতধারা
নদীরূপে সিন্ধু বুকে লুঠে আত্মহারা,
তেমতি আমার যত হৃদয়ের গান
তোমাতে লভয়ে যেন সুচির নির্ব্বান।

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেববর্ম্মা।

চণ্ডীর রাধাপ্রেম।

চণ্ডীদাসের রাধা অপূর্ব্ব প্রেমময়ী। তাঁহার রাধা অপার্থিব অনৈসর্গিক অথচ গৃহীর পরম আদরের ধন—গৃহীর অনুকরণীয় চণ্ডীর রাধা যে প্রেমের রাণী, প্রণয়ের সোহাগিনী, তৃপ্তির শান্তিরূপিনী, আকাঙ্ক্ষার কাম্য স্বরূপিনী, প্রাণের প্রণয়িনী, হৃদয়ের নিয়ত বিহারিনী, তাঁহার রাধা সৃষ্টিই সাহিত্য ভাণ্ডারে অপার্থিব ও অমানুষিক রত্নহার। সেই রাধা

"রাধা নামের সাধা বাঁশী
একবার রাধারাধা বলত"

স্বর শুনিয়া কৃষ্ণকে প্রাণদান করিল "পীরিতি" রীতিতে পড়িল—আবার সামান্য একটা বাঁশীর স্বরে কিরূপ প্রেমোন্মাদিনী হইল তাহা দেখুন—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে—"

তারপর দেখুন রাধার কি অবস্থা—

"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমন পাইব সই তারে ॥"

রাধা তখন নিরুপায় হইয়া পাগল পারা বলিল—

"পাসরিতে কারি মনে পাসরা নায় গো
কি করিব কি হ'বে উপায়—"

তখন রাধার অবস্থা "হা কৃষ্ণ জো কৃষ্ণ." রাধার হৃদয় কৃষ্ণময়—কৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত রাধার হৃদয় একাত্ম হইয়াছে কৃষ্ণের প্রাণ রাধার প্রাণ এবং রাধার প্রাণ কৃষ্ণের প্রাণ হইয়া গিয়াছে।

এরূপ অবস্থার পর যখন রাই উন্মাদিনী শ্রীকৃষ্ণের—

"সে থেঁয়া নিঙ্গারি কেবা মুখ বনাইলরে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।"
"বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ পড় সবে"

* * * *

"কোকিল জিনিয়া সুস্বর
ঐ ছল দেখি পীতাম্বর—"

দেখিয়া রাধা ব্যাকুলতা সহকারে বলিলেন—

"সই কিবা সে শ্যামের রূপ নয়ন জুড়ায় চেঞা"

তখন ধর্ম্মপথ সমস্ত জলাঞ্জলী দিয়া ফেলিলেন—

"দুইটী মোহন নয়নের বাণ দেখিতে পরাণে হানে
পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে পরাণ সহিতে টানে

এখন ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই গেল প্রাণও যাইবার সামিল হইল দেখিয়া রাধা বলিতেছিল—

"ছাড়ি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে এখন করিব কি?

এই যে আদর্শ প্রেম ইহার তুলনা বাস্তব জগতে সুদুর্লভ—এ ভালবাসা—এ প্রেম এ প্রণয় আমাদের আধুনিক "লভ" শাস্ত্রে আছে কি? যে লভে পড়িয়া বঙ্গীয় যুবক পতঙ্গ অতৃপ্ত রূপবহ্নিতে ঝলসিয়া পুড়িয়া মরে যে লভে এইরূপ আদর্শ কয়টা বর্ত্তমান। পুঁথিতে লভ আছে—তাহার ব্যাখ্যা আছে—তাহার দৃষ্টান্ত আছে—নভেলে রঙ্গিল কাপড় দেখিয়া চুড়ির শব্দ শুনিয়া, নায়কের লভ হয় কিন্তু এ সংসারে বাস্তবিক কি এইরূপ অসামান্য স্বার্থপূর্ণ প্রাণ বিনিময় হইয়া থাকে। না "রূপের লাগি ভালবাসিনু—অনলে পুড়িয়া গেল" এইরূপ হয়।

এখন রাধার—

"মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায়"

* * * *

তাঁহার

"সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে"

রাধা "বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি"

তাঁহার "ভূষন খসিয়ে পড়ে" তাহার প্রেম কত গভীর। ভক্ত কবি চণ্ডীদাস কি অপূর্ব্ব উপাদানে রাধার আবির্ভাব করিয়া দেয়! তুমি ধন্য আর ধন্য তোমার অপূর্ব্ব লেখনী।

ভক্তকুল চূড়ামণি চণ্ডীদাস এত মধুর মিষ্টান্ন পরিবেশনের পর এইবার একটু অম্ল মধুর চাটনী সংযোগে সাহিত্য ক্ষুধাতুর জনের রসনার স্বাদ বদলাইয়া দিয়াছেন।

রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে এবং বহুদিন শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিতে পাইয়া বিরহে—রাধা

"বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা—
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা—"

কি উৎকট বিরহ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সহিত মেঘের সামঞ্জস্য দেখিয়া - একান্তমনে মেঘের দিকে চাহিয়া—রহিয়াছেন, কি গভীর প্রেমের নিদর্শন!

রাধা আবার—

"বিরতি আহারে—"
"এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনী
দেখয়ে খসায়ে চুলি—"
"না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।"
কি অপূর্ব্ব ত্যাগ—শ্রীকৃষ্ণ বিহনে
আহার নিদ্রা বসন বাসন সর্ব্বত্যাগিনী
সন্ন্যাস রূপিনী প্রেমযোগের যথার্থ

যোগী—ইহাতেও চণ্ডীদাস প্রভু সন্তুষ্ট হন নাই—তিনি রাধাকে "কাঠের পুতুলি রয়েছে চাহ" করিয়াছেন কারণ প্রাণের ধন শ্রীকৃষ্ণ যখন নেই তখন প্রাণ কোথায়। তাই

"তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে"

নিজল নিচয় মূর্ত্তি—যথার্থ কৃষ্ণভক্ত প্রাণা কৃষ্ণবিরহিনী রাধা।

তারপর রাধার কি মর্ম্মস্পর্শী কি হৃদয় বিদারক সখেদউক্তি—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকল গরল ভেল
সই, কি মোর কপালে লেখি—
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল মানিক হারানু হেলে
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম মানিক পাবার আশে—
সাগর শুকাল মানিক লুকাল অভাগীর করম দোষে।
পিয়াস লাগিয়ে জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।"

রাধার বিরহে অভিমান নাই—অভিশাপ নাই—আছে কেবল অগাধ অসীম দুঃখ সাগর— অনন্ত অনুসোচনা মনের আবেগ এবং আদি অন্তহীন বিলাপ। রমণীদের প্রিয় বিরহ কালে প্রায়ই অভিমান এবং সন্দেহ উদয় হইয়া থাকে কিন্তু রাধার মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্র ছাপ পড়ে নাই। তাঁহার বিরহে অভিমান বা অনুযোগের লেশমাত্রও নাই। আছে কেবল কতকগুলি খেদোক্তি এবং স্বীয় অদৃষ্টের কর্ম্মফলের উক্তি এই ফলেই চণ্ডীর রাধা সতীর রাধা রমণী কুলশিরোমণি রাধা।

আবার যখন বিরহের পর—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন নিতান্ত অনুগত আশ্রিতা—পরাধীনার ন্যায় বলিলেন—

"শীতল বলিয়া শরন লইনু ও দুটী কমল পায়"

* * * *

"না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর।"

আবার যেমন প্রেমিকা আর তেমনই তাহার যথাযুক্ত প্রেমিক তখন রাধা ও কৃষ্ণ "দুঁহু কোরে—দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া—" উভয়ের হৃদতন্ত্রী যেন একতারে বাঁধা। একজনের দুঃখে একজন আলোড়িত বিরহের পর যখন উভয়ের দেখা হইল তখন উভয়েই চক্ষুর জলে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল।

যখন জটিলা কুটিলা শাশুড়ী ও শ্বশুড়ের নিন্দার কথা, পল্লীবাসিনীগণের বিদ্রূপের কথা এবং আত্মীয় স্বজনের লাঞ্ছনা কথা শুনাইল তখন রাধা যে উক্তি করিলেন তাহা এত মর্ম্মস্পর্শী এত উদার এত স্বার্থশূন্য যে সামান্য রমণীতে তাহা একেবারে অসম্ভব। চণ্ডীদাস এইখানেই রাধার প্রেমের গভীরত্ব, স্থিরত্ব ও অকৃত্রিমতা বিশদরূপে হৃদয়গ্রাহী ভাষার দর্পণের মতন প্রদর্শনও করিয়াছেন। রাধা বলিতেছেন—

"তোমরা আসরে যে বল সে বল কালিয়া গলায় মালা
সই ছাড়িতে যদি বল তারে
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত কে তারে ছাড়িতে পারে
বলে বলুক মন্দ আছে যত জন
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকন ধন।"

তারপর রাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে হর্ষে, সোদ্বেগে, অসীম উত্তেজনায় বলিয়া ফেলিলেন—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি

* * * *

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর
আঁখির নিমেষে যদি নাহি দেখি তবে যে পরাণে মরি।"
"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ—
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি কুল শীল জাতি মান",

* * * *

পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি মন নাহি আনে আর

আমরাও রাধার সুরে বলি—

"তুমি মোদের পতি তুমি মোদের গতি।"

আর আমি সে ইন্দু চরণখানি ধরে বলি—মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণ হৈও তুমি—"কেননা দেহ মন আদি তাহারে সঁপেছি কুলশীল জাতি মান" তাই "আমি পিরীতি রসেতে ঢেলেছি" ও "তনু মন দিয়াছি তাহার পায়" কারণ "তিনি মোর গতি তিনি মোর মন।" "তাহার চরণে আমার পরাণ দিয়া" আমার প্রবন্ধের যবনিকা পতন করি।

শ্রীমাধুরী মোহন মুখোপাধ্যায়।

"উদ্বোধন"। *

(বধুরবীল সাহিত্য সভার বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

হে ধরনী, হে জননি, তোমার বিশাল বুকে
জাগাইয়া নবীন জীবন,
পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি হের ওই পশিতেছে
সুতরুণ রবির কিরণ,
আলোকের জনয়িতা অমল জ্যোতিঃর ধারে
হের তোমা করে অভিষেক,
প্রভাত শিশির কণা তব প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
করিতেছে অমৃত নিষেক।
এ শুভ মহেন্দ্র যোগে তুমি ওঠ, জেগে ওঠ
হৃদয়ের সর্ব্ব গরিমায়
প্রতি অঙ্গ সঞ্চালন তোমাতে বিকশে যেন
মহীয়সী তব মহিমায়।
তোমার প্রাণের স্পন্দ মহাসাগরের বুকে
রুদ্রগান আনুক ডাকিয়া,
তোমার নিশ্বাস বায়ে ঝটিকার উন্মাদনা
রুদ্রনাটে উঠুক জাগিয়া।
তোমার নয়ন ঘাতে সর্ব্ব অমঙ্গল নাশি
অগ্নিতেজ করুক বর্ষণ।
দশ দিক হতে আজি বিনাশিতে জড়তায়
ধর তব ভীম প্রহরণ,
উঠ, উঠ, জেগে ওঠ তব দৃপ্ত মহিমায়
প্রাণে প্রাণে তাড়িত সঞ্চারি,
ওই ব্যোম কক্ষ হতে গ্রহ উপগ্রহ যত
বিস্ময়ে তা দেখুক নেহারি।
তোমার প্রাণের বেগে মত্ত মাতঙ্গের মত
মৃত্যু আজি যাক্ তলাইয়া
তোমার অমিত তেজে সকল ভুবন জুড়ি
মহাশক্তি উঠুক জাগিয়া,

তব দীপ্ত দীপকের প্রতি ছন্দ অনুসারে
গ্রহে গ্রহে জ্বলুক অনল,
মহাবিশ্ব রচনার প্রত্যেক বন্ধন গ্রন্থি
তারি স্পর্শে হউক অমল।
সময় হয়েছে আজি ওঠ ওঠ জেগে ওঠ,
আজি তব সফল বোধন,
এ শুভ মাহেন্দ্র যোগে সর্ব্ববিধ প্রেরণায়
হয়ে গেছে লক্ষ নিরূপণ।
আজি তুমি সাজ দেবী রুদ্র চামুণ্ডার রূপে
চতুর্ভুজা দেবী দিগম্বরী
মূর্ত্তিমতী সংহারিনী কলুষ নাশিনী মাতা
দক্ষ করে অভয় বিতরি,
তব প্রতি পাদক্ষেপে ব্রহ্মাণ্ড উঠুক কাঁপি,
জড়তা সে মরুক তরাসে
মহাকায় মহাকাল তোমারি চরণ তলে
বিলুণ্ঠিত মোহের আবেশে,
আজি তব পুত্র যত ঘৃণিত স্বার্থের বশে
পরস্পর রক্ত করে পান
তুমি তব রুদ্র রূপে তাহাদেরে দিয়ে যাও
সত্যের ও ন্যায়ের সন্ধান।
তব স্নিগ্ধ স্নেহছবি মনে প্রাণে সকলেরে
সাজায়ে তুলেছে ব্যাভিচারী
তোমার শান্তির গীতা, তাহাদের বর্ম্ম সেতো
ভণ্ডতারে রাখিতে আবরি।
তাহাতে হবেনা মাগো এবার জাগাতে হবে
তব রুদ্র ভৈরব সঙ্গীত,
প্লাবিত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি তব সুকঠোর নীতি
প্রতি প্রাণ করুক স্পন্দিত।
সর্ব্ব পাপ গ্লানি নাশি তোমার সন্তান সবে
করিয়া তুলিতে মহীয়ান
সর্ব্বানী রুদ্রানী রূপে জাগো জাগো হে জননী
অন্নদলে বিতরি—কল্যাণ।

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেববর্ম্মা।

পুরাণো কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইংরেজী সংবাদ পত্রের দেশীয় সংবাদ পত্রের উপর মাষ্টারগিরি করা—তাদের উপর চোখ রাঙ্গানি, উপদেশ দিয়া কর্ত্তব্যপথে টানিয়া রাখা—এ সব বোধ হয় তাঁরা বর্ণগত অধিকার বলিয়া দাবী করেন। আর সত্যবাদিত্ব—এতো তাঁদের একচটিয়া। Truth এটা তাঁরা দেশথেকে আসার সময় জাহাজে সঙ্গে নিয়ে আসেন আর সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট হিষ্টিরিয়া রোগও নিয়ে আসেন যে দেশী কাগজ দেখ্‌লেই তার ভিতর প্রচ্ছন্ন অপ্রচ্ছন্ন Sedition এর গন্ধে মূর্চ্ছা যান। এই সব লইয়া ইণ্ডিয়ান সহযোগীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাগ বিতণ্ডা এ কোম্পানির আমলের প্রথম থেকেই চলে আস্‌ছে। পুরাণ প্রভাকর, সোমপ্রকাশ সংবাদ সাধুরঞ্জন প্রভৃতি সংবাদ পত্র পাঠে ইংলিসম্যান, হরকরা, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি সাদা পরিচালিত কাগজের এ দেশী সংবাদ পত্রের প্রতি কিরূপ মনোভাব তাহা বেশ বুঝা যায়। দেশী কাগজের সংবাদ চুরি ক'রে "অনুবাদকগণ অমুথাদক হইয়া তাহা original news অর্থাৎ তাৎকাটা নূতন কোরা" সংবাদ বলিয়া প্রকাশ করা, আর মাঝে মাঝে "একটা না একটা অভূত ন ভূত ন ভবিষ্যতি আকাশভেদী গল্প" প্রকাশ করা—এ সব তাতে ইংরেজ সম্পাদকগণ সিদ্ধহস্ত।

"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" তখনও "ষ্টেট্‌সম্যান" হন নাই, সুধু আমাদের ফ্রেণ্ড রূপেই শ্রীরামপুর হইতে উদিত হইতেছেন। সিপাই বিদ্রোহের সময় কিছুদিন সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নামে মশেই বদ্ধ ছিল। সে সময় দেশী সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়গণকে যে কিরূপ ভয়ে ভয়ে চলিতে হইয়াছে তাহা ঐ সময়ের পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত। রাজপুরুষদের কাছে যে অভাব অভিযোগ জানাইবেন তাও কত ভয়ে ভয়ে—সদা শঙ্কা—পাছে কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পায়। এত করিয়াও নিস্তার নাই।

সিংহ ও মেষ শাবকের জল ঘোলা করার অপরাধের মত—তুই করিস নাই তোর বাপ করিয়াছে—আজ করিস নাই দশ বছর আগে করিয়াছিস। ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসের ২৮শে তারিখে "ফ্রেণ্ডে"র হঠাৎ চৈতন্য হইল—১৮৪৯ সনের ১৮ই আগষ্ট সংখ্যার প্রভাকরে রাজবিদ্রোহ সূচক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আর ছাড়া নাই। অমনি Sensational head line দ্বারা Friend of India লিখিলেন :—

Native opinions—We have received two papers of very considerable interest connected with this mutiny, both native, but one written by a traitor and something more and the other by a gentleman disposed to uphold British rule. The first and more important is a letter signed "Pooranundo Mitter" and was published in the Prabhakar of the 18th August 1849.—উপস্থিত বিদ্রোহিতাচরণ সংক্রান্ত দুইখানি গুরুতর প্রয়োজনীয় পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ দুইখানি পত্রই নেটীভের লিখিত, তন্মধ্যে একখানি পত্র রাজদ্রোহী অথবা তদপেক্ষা অধিক দোষগ্রস্থ ব্যক্তির লিখিত, অপর পত্রখানি ব্রিটিশ রাজ্য সংরক্ষণাভিলাষি ভদ্রলোকের দ্বারা লিখিত। প্রথমোক্ত গুরুতর বিষয়ের পত্র পূরানন্দ মিত্রের স্বাক্ষরিত ১৮৪৯ সালের ১৮ই আগষ্ট দিবসের প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।—এবং ঐ কল্পিত পত্রের স্থানে স্থানের লেখা অনুবাদ পূর্ব্বক ঐ পত্র যে পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় রাজ বিদ্রোহিলিপি বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তো একেবারে অবাক্! যিনি তাঁর ২৮ বছরের সম্পাদকীয় জীবনের মধ্যে একদিনের জন্যও রাজভক্তির অন্যথা দেখান নাই তার কি এই পুরস্কার! সম্পাদক মহাশয় পুরাণ ফাইল তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলেন। ১৮৪৯ সনের ১৮ই আগষ্ট তারিখের কি কোন তারিখের প্রভাকরেই পূরানন্দ মিত্র স্বাক্ষরিত কোন পত্র প্রকাশিত হয় নাই। গুপ্ত মহাশয় মনের ক্ষোভে এ সম্বন্ধে একটী সুবিস্তৃত মন্তব্য ইংরেজী বাংলা দুই ভাষায়ই প্রকাশ করিলেন—যে ইংরেজ সহযোগী এবং রাজপুরুষগণ নিজেরাই পড়িতে পারিবেন এবং ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহার এই সুদীর্ঘ মন্তব্য উপসংহার করিলেন—হে ভগবান তুমি সাদা পুরুষদিগের শরীর যেমন সাদা করিয়া দিয়াছ সেইরূপ তাদের মনের ভিতরটা যেন সাদা ধপ্ ধপ্ করিয়া দাও।

কবি সম্পাদকের এই প্রার্থনায় ভগবান কর্ণপাত করিয়াছেন কি?

∴ ∴ ∴

আগেকার আমলে ইংরেজী সম্পাদকগণের একেবারে সাত খুন মাপ ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের আমলের এক তারিখের প্রভাকর লিখিতেছেন—ঢাকা নিউস পত্রে সংপ্রতি একটী রাজকীয় বিষয়সূত্রে গবর্ণমেণ্টের প্রতি কিঞ্চিৎ কর্কশ নিরস ভাব ভাষিত হওয়াতে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ পত্র লিখেন যে উক্ত সম্পাদক ইতিপূর্ব্বে একবার ছাপা যন্ত্র সম্বন্ধীয় নূতন নিয়ম অবহেলা করণের অপরাধে লাইসেন্স হইতে বঞ্চিত হইয়াও পুনর্ব্বার তদ্দোষে দোষী হইয়াছেন, অতএব তাঁহার নিকট হইতে লাইসেন্স হরণ পূর্ব্বক উক্ত পত্রের কার্য্য রহিত করা হইলেই ভাল। এই পত্র পাঠে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, ঢাকা নিউসের যে লেখাটির প্রতি আপনি যদ্রূপ দোষ দৃষ্টি করিতেছেন আমারদিগের দৃষ্টিতে তাদৃশ দোষানুভব হইল না। তবে আপনার প্রতি যে এক বিশেষ ক্ষমতা অর্পিত আছে আপনি সেই ক্ষমতানুসারে যাহা স্বেচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। যদি সেই ক্ষমতায় Dacca News এর লাইসেন্স কাড়িয়া লয়েন, তাহাতে আমারদিগের কিছুমাত্রই আপত্তি নাই।

প্রভাকর এ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিতেছেন—

"কি আশ্চর্য্য ! ইংরেজী সম্পাদকদিগের মধ্যে অনেকেই বারম্বার ধাক্কা ধমক ও কানুট খাইয়াও অদ্যাপি স্বভাব সংশোধন পূর্ব্বক সাবধান হইতে পারিলেন না।" স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার India in the Victorian Age এ লিখিয়াছেন যে "during the troubles of the Indian mutiny it was considered necessary to warn one English newpaper (The Friend of India) for articles likely to inflame the minds of the people" কিন্তু গুপ্ত সম্পাদক মহাশয়ের উপরোক্ত মন্তব্য হইতে মনে হয় আরো কতক কতক ইংরেজী সম্পাদক বারম্বার "ধাক্কা ধমক ও কানুট" খাইয়াছেন, তবে লজ্জা হইয়াছে কি না আজ পর্য্যন্তও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

দত্ত সাহেবের লিখিত ইতিহাসের সঙ্গে তৎকালিন প্রকাশিত সমসাময়িক সংবাদের আরো কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। তিনি উপরে উদ্ধৃত অংশের পরই লিখিয়াছেন—"And three Indian newspapers were prosecuted—The publishers of two of them (Durbeen and the Sultan-ul Akhbar) were discharged on their expressing their regret and entering into recognizances. The publisher of the third (সমাচার সুধাবর্ষণ) was found not quilty and acquitted. Some restraints which were then placed in the press were subsequently withdrwn"—প্রভাকর সংবাদ দিতেছেন যে ঐ তিনখানি সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের বিরুদ্ধে ইণ্ডাইটা বিল (indict শব্দ হইতে ইহাকে তখন ইণ্ডাইটা বিল বলা হইত) গ্রাহ্য হয়। সুধাবর্ষণ সম্পাদক নির্দোষী সাব্যস্ত হন এবং অপর দুইজন দোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করায় দুইজনেরই একটাকা করিয়া জরিমানা হয়। কি জাতীয় restraint জারী করা হয় তাহা দত্ত সাহেব খোলাসা লেখেন নাই তবে ১২৬৪ সনের জ্যৈষ্ঠের খবর যে গবর্ণমেণ্ট ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা একবছরের জন্য নিবারণ করনার্থ এক নূতন নিয়ম প্রকাশ করেন এবং তাহার পরের সংবাদ যে এইজন্য রংপুর বার্ত্তাবহ এবং হিন্দু ইনটেলিজেন্সার প্রভৃতি কয়েকখানি পত্রিকা উঠিয়া যায়।

∴ ∴ ∴

লর্ড ড্যালহাউসি যে বিস্তৃত ও ব্রিটিশ ভারতের মানচিত্র কল্পনায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহার সহিতই ভাবি রেলওয়ের চিত্র ও যুগপৎ তাঁহার মানসপটে উদিত হইয়াছিল। তিনিই ভারতবর্ষে রেলওয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দূর দৃষ্টিতে বুঝিয়াছিলেন যে বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের সহিত রেলওয়ের প্রসার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কারণ রেলওয়ের মত ক্রতগামী যান না হইলে এইরূপ বহু বিস্তীর্ণ প্রদেশে মুষ্টিমেয় বিদেশীর পক্ষে ধন প্রাণ রক্ষা করিয়া বাসকরা সম্ভবপর নয়। কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় একপাদ শতাব্দি পর যে লৌহবর্ত্ম জাল দেখিয়া আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন—

পর হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে
বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে

তাহা লর্ড ড্যালহৌসীরই পরিকল্পনা। তিনি ইহার সূত্রপাত মাত্র করিয়া যান। রাণীগঞ্জে তার পূর্ব্ব হইতেই কয়লার খনি আবিষ্কার হইয়াছে। সাহেব সওদাগরগণ কলিকাতার বাজারে কয়লা আনিয়া বিক্রয় করিতেছেন। লর্ড ড্যালহৌসী প্রথমে East Indian Railway Company র সহিত রানীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল লাইন চালাইবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং পরের বছরই ঐ কোম্পানীর সহিত দিল্লী পর্য্যন্ত লাইন চালাইবার চুক্তি স্থির হইল। কিন্তু তিনি আরম্ভ করিয়া গেলেও তাঁহার অবস্থিতিকালে E. I R. এর রেল কলিকাতা হইতে অতি অল্প দূর পর্য্যন্তই চলিয়াছিল। Vincent Smith সাহেবের Oxford History of India তে দেখিতে পাই "The earliest line, a short one from Bombay to Thana was opened in 1853. A year later Calcutta

was connected with Ranigung coalfields" স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁহার India in the Victorian Age পুস্তকে লিখিয়াছেন "East Indian Railway,—In 1854 only 37½ miles of this line were open for traffic and in February 1855 the length opened was 121 miles from Calcutta to Ranigung" (p 175) কিন্তু সিপাই বিদ্রোহের সমসাময়িক সংবাদ পত্রে যেরূপ দেখিতে পাই তাহাতে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার সময় রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল চলে নাই। ১৮৫৭ সনের নবেম্বর মাসের একখানা প্রভাকর ঐ মাসের ৩ই নবেম্বর তারিখের হরকরা পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া সংবাদ দিতেছেন যে আগামী মাসের মধ্যে বর্দ্ধমানের পশ্চিম ১২½ ক্রোশ পর্য্যন্ত রেলরোড খুলিবে। রাণীগঞ্জ কলিকাতা হইতে ১২১ মাইল কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ৫৪ মাইল দূরে।

রাণীগঞ্জ ছিল এ দিকের একটা বড় আড্ডা, এইখানে সব সৈন্য জড় হইয়া "বুলকট্রেনে" পশ্চিম অঞ্চলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইত। মাঝে মাঝে খবর পাই তথায় বহু গোধন সংগ্রহ করা হইতেছে। এক তারিখের সংবাদ রাণীগঞ্জ হইতে প্রতিদিন ১০০ করিয়া সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইতেছে। পরের সংবাদ দৈনিক ৩০০ করিয়া রওনা হইতেছে। বর্দ্ধমান ট্রেজারি হইতে এই টাকা খরচ হইত। বর্দ্ধমান কালেকটরের উপর গবর্ণমেণ্টের এক অর্ডার দেখিলাম যে কাল পর্য্যন্ত রাণীগঞ্জ হইতে বারানসীতে সৈন্য প্রেরনার্থ শকটের প্রয়োজন থাকিবে তাবৎকাল বুলক ট্রেনের কর্ম্মধ্যক্ষদিগকে মাসিক ৫০০০০৲ খরচ লিখিয়া দিবে। ইহার পূর্ব্বে এক তারিখে লাখ টাকা খরচ লিখিয়া দেওয়ার সংবাদ দেখিতে পাই।

এইখান হইতেই প্রধান সেনাপতি Sir Collins Campbell Inland Transit Companyর ডাকের গাড়ীতে কাশীর পথে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হইলেন। বড়লাটও এইখান হইতেই ডাকের গাড়ীতে কাশী হইয়া এলাহাবাদ যান। ১৮৫৮।১৮ই মার্চ্চ তারিখের সংবাদ যে আগামী ২০শে মার্চ্চ এলাহাবাদ হইতে ফতেপুর পর্য্যন্ত রেল চলিবে এবং ঐ দিবস স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল তথায় গমন করিবেন।

রেল তখন আমাদের দেশে নূতন—তখনকার রেলওয়ের হালচাল শুনিলে এখন আমাদের নেহাৎ কেমন কেমন লাগিবে। এক খবর পড়িলাম গ্রীষ্মাতিশয্য ও ধুলাওঠার প্রাদুর্ভাব বশত রবিবার বাষ্পীয় শকট চালান বন্ধ হওয়ায় ১৮৫৮ সনের আগষ্ট মাসের ভারত বর্ষীয় সভায় মাসিক অধিবেশন তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। তখন অত সময়ের কড়াকড়ি ছিল না। কেবল যে গ্রীষ্মের আতিশয্য বশতঃ রেলই বন্ধ থাকিত তাহা নয়। আমোদ প্রমোদ উপলক্ষেও সময়ের নড়চড় হইত। ২৫ শে ডিসেম্বরের বিলাতের ডাক জাহাজ (১৮৫৭) সনের সূর্য্যাস্তের পর ছাড়িবে—যেননা জাহাজের কাপ্তান কমাণ্ডার বড়দিনের আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত না হয়।

সিপাই বিদ্রোহের সময় কোম্পানীকে পশ্চিমে সৈন্য পাঠাইতে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। এক তারিখের সংবাদ পড়িলাম যে ভাগীরথীর জল কমিয়া যাওয়ায় গঙ্গাপথে ষ্টীমারে পশ্চিম অঞ্চলে সৈন্য পাঠান অসুবিধা হওয়ায় সুন্দর বনপথে পদ্মাগঙ্গাদিয়া সৈন্য রওনা করা হইতেছে। বাষ্পীয় পোত ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে নদনদী দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। তখন কাশী হইতে স্থলপথে এলাহাবাদ যাইবারও বিশেষ কোন [illegible] নাই কারণ ১৮৫৮ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রকাশিত হিন্দুস্থান [illegible] ডাক কোম্পানীর এক বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি হইতে বেনারস হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ডাকের গাড়ী পরিচালনা আরম্ভ হইবে।

ইহার প্রায় ২॥ বছর পর ১৮৬০ সনের অক্টোবর মাসের সোমপ্রকাশ সংবাদ দিতেছেন যে রাজমহল পর্য্যন্ত রেলগাড়ী খুলিবার পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এবং কলিকাতা যাতায়াতের পক্ষে এই পথ সকলের চেয়ে সোজা বলিয়া ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ পূর্ণিয়া দারজিলিং আসাম বিভাগের ডাক এই পথে চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

ইংরেজ এ দেশে রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়া ছিলেন যে বিলাত হইতে লোক আনিয়া তাহাদিগকে দেশী ভাষায় শিক্ষিত করিয়া তাদের দ্বারা রাজ্যশাসন করা সহজ সাধ্য নয় এবং তাঁহারা যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ করেন তাহার মূলে কতকটা এই প্রয়োজন—কেরানি সৃজন। শত বর্ষের শাসনের এবং শোষনের ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বিলুপ্ত—শিল্প ধ্বংশ। কোম্পানীর আমল থাকিতেই আমরা চাকর মাত্র সার আত্মবিস্মৃত জড়তা গ্রস্ত হইয়া এই কেরানি জীবনকে যে কত আপনার করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে কতকটা বুঝিতে পারিবেন। সেই আমলের একজন লেখক এই চাকুরি জীবনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

মুটের উপায় আছে মোট বয়ে খায়।
ভদ্রের চাকুরি বিনে কি আছে উপায় ॥
সকলি হয়েছে মার্ষ এবার সংসারে।
কেবল কেরানি সস্তা ফেরে দ্বারে দ্বারে ॥
ঘরামি না পাওয়া যায় ঘর ভেঙ্গে গেল।
মাথা কুটে মরিলে চাকর নাহি মেলে ॥
কিন্তু যদি কোন খানে রূম্ খালি হয়।
হাজার কেরানি হবে তথায় উদয় ॥
ছুশিট কাগজ লিখে ছয় টাকা পায়।
তাতেও মুরুব্বি চাই হায় হায় হায় ॥
দেখে শুনে ক্ষান্ত আছি কি বলিব কয়।
তাই বলি আমাদের নাহিক উপায় ॥

কোম্পানীর আমলে সদর রেভেনিউ বোর্ডের হিন্দু ও মুসলমান "কর্ম্মকারকেরা" প্রতি বৎসর ৮ সরস্বতী পূজার নিমিত্ত সরকার হইতে "ওয়াস্তির" কলমের ছড়ি বার্ষিকী পাইতেন। কিন্তু বোধ হয় ব্যয় সঙ্কোচ বশত ১২৬৪ সনের শ্রীপঞ্চমীর সময় বোর্ডের সেক্রেটারি তৎপ্রদানে বিরত হন। তজ্জন্য সমুদয় বাঙ্গালী আমলা একত্র হইয়া বোর্ডের মেম্বর দ্বয় বরাবরে আবেদন জানান তাহাতে তৎকালীন মেম্বর ডেম্পিয়ার এবং ষ্টেনিফোর্থ সাহেব অর্ডার দিলেন যে "হিন্দু কর্ম্মকারকেরা প্রতি-বৎসর সরকার হইতে কলম পাইয়া আনন্দ পূর্ব্বক সেই কলমে সরস্বতী পূজা করেন এবং সেই কলমে প্রকাণ্ড 'কর্ম্মালয়ে' আনয়ন পূর্ব্বক তদ্বারাই সম্বৎসরের লিপি কার্য্য সমাধা করেন। অতএব অবশ্যই তাহাদিগকে যথারীতি ক্রমে পূর্ব্ববৎ কলম প্রদান করিতে হইবে। এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইবা মাত্র অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় বাজার হইতে কলম কিনিয়া আনা হইল এবং আমলা মহাশয়েরা বার্ষিকী কলম পাইয়া হাসিতে হাসিতে আপনাপন ভবনে আগমন করিলেন।"

আমাদের কেরাণিকুলের কলম জয়যুক্ত হইল এবং এই সংবাদে দেশীয় সংবাদ পত্র আনন্দিত হইয়া বোর্ডের মেম্বর মহাশয়গণকে ধন্যবাদ ও নমস্কার করিতে লাগিলেন। এই বার্ষিক কবে বন্ধ হইল তাহার ঠিকানা পাই নাই।

∴ ∴ ∴

জেমস টেলর সাহেব যখন Topography of Dacca লেখেন সে ১৮৩৮—৩৯ সনের কথা—তখন ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বড় একটা শোনা যাইত না। দুই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বেশ সদ্ভাব ও শান্তিতে বাস করিত। অধিকাংশই এক হুঁকায় তামাক খাইত। মেয়েদের পরণ পরিচ্ছদও প্রায় এক ধরণেরই ছিল। তবে মুসলমান মেয়েরা একটু চাকচিক্য রং চং এর পক্ষপাতি ছিল। আর তাদের ভিতর পরদার কাঠিন্য কিছু প্রবল মাত্রায় ছিল। হিন্দু মেয়েদের ভিতর অতটা ছিল না। রাজধানির চালচলনই সাধারণ লোকের আদর্শ হইয়া উঠে। মফঃস্বল বাসীদের দৃষ্টি metropolis এর দিকে থাকিবেই। তখনকার কলিকাতা—রেল ষ্টীমার আমলের পূর্ব্বের কলিকাতা—কত দূর। তবু ভদ্র সমাজে কলিকাতার চাল চলনই অনুকরণ হইত। টেলর সাহেব লিখিয়াছেন যে এখানে ভদ্র ধনী সম্প্রদায় কলিকাতার লোকদের কথাবার্তা, লেখা, জীবন যাপনের প্রণালী, ভোজের খাওয়া ইত্যাদি সকল বিষয়েই অনুকরণ করিত। তখনকার ঢাকার চলতি ভাষা

ঠিক যে কেমন ছিল তাহার কোন নমুনা পাই না। তবে সাহেব ৮ বৎসর ঢাকা দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হয় এখন যেমন শ্রীহট্ট চট্টগ্রামের সাধারণ চলতি ভাষা পশ্চিমবঙ্গের শুধু পশ্চিমবঙ্গকেন বর্ত্তমান ঢাকার লোকেরও কতকটা দুর্ব্বোধ্য তখনকার ঢাকার ভাষাও পশ্চিমবঙ্গের কতকটা দুর্ব্বোধ্য ছিল।

∴　　∴　　∴

এখন বিলাতি সভ্যতার আক্রমণে আমাদের জাতীয় ক্রীড়া কৌতুক সব লোপ পাইয়া এক ফুটবল ক্রিকেট সার হইয়াছে তখন তা হয় নাই। নৌকা বাইচ সে আমলের একটা প্রধান আমোদ ছিল। ধনী গরীব সকলেই এ আমোদে যোগ দিত। ঢাকা ময়মনসিং পাবনার তো কথাই নাই—এখনও স্থানে স্থানে মফঃস্বলে তার চিহ্ন অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। তখন কলিকাতায়ও নৌকা বাইচের খুব ধুম। সুয়েজখাল খনন হইয়া বিলাতটা আমাদের এত কাছাকাছি আসিবার পূর্ব্বে বড বড় সাহেবরাও এই সব পুরুষত্ব ব্যঞ্জক আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতেন। ১৮৫৮—৫৯ সনের সংবাদ পত্রে দেখিতে পাই তখন বাবুর ঘাট হইতে প্রিন্সেপ ঘাট পর্য্যন্ত Regatta নৌকা বাইচ খেলার কত ধুম। সুপ্রীমকোর্টের চিফ জজ সার জেমস কলভিন, সার আরথার বুলার প্রভৃতি বড় বড় সাহেবরাও ইহাতে যোগদান করিতেন এবং কত উদ্যোগী!

∴　　∴　　∴

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা দুই দলের লোক দেখিতে পাই—একদল মহাজনো যেন গতঃ—ইঁহারা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ সূত্রের নাগ পাশে বাঁধিয়া রাখিতে চান। অপরদল ব্যাকরণের সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খল ভঙ্গ পূর্ব্বক যাহাতে ভাবপ্রকাশের সুবিধা এবং সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হয় সেই ভাবে ভাষার চলন করিতে প্রয়াসী। এই দুই দলের দ্বন্দ্ব বরাবর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বহু রক্ষণশীলের বহু চেষ্টা সত্বেও ভাষার প্রসারণী গতিকে কেহ রোধ করিতে পারে নাই। তাহা যদি হইত তবে আমরা আজ বাংলা ভাষার এমন শ্রী দেখিতে পাইতাম না। আমরা আজ-কাল "আমিত্ব" শব্দ কেমন আপনার ভাবে সাধু ভাষায় বিপ্রযুক্ত দেখিতেছি। কিন্তু ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত যখন এই "আমিত্ব" শব্দ তাঁর গদ্য রচনায় প্রথম ব্যবহার করিয়া ছিলেন—তাঁহার ১২৬৫ সনের নববর্ষের প্রভাকরে—তখন তাঁকে কি তীব্র সমালোচনায় কৈফিয়তই না দিতে হইয়াছিল। 'আমি' শব্দ কথিত ভাষা তাহার সহিত ব্যাকরণের "ত্ব" প্রত্যয় কিরূপে প্রয়োগ হইল? ঈশ্বর গুপ্ত এ সম্বন্ধে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা শুনুন—

আপামর সাধারণ জন গণের যাদৃশ শব্দ প্রয়োগ আশু বোধ হইয়া সুখ-জনক হয়, আমরা প্রায় তাদৃশ শব্দই প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ দোষরূপে দুষ্ট হইলেও তাহা দোষের মধ্যে কদাচ গণিত হইতে পারে না। "অহন্তা" শব্দ প্রয়োগ করিলেই উত্তম হইত, ইহা আমাদের বিলক্ষণ বোধ আছে কিন্তু ঐ শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায় বিবমি ব্যক্তি মাত্রেরি কদাচ বোধ হইতে পারে না, তাহা হইলে লেখার সুরসক খনই হইল না, অতএব "অহন্তা" শব্দ পরিত্যাগ করিয়া আমরা 'অহং' শব্দের অনুযায়ী এতদ্দেশ প্রচলিত যে "আমি" শব্দ তাহার সহিত 'ত্ব' প্রত্যয়ের যোগ করিয়া লিখিয়াছি। ইহাতে অনায়াসে সকলেরি বোধ হইবে। যদি বল "ব্যাকরণে এমত কোন্ সূত্র আছে যে ভাষা শব্দের উত্তর প্রত্যয় হয় উত্তর, একথা সত্য বটে, কিন্তু যেমন অনুকরণ শব্দ ঝম ঝম ঘুর-ঘুর মক মক, ইহারা সংস্কৃত শব্দ কদাচ নহে তথাপি ইহাতে দেখুন—

পশ্চাৎ ঝম ঝমায়তে কণ্ঠো ঘুর ঘুরায়তে ভেকো মক্ মকায়তে ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যাইতেছে সেইরূপ অস্মদো-ধক অনুকরণ একটী 'আমি' শব্দ আছে তাহার উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় করিয়া "আমিত্ব" পদ অবশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, অতএব সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ সূত্রং—

সর্ব্ব সমুকরণে বা অনুকরণে সর্ব্বং বা স্যাৎ—অর্থাৎ, অনুকরণে সকল প্রত্যয় বিকল্পে হয়। বস্তুতস্ত পূর্ব্ব প্রাচীন ইদানীন্তন কিঞ্চিৎ-পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে আমরা ও সেইরূপ লিখি-

রা'ছ। পূর্ব্ব পাণ্ডিতেরাও এই অভিপ্রায়ে ভাষা শব্দের সহিত ব্যাকরণ প্রত্যয়ের যোগ করিয়াছেন, যথা—কাশীদাস কৃত গৌড়ীয় ভাষা মিশ্র সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বিরচিত কোকিলাষ্টক—

> গচ্ছে গোপীনাথে মধুপুর মগো বুক বিদরে
> করক্ষানাং বৃন্দং ম'রমরম ভেদং জনয়তি।
> পুরস্তাৎ বাসন্তী মম বুহিন বাদী দহতি
> সাং কুহুকণ্ঠীনাদঃ কি কর্জো পরম দঃ প্রাণ সখি॥

এই স্থলে "মরমভেদ" শব্দ সংস্কৃত নহে তাহাতে "অন" প্রত্যয় কি প্রকারে হইল—এবং যৎকিঞ্চিৎ প্রাচীন কবি চক্রবর্ত্তীচার্য্য ঐ দৃষ্টান্তে কলিকাতা বর্ণনে লেখেন যথা—

> আয়না লণ্ঠন ভূমি ভূষিত বালা থানাভিরা ভূষিতে।

এই স্থলে বালা থানা শব্দের উত্তর "ভিস" প্রত্যয় কি প্রকারে হইল? অতএব সর্ব্ব সাধারণ গণের সুখবোধের কারণ এরূপ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বাচার্য্যেরা করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে আমরাও করিয়াছি তাহাতে দোষের উদ্ভাবন কদাচ হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

'দূরের আলো'

রাত্রিরের এই মৃদু মন্দ হাওয়া,
পুরাণ কত দিনের স্মৃতি কতই সুরে গাওয়া
আবার আসে মনে,
কত দিনের ভালবাসার কথা
জাগায় মনে সেই পুরাতন ব্যথা
পুরোণ এ প্রাণে।

যারা আগে বন্ধু ছিল,
তারা কেহ নাই আজ
চলে গেছে, তবু সাজ
হয় নাই মোর কাজ
কাল যারা এসেছিল
আজ তারা গেছে চলে
মলিন এ গৃহ আজি
হো'য়ে আছে ঝরা ফুলে।
এ আঁধার গৃহ মাঝে শুধু আমি আছি একা
নাহি ফুল নাহি মালা
নাহি কোন সখি সখা।

শ্রীধরিত্রী দেবী।*

মহাভারত সমালোচনা।

(২)

হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন সংস্কৃত দেব ভাষা। ঐ ভাষার লিখিত গ্রন্থই ধর্ম্মগ্রন্থ। তজ্জন্যই হউক অথবা বহুবিধ ধর্ম্ম তত্ত্ব বর্ণিত থাকায়ই হউক হিন্দুগণ মহাভারতকে পঞ্চম বেদ রূপে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রাদ্ধকালে উপনিষদের পরিবর্ত্তে মহাভারতের কতিপয় শ্লোক পাঠকরা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং তাহাই পাঠকরা প্রচলিত আছে। বেদব্যাস মহাভারতে যাহাকে দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব উপাধি প্রদান করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতি হইলেও তাঁহাকে দেবতা ও ঈশ্বর ভাবে সম্মান ও পূজা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মহাভারতের সময় ব্রাহ্মণ সেবা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেন, মহাভারতের দেব ভাষায় বর্ণনায়

---

*T. moore'এর 'Light of other days' এর ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

বিমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণ গণ সেই ক্ষত্রিয়গণকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ও তর্পণ করিয়া থাকেন, এই সকল বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় পূর্ব্বতনকালে গুণেরই অধিক সমাদর ছিল। তজ্জন্য জাতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া সম্মান করা হইয়াছে। তাহাই ভীষ্ম তর্পনের ব্যবস্থা। *

পুরানাদিতে অখ্যায়িকা বর্ণন উপলক্ষে যে অদ্ভুত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা ভাগবতে দেখিতে পাই। শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন "মহারাজ ! আমি তোমার নিকট পরলোক গত যে সকল মহদ্ব্যক্তির কথা প্রসঙ্গে নানা বিচিত্র কথা বলিলাম তাহা কেবল জ্ঞান ও বৈরাগ্য উৎপাদন নিমিত্তই বলিলাম। জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির উপদেশঅংশ ব্যতীত অন্তর্বিবৃতাংশ যে সমস্তই সত্য তাহামনে করিবেন না। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণেও নানা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বতন কালে এরূপ গ্রন্থ যে কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই ছিল এরূপ নহে। অন্যান্য জাতির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। হোমার কৃত ট্রয়নগরের যুদ্ধ বিবরণ ও রামায়ণের বিবরণে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য রামায়ণের ছায়া অবলম্বনে হোমার গ্রন্থ রচনা হওয়া অনেকে অনুমান করেন। রামায়ণে সীতাদেবী রাবণ কর্তৃক অপহৃতা। সীতা উদ্ধারার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বানর সৈন্য সহ লঙ্কানগরী প্রবেশ ও রাম রাবণের যুদ্ধ। রাবণ সবংশে নিহত। সীতার উদ্ধার। হোমারের হেলেন তাঁহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া প্যারিসের অনুসারিণী হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে যুদ্ধ ও ট্রয় নগর ধ্বংস। উভয় যুদ্ধেই দেব দেবীর আবির্ভাব ও নানা অদ্ভুত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারত তদ্রূপভাবে বিরচিত হইলেও ইহাতে যেরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে এরূপ অন্য কোন জাতির গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহাভারতে কবি কল্পনা প্রসূত নানা অদ্ভুত আখ্যায়িকা বর্ণিত হইলেও এরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে না যে কুরু পাণ্ডবের অস্তিত্ব ছিল না, তৎসমুদায়ই কবি কল্পনা প্রসূত। কতকগুলি ঘটনার জনশ্রুতি স্মরণাতীত কাল হইতে এরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে যে তদ্দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব সপ্রমাণীত হয়। যথা বিরাটের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। কীচকের হাট। অঙ্গ রাজ্যাধিপতি কর্ণের রাজধানী মুঙ্গেরের প্রস্তরময় দুর্গ। রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও কর্ণ চৌড়া নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অযোধ্যায় সূর্য্যবংশের পূর্ব্ব কীর্ত্তি বর্ত্তমান না থাকিলেও রাম নাম অদ্যাপিও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং ঐ সকল ঘটনা কবি কল্পনা বলিয়া কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। মহাভারত সমালোচনা করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে প্রতীতি হয় দ্বাপরের শেষভাগে যখন ঘোর ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত, যখন সনাতন ধর্ম্ম লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, সেই সময় মহাত্মা বেদব্যাস কুরু পাণ্ডবের ইতিহাস সংমিশ্রণে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ জন্য মহাভারত প্রণয়ন করেন। তাঁহার গ্রন্থের সূত্রপাত রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্র উপলক্ষে আরম্ভ হইয়াছে।

অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যু কুরুক্ষেত্র মহাসমরে নিহত হন। তৎপুত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া

* য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েৎ ব্রহ্ম সংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধ কালে বা তদনন্তায় কল্পতে ॥ ১৭ ॥
কঠ উপনিষদ। ৩য় বল্লী। স্ত্রী—
মিত্রারাপি অসবর্ণায় জলং নাদেয়ং নাসবর্ণেভ্যো এবচ।
ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাৎ। ভীষ্মায়ত্তু অসবর্ণায় ভীষ্মাষ্টম্যাং তর্পণং কুর্য্যাৎ। ব্রাহ্মণাদ্যা যে বর্ণাদদ্যুঃ ভীষ্মায় নোজলং। সম্বৎসর কৃতং তেষাং পুণ্যং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ। ইতি
স্মৃতেরাহ্নিকতত্ত্বম্।
ভীষ্মের তর্পণ মন্ত্র।
ভীষ্মঃশান্তনবোবীর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্র পৌত্র চিতাং ক্রিয়াং ॥
কথা ইনাস্তে কথিত মহীয়সাং হিতায় লোকেষু
যশঃ পাদ যুষং
বিজ্ঞান বৈরাগ্য বিবক্ষয়া নিভোঃ, বচোবিভূতি
র্ণ্ব পারমার্থ্যং ॥ ভাগবত ১১ স্কন্দ।

পাণ্ডবগণ মহা প্রস্থান গমন করেন। রাজা পরীক্ষিত একদা বন মধ্যে এক মৃগকে বানবিদ্ধ করায় মৃগ পলায়ন করে। রাজা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান সময় বনমধ্যে মৌনব্রতী তপস্যাপরায়ণ শমীক ঋষির নিকট মৃগের অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করেন। ঋষি প্রবর মৌনব্রতী থাকায় কোন উত্তর না দেওয়ায় রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া ধনুদ্বারা একটী মৃত সর্প ঋষির গলদেশে সমর্পণ করেন। ঋষি পুত্র শৃঙ্গী পিতৃ অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া অভিসম্পাত করেন যে সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক দংশনে রাজার মৃত্যু হইবে। সেই অভিসম্পাত ফলে তক্ষক দংশনে রাজার মৃত্যু হয়। রাজা পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় পিতৃহন্তা সর্পকুল বিনাশ জন্য যে মহাযজ্ঞ করেন তাহাই সর্প যজ্ঞ নামে অভিহিত।

এই সর্প সত্রাবসানে রাজা জনমেজয়ের মহাভারত শ্রবণের বিবরণ মহাভারতের উপক্রমণিকা অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সর্পসত্রে ত্রিলোক বিশ্রুত মহাত্মা মহর্ষি বেদব্যাস সভা মণ্ডপে উপবেশন করিলে রাজা জনমেজয় কুরুপাণ্ডবের যাবতীয় বৃত্তান্ত ও সর্বভূত ভয়ঙ্কর বৃত্তান্ত শ্রবণেচ্ছু হইলে বেদব্যাস তাহার প্রার্থনীয় সমুপবিষ্ট নিজ শিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ করিলেন হে বৎস বৈশম্পায়ন, তুমি আমার নিকট কুরু পাণ্ডবদিগের গৃহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন কর।

মহাভারত। আদিপর্ব্ব ষষ্ঠীতম অঃ।

বেদব্যাসের আদেশ অনুসারে বৈশম্পায়ন মুনি মহাভারতীয় ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। সেই মহাভারতে নানা আখ্যায়িকা সংযোগ হইয়াছে।

সর্প যজ্ঞে আস্তিক মুনিকে বিদায় দেওয়ার সময় তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞে সদস্য থাকার অনুরোধ করা সংস্কৃত মহাভারতে দেখিতে পাই, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই আভাস ভিন্ন রাজা জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কোন বিবরণ মহাভারতে নাই। কাশীরাম দাস কৃত মহাভারতে রাজা জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ ও তাঁহার মহাভারত শ্রবণের কারণ নিম্ন লিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা বলে অবধারণ করিলাম এক।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত॥
এ পাপ নরক হইতে নাহিক নিস্তার।
কহ মুনি ইহাতে কি মতে হব পার॥
জ্ঞাতি বধ করি পূর্ব্ব পিতামহগণ।
অশ্বমেধ করি পাপ হইল মোচন॥
আমিও করিব সেই বাজি মেধ যজ্ঞ।

তৎপর রাজা জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও তাহার বিঘ্ন নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র পূর্ণিমাতে।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ফেলিল অগ্নিতে॥
* * * *
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড॥
ব্রাহ্মণ কুমার এক হাসিয়া উঠিল।
পুনঃ২ তালি মারে হাসে খল খল॥
দেখিয়া হইল রাজা জলন্ত অনল।
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরশান।
দ্বিজ পুত্রে কাটিয়া করিল দুইখান॥
হাহাকার শব্দ হইল যজ্ঞের স্থলায়।
চতুর্দ্দিকে দেবগণ পলাইয়া যায়॥

তৎপর বেদব্যাসের আগমন।

ত্যজিল আমারে ভ্রাতা মন্ত্রী যত জন।
ত্যজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগণ॥
আজ্ঞা কর মুনি রাজ কি করি এখন।
পাপ সিন্ধু হইতে মোর করহ তারণ॥

বেদব্যাসের উক্তি।

মুনি বলে চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার॥
ব্রহ্মবধ আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ ফল পাবে নাহিক সংশয়॥
একলক্ষ শ্লোক মহাভারত কাহিনী।
শুচি হয়ে একমনে শুন নৃপমণি॥

আদিপর্ব্ব। মহাভারত।
কাশীরাম দাস কৃত।

আস্তিক মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় রাজা জনমেজয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পূর্ব পুরুষের ইতিহাস শ্রবণেচ্ছুক হইয়া পূর্ব পুরুষের ইতিহাস শ্রবণ উপলক্ষে মহাভারত শ্রবণ করিয়াছিলেন। কাশীরাম দাস সর্প যজ্ঞের সম্বন্ধে অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ বধের পাপ অপনোদন জন্য রাজা জনমেজয়ের মহাভারত শ্রবণ বিবরণ উপরি উক্তরূপ অতি সামঞ্জস্যভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইবে।

"রাজা জনমেজয়ের যে মহাযজ্ঞে সর্পকুল বিনাশ প্রায় হইয়াছিল বেদব্যাস সেই মহাযজ্ঞের বিবরণ অতি অদ্ভুতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সেই যজ্ঞে দ্বিজগণ উচ্চৈঃস্বরে অথর্ব্ব বেদোক্ত আভিচারিক বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে, চতুর্দিক হইতে নানা জাতীয় সর্প সকল মন্ত্র শক্তিতে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে কিন্তু বহু চেষ্টায়ও নাগরাজ তক্ষক আসিতেছে না। তক্ষক প্রাণ ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছেন শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে অগ্নিসাৎ কর। হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষককে উল্লেখ করিয়া আহুতি প্রদান করিবা মাত্র নাগরাজ ঋত্বিক্‌গণের মন্ত্র প্রভাবে অবশেন্দ্রিয় হইয়া—কম্পিত কলেবরে ক্রমে পাবক শিখার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। এমন সময় ঋষি প্রবর আস্তিক মুনি রাজার নিকট যজ্ঞ নিবৃত্তির বর প্রার্থনা করিলেন। রাজা ঋষিবাক্যে যজ্ঞ নিবৃত্তি করিলেন। ইহাই রাজা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞ।

বেদব্যাসের বর্ণনার সাধারণতঃ ইহাই বুঝা যায় প্রকৃতই সর্পযজ্ঞ হইয়াছিল। মন্ত্রবলে সর্পগণ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বোধগম্য হইবে ইহা সর্পযজ্ঞ নয়। যুদ্ধ যজ্ঞ যে অর্থে ব্যবহার হয় ইহা সেই যজ্ঞ। সর্পগণের রাজা তক্ষশীলায় বাস করিতেন বলিয়াই হউক কি সেই বংশে তক্ষক নামক রাজার নাম হইতেই হউক তক্ষক নাম হইয়াছে। এই তক্ষক আস্তীক মুনির মাতুল। সর্প রাজ বাসুকির জরৎকারু নাম্নী ভগিনীকে জরৎকারু মুনি বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র আস্তীক মুনি। জরৎকারু মুনিও সর্প নহেন এবং সর্পকেও বিবাহ করেন নাই। মহাভারতে পরিদৃষ্ট হইবে শেষ নাগ তাহার মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলে শেষ নাগ বলিল "আমার সহোদরগণ অতি মূঢ়। আমি তাহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে অভিলাষ করি না। × × × তাহারা শত্রুর ন্যায় সর্ব্বদা বিবাদ বিরোধ করে"। আদিপর্ব্ব, ষট্‌ত্রিংশ অঃ।

তক্ষক জাতির সহিত যুদ্ধে রাজা পরীক্ষিত নিহত হন। তাহাই রূপকে সর্প দংশনে নিহত হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাজা জনমেজয়ের পিতৃহন্তা তক্ষক কুল বিনাশ জন্য যুদ্ধে বহুসংখ্যক তক্ষক জাতি বিনাশ প্রায় হইলে আস্তীক মুনি যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্য অনুরোধ করায় যুদ্ধ নিবৃত্তি হয়। রূপক বাদ দিলে এইরূপ ঘটনাই প্রতিভাত হয়। অর্জুন নাগকন্যা উলূপীকে বিবাহ করেন। এই জাতি সর্পের ন্যায় কোপন ও ক্রূর স্বভাব। তজ্জন্য ঐ জাতিকে নাগ ও সর্প বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। পাঠকবর্গ খাণ্ডবদাহের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন খাণ্ডব দাহের সময় নাগরাজ তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাহার পুত্র অশ্বসেনের মস্তক ও নখ দগ্ধ হইয়াছিল। আদিপর্ব্ব সপ্তবিংশত্যধিক।

দ্বিসপ্ততম অধ্যায়।

আমরা রামায়ণেও দেখিতে পাই রাবণ ভোগবতী নগরীতে ভুজগ রাজ বাসুকীকে পরাস্ত করিয়া তক্ষকের প্রিয় পত্নীকে অপহরণ করিয়াছিলেন। রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড, দ্বাত্রিংশ সর্গ।

মহাভারতে নাগজাতির উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা কদ্রু ও বিনতা। কশ্যপের সহিত ঐ কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়। পরস্পর সমান পরাক্রান্ত এইরূপ সহস্র নাগ আমার পুত্র

হউক, বলিয়া কদ্রু বর প্রার্থনা করিলেন। বহুকাল পর কদ্রু অণ্ড সহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন। তৎপর কদ্রু প্রসূত সহস্র অণ্ড হইতে এক একটী পুত্র বহির্গত হইল। নাগ জাতির যে বর্ণনা মহাভারতে দেখিতে পাই তাহাতে নাগগণ তপস্তাপরায়ণ ছিলেন।

আবহু তপসা যুক্তা মহাক্রোধা
মহাবলাঃ।
এতে চান্যেচ বহব স্তত্র নাগাব্যবস্থিতাঃ ॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব। ১২৩ অঃ।

কুরু পাণ্ডবের আদিম ইতিহাস ও জন্ম বৃত্তান্ত।

হিন্দু জগতের গৌরব সূর্য্য কুরুবংশীয় যে সকল ক্ষত্রিয় রাজগণ হস্তিনার সিংহাসনারূঢ় হইয়া ভারতে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন, যাঁহাদের ইতিহাস বর্ণন উপলক্ষে মহাত্মা বেদব্যাস মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন আমি সেই রাজবংশের উৎপত্তির আদিম ইতিহাস ও জীবন বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কুরু পাণ্ডবের যে সকল বিবরণ মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে অনেক অলৌকিক ও অনৈসর্গিক ঘটনা পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন। আধুনিক মানবগণ ঐ সকল ঘটনা সমূহ কিছুই অবগত নহেন। সুতরাং ঐ সকল গুপ্ত বিদ্যা সকলেই উপহাস করিতে পারেন। ঐ সকল অলৌকিক ঘটনা ও গল্প কথা যতই অস্বাভাবিক হউক না কেন অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে বহুকাল অন্তর্হিত অনেক গুপ্ত তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইতে পারে। সকল ঘটনাই যে অপ্রকৃত এরূপ নয়। কতক ২ সত্যও নিহিত রহিয়াছে। মহাভারতের যে সকল অদ্ভুত বর্ণনা দেখিয়া পূর্ব্বে উপহাস করা হইয়াছে বিগত জর্ম্মান মহাযুদ্ধের কতক ২ অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মহাভারতের কতক ২ অদ্ভুত ঘটনা যে সত্য তাহা সকলেই অবগত হইয়াছেন। ঐ যুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ, এরোপ্লেন, ডুবা জাহাজে এক দেশ হইতে অন্যদেশে ভিন্নভিন্ন অবস্থায় যাতায়াত ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়া পুরানাদির বর্ণিত আগ্নেয়াস্ত্র, শূন্যে যুদ্ধ, রাজা দুর্য্যোধনের জলস্তম্ভ নির্ম্মাণ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা যে সত্য তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ ভারতে রাজত্ব করিতেন। বৈবস্বত মনু হইতে সূর্য্যবংশ এবং বুধ হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। বুধ ইক্ষ্বাকুর ভগ্নী ইলার পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণই চন্দ্রবংশ। সেই বংশে যযাতি রাজার পুত্র পুরুর বংশে পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রগণের জন্ম হয়। এই যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্য দুহিতা দেবযানীকে ঋষির আশ্রমে বিবাহ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে অশোকবন সন্নিধানে এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং দানব বৃষপর্ব্ব দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা তথায় দাসী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং রাজা দেবযানির সহিত পরম সুখে যৌবন সুখ চরিতার্থ করিতেছিলেন। কালক্রমে দেবযানির গর্ভে রাজার যদু ও তুর্ব্বসু এই দুই পুত্র জন্মিল। শর্ম্মিষ্ঠা পুত্র উৎপাদন জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলে রাজা সম্মত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন। দেবযানি রাজা কর্তৃক শর্ম্মিষ্ঠায় পুত্র উৎপাদন অবগত হইয়া মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্য সন্নিধানে গমন করিয়া এই ঘটনা বলিলেন। রাজাও দেবযানির অনুসরণ ক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। শুক্রাচার্য্য এই বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন, মহারাজ, তুমি ধার্ম্মিক হইয়া প্রিয় বোধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ অতএব দুর্জ্জয় জরা অচিরাৎ তোমাকে আক্রমণ করিবে।

রাজা যযাতি শুক্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিসপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জরাগ্রস্ত হইয়া শুক্রকে কহিলেন “ভগবন আমি অদ্যাপি যৌবন সুখ অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব প্রসন্ন হইয়া যাহাতে জরা হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন উপায় অবধারণ করিয়া দিন।” শুক্র কহিলেন “মহারাজ আমার শাপ কখনও অন্যথা হইবার নহে। তবে এই মাত্র হইতে পারে, তুমি ইচ্ছা করিয়া অন্যের শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে। হে নহুষ তনয় তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া অন্যের শরীরে জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে। তৎপর রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে ও তৎপর তুর্ব্বসু দ্রুহ্য ও অনুকে কহিলেন আমার জরা গ্রহণ কর। আমি তোমাদের যৌবন গ্রহণ করিয়া ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিব। সহস্র বৎসর পর পাপের সহিত তোমাদের জরা গ্রহণ করিয়া তোমাদের যৌবন তোমাদিগকে প্রদান করিব।” ইহারা সকলেই জরার বহু দোষ উল্লেখ করিয়া ক্রমে জরা গ্রহণ অস্বীকার করিলে রাজা নানারূপ অভিসম্পাত দিয়া কহিলেন তোমাদিগের বংশে কেহই রাজা হইবে না। তৎপর পুরুর নিকট প্রস্তাব করিলে পুরু “যে আজ্ঞা” বলিয়া সম্মত হইলেন। এইরূপে রাজা যযাতি শুক্রকে স্মরণ করিয়া পুরুর যৌবন গ্রহণ করতঃ সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিয়া তৎপর পুরুর জরা পাপের সহিত গ্রহণ করিয়া পুরুকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। এইরূপে যযাতি রাজার অন্যান্য পুত্রগণ রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। পুরুই রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া বংশানুক্রমে রাজত্ব করিতেছেন।

আমরা মহাভারতের বর্ণনায় ঋষির অভিসম্পাতে তৎক্ষণাৎ জরাগ্রস্ত হওয়া ও ঋষির অনুগ্রহে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া ঐ জরা অন্যের শরীরে সঞ্চারিত করিয়া যৌবন লাভের অদ্ভুত বিবরণ দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা সকলেই বিশ্বাস করিতে পারেন যে মহাপুরুষ সাধ্বীনারী কি নীচশ্রেণীর লোকও যদি অত্যাচারে দুঃখিত হইয়া অভিসম্পাত করে তাহাও কোন ২ স্থলে তৎক্ষণাৎ না হইলেও সময়ান্তরে প্রত্যক্ষীভূত হইতে দেখা যায়। পাঠকবর্গ তাহা বিশ্বাস করিবেন কিনা বলিতে পারি না। রাজা যযাতি রোগগ্রস্ত হইয়া বৃদ্ধের ন্যায় শক্তি-হীন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ রোগ অন্যের শরীরে সঞ্চারিত করিয়া রাজা আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ রোগ অন্যের শরীরে সঞ্চারিত করা বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাই রূপকে ঐরূপ বর্ণিত হইতে পারে।

ঐ বংশে কুরু নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার নাম হইতে কুরু বংশ এবং হস্তিনার সিংহাসনারূঢ়ই কুরুরাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে বেদব্যাস মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও কুরু রাজ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (১)

এই বংশে শান্তনু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর একদিন গঙ্গাতীরে মৃগয়া করিতে গিয়া এক রূপলাবণ্য সম্পন্না রমণীকে তরঙ্গিনী তীরে নিরীক্ষণ করিয়া রাজা তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, তিনি বলেন, যে আপনি আমার কোন কার্য্যে বাধা দিবেন না এবং যদি কখনও বাধা দেন, তবে সেই দিনই আমি চলিয়া যাইব, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারি। রাজা তাহাতে সম্মত হইলে, উভয়ে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজমহিষী ক্রমে ২

---

(১) তথৈব কৌরব্যো রাজা ধর্ম্মপুত্রো মহামনাঃ।
কৃপ প্রভৃতযশ্চৈব কিম কুর্ব্বন্ত তেঽব্রবং ॥
স্ত্রীপর্ব্ব, মহাভারত।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কুরু রাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
শুশ্রাব বৃষ্ণি চক্রস্য মৌসলে কদং কৃতং ॥
মৌসল পর্ব্ব।

এষ পুত্রস্তু তে পুত্রঃ কুরু রাজো ভবিষ্যতি।
কুরুণাং পরিশেষস্তু বন্মো রাজা কৃতসহ ॥
মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব।
মহাভারত।

আটটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। পুত্রগণ ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র রাজমহিষী তাহাদিগকে স্রোতজলে নিক্ষেপ করিতেন। রাজাও তদর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়াও মহিষী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান ভয়ে ভীত হইয়া নিবারণ করিতে পারেন নাই। অনন্তর অষ্টম ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা পত্নীকে কহিলেন পুত্র বিনষ্ট করিও না। তখন সেই স্ত্রী কহিলেন "আমি তোমার পুত্র বিনষ্ট করিব না; এইক্ষণে পূর্ব্ব কৃত নিয়ম স্মরণ কর। আমি অদ্যাবধি তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিলাম। আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা। অনন্তর গঙ্গাদেবী পুত্রকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাহার গর্ভজাত এই পুত্রের নাম গাঙ্গেয়, দেবব্রত ও ভীষ্ম। (২)

গঙ্গাদেবীর তিরোভাবের পর শান্তনু দাসরাজ কন্যা সত্যবতীর পাণি গ্রহণ করেন। এই সত্যবতীর অনূঢ়াবস্থায় তাঁহার গর্ভে পরাশর মুনির ঔরসে মহাভারত প্রণেতা বেদব্যাস ঋষির জন্ম হয়। মহাভারতে সত্যবতীর মৎস্যের গর্ভে জন্ম হওয়ার অদ্ভুত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ঐ কন্যা দাস রাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা। শান্তনু মহারাজ সত্যবতীর রূপে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করিলে দাসরাজ তাহাকে এই সত্যে আবদ্ধ হইতে বলেন যে ঐ কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে। রাজার বিবাহ ইচ্ছা প্রবল থাকিলেও তিনি দাস রাজের প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া অত্যন্ত বিমনায়মান হইলেন। রাজাকে উদ্বিগ্নাবস্থায় দেখিয়া ভীষ্ম বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। রাজার বিবাহ সম্পন্ন হইল। এই অসাধারণ কার্য্যে শান্তনু মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যু বর প্রদান করিলেন (১) ইহাতে সাধারণ সকলে ইহাই বুঝিয়া থাকেন যে ইচ্ছা করিলেই মৃত্যু হইবে, কিন্তু এস্থলে "স্বচ্ছন্দ মরণ" রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ শান্তনু রাজা ইচ্ছা মৃত্যুর কৌশল (যোগ) ভীষ্মকে শিক্ষা প্রদান করেন। ইহাকে যোগশাস্ত্রে "কাল বঞ্চনা" বলে। মহাউপনিষদুক্ত যোগ অবলম্বন করিয়াই ভীষ্মের দেহত্যাগ হইয়াছিল (২)

এইক্ষণে আমরা কুরু পাণ্ডবের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। এই সত্যবতীর গর্ভে শান্তনু মহারাজার ঔরসে বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। চিত্রাঙ্গদ অপুত্রক অবস্থায় অল্প বয়সে যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ দুহিতা অম্বা ও অম্বিকার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ উপলক্ষে ভীষ্মের অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ হয়। অলোকসামান্যরূপসম্পন্না কাশীরাজ দুহিতা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বয়ম্বর হইবেন সংবাদ পাইয়া মহাবীর ভীষ্ম একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া

---

(২) সঞ্জরী মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে শান্তনুর পিতা রাজসভায় বসিয়া আছেন এমন সময় একখানি মাত্র কাপড় পরিয়া গঙ্গাদেবী তথা উপস্থিত হইলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন আমার নাম অযোধ্যা, আমি শান্তনুকে মনে ২ বরণ করিয়াছি। রাজার আদেশে যুবরাজ শান্তনু তাহাকে বিবাহ করিলেন।

(১) প্রস্তাদুষ্করং কর্ম্ম কৃত্বাভীষ্মেন শান্তনু।
স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টৌদদৌতথৈ মহাত্মনো। আদিপর্ব্ব শততম অঃ

(২) মহোপনিষদকৈব যোগ মাস্থায় বীর্য্যবান।
জপন্ শান্তনরোধীমান্ কালাকাঙ্ক্ষিতোভবন্। ভীষ্মপর্ব্ব।

বিদেশী-গ্রন্থ। *

সম্প্রতি কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ ভারতবর্ষের বাণী চীনদেশে শুনাইয়া আসিয়াছেন। পূর্বে চীনের সহিত ভারতের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা এক শ্রেণীর চৈনিক সাহিত্য নিদর্শন হইতেও বেশ বুঝা যায়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত অনেক গুলি ভারতীয় নীতিমূলক গল্প চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। চীনভাষায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত স্বর্গীয় আচার্য্য সাবানে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া "পাঁচশত কাহিনী ও নীতিকথা" (Cinq cents contes et apologues) এই নামে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত করেন। তাঁহার বিদুষী পত্নী শ্রীমতী এ, ই, সাবান (Madame A. E. Chavannes) তাহার মধ্যে অষ্টাদশ সংখ্যক গল্প "চীনের গল্প" (Contes Chinoise) নামে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকাদের পাঠের সুবিধার জন্য সরল গদ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ফরাসী ভাষার সহিত যাঁহাদের সামান্য মাত্র পরিচয় আছে তাঁহারাও এই মনোজ্ঞ ভাষায় রচিত পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। আটটি গল্প সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের গল্পের ন্যায় জীব জন্তু লইয়া। একটি গল্প মহাভারতের শিবি উপাখ্যানেরই বৌদ্ধ সংস্করণ, রাজা শিবির স্থান বুদ্ধদেব অধিকার করিয়াছেন। পণ্ডিতদিগের মতে মহাভারত গ্রন্থের রচনা খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে আরব্ধ হয়। এই মত মানিয়া লইলে বৌদ্ধগণ গল্পটী মহাভারত হইতেই গ্রহণ করিয়া ছিলেন এইরূপ ধারণা জন্মে। শেষ গল্পটি রবীন্দ্র নাথের কথা ও কাহিনীর "শ্রেষ্ঠ দান" নামক কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এ ক্ষেত্রে এক দরিদ্রা নারী তাহার ভিক্ষালব্ধ যাহা কিছু আহার্য্য সামগ্রী তাহা সমস্তই ভগবান বুদ্ধদেবকে নিবেদন করিয়াছিল। বুদ্ধদেব তখন কোনও রাজার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন। দ্বারপাল রমণীকে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই কিন্তু দৈবী শক্তিতে ভিখারিণীর সেই ভিক্ষালব্ধ খাদ্য তাঁহার খাদ্য পাত্রে আনীত হইলে তিনি রাজভোগ অপেক্ষা উহা যে কিরূপ শ্রেষ্ঠতর তাহা সেই রাজাকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া ছিলেন।

শুনা কথা যে সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হওয়া উচিত নয় অতি প্রাচীন কালেও ভারতীয়গণ তাহা বুঝিতেন। ব্যবহার শাস্ত্রের এই সুপরিচিত নীতিটি আর একটি গল্পে সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। নদীর তীরে একটি "পিন্-লো" (বিল্ব) বৃক্ষ অবস্থিত ছিল, একটি শশক তথায় বিচরণ করিতেছিল। হঠাৎ একটি বিল্বফল নদী জলে নিপতিত হওয়ায় শশক ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করে। তাহার শব্দ শুনিয়াই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল নদী তীরে কোনও ভীষণ জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। শশকের পলাইতে দেখিয়া ও তাহার কথা শ্রবণ করিয়া সেই বনের অপর সকল জীবও পলায়মান হয়, অবশেষে পশু রাজের সম্মুখীন হইলে, তিনি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে একজন আর একজনের শুনা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই আতঙ্কে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অবশেষে সিংহ যখন নদীতীরে উপস্থিত হইয়া বিল্বপতন শব্দ শ্রবণ করিলেন তখনই সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। এই শ্রেণীর আর একটি গল্পেও আধুনিক মানব সমাজের উপযোগী একটি সুন্দর উপদেশ দেখিতে পাই। কোনও সুবৃহৎ নির্জ্জন অরণ্যে শাখা মৃগের দল লাফালাফি করিয়া খেলা করিতেছিল। সংখ্যায় তাহারা পাঁচশতের কম নহে। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইলে তাহারা সারি বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিল এবং চলিতে চলিতে অবশেষে একটি কূপের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে হঠাৎ একজন কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া কূপের ভিতর দৃষ্টিপাত করায় দেখিতে পাইল কূপোদকে চন্দ্রমা প্রতিবিম্বিত রহিয়াছেন। মূর্খ বানরের দল পরস্পর বলাবলি করিতে আরম্ভ করিল "জলমগ্ন চন্দ্রকে যদি উদ্ধার না করা হয়

---

* Fables Chinoises du IIIe au VIIIe Siecle de notre ère par Madame Edouard Chavannes (Editions Bossard).

তাহা হইলে রাত্রি চিরকালই অন্ধকার থাকিয়া যাইবে। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না। যদি চাঁদের আলো না থাকে তাহা হইলে জগৎবাসীর নিকট সন্ধ্যা নিরানন্দ ও অবসাদপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে।" তাহার পর উহাদিগের দলপতির পরামর্শ ক্রমে একজন বৃক্ষশাখা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিল এবং অপর সকলে পরস্পরের লাঙ্গুল অবলম্বনে একটি জীবিত রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি বানরী যখন প্রতিবিম্বটি ধরিবার জন্ত হাত বাড়াইয়াছে সেই সময় সশব্দে বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইয়া গেল এবং হতভাগ্য বানরের দল জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দার্শনিকোচিত বিজ্ঞতার সহিত কহিলেন" মূর্খগণ অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়াও কি আপনাদিগকে অন্ধকার হইতে রক্ষা করিতে পারে? ইহারা এরূপ নির্ব্বোধ যে একবার বুঝিয়া দেখে না যে জগতের অন্ধকার দূর করিবার পূর্ব্বে তাহাদের মনের অন্ধকার দূর করা কর্ত্তব্য।" যাহারা প্রাচীন ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান গরিমা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন চীনদেশীয় চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি অনুসারে কুমারী কার্পেলিস্ কৃত (Mdile Karpelis) কতকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট থাকায় আখ্যান ভাগ অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ধর্ম্মসার সংগ্রহ। সিদ্ধ মহাপুরুষ (বারদীর) শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার জীবনী সহ তদীয় উপদেশাবলী। শ্রীযামিনী কুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। চতুর্থ সংস্করণ।

পূর্ববঙ্গে বোধ হয় এরূপ লোক কমই আছে যাহারা বারদীর ব্রহ্মচারীর নাম শোনে নাই। তিনি এ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট সুপরিচিত। তিনি একজন অলৌকিক ক্ষমতাশালী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। অনেক শিক্ষিত ও গণ্য মান্য লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কত লোকের রোগ শান্তি করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ মহাপুরুষের চরিত কথা ও উপদেশাবলীর বিবরণ সবিশেষ জানিবার জন্য সকলেরই আকাঙ্ক্ষা জন্মে। যামিনী বাবুর গ্রন্থখানা সর্ব্বসাধারণের সেই আকাঙ্ক্ষা কতক পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচারীর কয়েকটী উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহাপুরুষদের একটী লক্ষণ এই যে তাঁহারা অতি দুর্জ্ঞেয় ও জটিল তত্ত্ব অতি সহজ কথায় ব্যক্ত করেন। এই পুস্তকে যে প্রথম উপদেশটী বিবৃত হইয়াছে তাহা এই "যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর, দেখিও যেন তাপ না লাগে" গীতাতে আছে, কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। কি কর্ম্ম করা উচিত এবং কি করা অনুচিত এ বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণও মোহিত হন,—তাঁহাদেরও ভ্রম হয়। এখানে ব্রহ্মচারী কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণের একটী সুন্দর ও সরল সূত্র দিয়াছেন। এই সূত্রটী মনে রাখিলে কর্ত্তব্যাবধারণে বেগ পাইতে হয় না। কথাটা সরল বটে; কিন্তু গভীর অর্থ সমন্বিত। নানা দিক দিয়া ইহার আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণ তাপ বিনা কোন কার্য্যই হয় না, কিঞ্চিৎ পরিমাণ তাপ ছাড়া ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না কারণ, অজ্ঞানতাই তাপের মূল কারণ। ঈশ্বর অবিদ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেন না।" এখানে দর্শন শাস্ত্রের গভীর ও জটিল তত্ত্ব সরল ও সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। এই রূপ আরও কয়েকটী মূল্যবান উপদেশ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ব্রহ্মচারীর জীবনী বিবৃত হইয়াছে। উহা নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। অলৌকিক ক্রিয়ার প্রতি এ যুগের লোকের বিশ্বাস কমিয়া গিয়াছে। তাহা হউক, তথাপি এরূপ মহাপুরুষের চরিত কথা জানিবার জন্ত

সকলেরই কৌতুহল হয়। জামিনী বাবুর গ্রন্থে সেই কৌতুহল চরিতার্থ হইবে।

বাঙ্গালীর বল বা বাঙ্গালীর সামরিক ইতিহাস। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ প্রণীত। বাঙ্গালীর ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা যেন এক প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান চতুর ও কার্য্যদক্ষ। অনেক বিষয়ে বাঙ্গালীরা ইউরোপীয়দিগ হইতেও পারদর্শীর। বাঙ্গালীর কার্য্যদক্ষতা বুদ্ধি ও প্রতিভা যে বিদেশীয়দের হিংসার উদ্রেক করিবে তাহা বিচিত্র নয়। বিদেশীয়েরা সেই হিংসা বলেই বাঙ্গালী চরিত্রের অযথা গ্লানি করিয়াছে এবং তাহাতে ভীরুতার আরোপ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বাঙ্গালীরাও উহা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করে না। এখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেই প্রমাণ করা যায় যে বাঙ্গালী অপেক্ষা ভীরু জাতি আর নাই। সমগ্র ইংরেজী সাহিত্য পাঠ কর, তুমি তন্ন২ অনুসন্ধান করিয়াও তাহা হইতে এমন দৃষ্টান্ত দিতে পারিবে না যে ইংরেজ লেখক ইংরেজ জাতিকে ভীরু অথবা কাপুরুষ বলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠা হইতে বাঙ্গালী লেখক কর্তৃক বাঙ্গালী নিন্দার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অনেক বিকৃত মস্তিষ্ক লোক মনে করে যে এইরূপ আত্মনিন্দা জাতীয় উন্নতির নিদান। যদি তাহাই হইত তবে সকল জাতিই এরূপ আত্মনিন্দা পরায়ণ হইত। কিন্তু আর কোন জাতিকে সেরূপ দেখিতে পাই না কেন? বাস্তবিক এইরূপ আত্মনিন্দা আত্ম সম্মান বোধের পরিপন্থী সুতরাং জাতীয় অবনতির মূলীভূত কারণ। আবার অনেক পরম বিবেকবান ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে যাহা সত্য তাহা গোপন করা সঙ্গত নহে। এই সমস্ত লোকদিগের সহিত আমাদের ঝগড়া এই যে, স্বদেশের গ্লানি করিবার সময়ই ইহাদের বিবেক বুদ্ধি বিশেষ জাগরিত হইয়া উঠে। অন্ত সময়ে তাহাদের বিবেক বুদ্ধির বড় টের পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইহাদের জবাব দিয়াছেন বর্ত্তমান গ্রন্থকার। বাঙ্গালীর এই ভীরুতাপবাদ যে অসত্য, ভিত্তিহীন ও কল্পিত, ঐতিহাসিক গবেষণা যে ইহার সমর্থন করে না, রাজেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থে তাহা বিশদ রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। যাহারা বাঙ্গালীর চরিত্র ও জাতীয় উন্নতি সম্পর্কে কিছু মাত্র সহানুভূতি সম্পন্ন নহেন তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে গবেষণা করিয়া বাঙ্গালীর যে ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়াই রাজেন্দ্র বাবু বাঙ্গালীর ভীরুতাবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেরই এই গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা উচিত। গ্রন্থের ভাষাও তেজস্বী ও সরল। নীরস ঐতিহাসিক তথ্য সুললিত ভাষায় বিবৃত করিয়া তিনি সাহিত্য রসিকদিগেরও ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

চন্দ্রলোকে যাত্রা। শ্রীরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য বি,এ প্রণীত। শ্রীব্রজেন্দ্র মোহন দত্ত কর্তৃক ৫৭।১ কলেজষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। জুলে ভার্ণের উপন্যাসাবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত জুলে ভার্ণের গ্রন্থগুলি বোধ হয় পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায়ই অনূদিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু একে২ সেগুলি বাঙ্গলা ভাষায়ও অনূদিত করিতেছেন। এতদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যেরও যে পরিপুষ্টি হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ভাষাও অতিশয় মনোরম ও বিষয়োপযোগী হইয়াছে। পঙ্কিল ও জঘন্য উপন্যাস আজকাল বঙ্গসাহিত্যকে প্লাবিত করিতেছে। বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকা সে সমস্ত উপখ্যান বর্জ্জন করিয়া এই জাতীয় উপন্যাস পাঠ করিবেন কি না জানি না। যদি করেন, তবে যে নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই

সরল গঠনতত্ত্ব। শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল বি, ই, প্রণীত। দি বুক কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। বাঙ্গালা ভাষায় Theory of structure সম্বন্ধে কোন পুস্তক ছিল না। গ্রন্থকার সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এরূপ গ্রন্থ লেখা যে বিশেষ আয়াস-সাধ্য তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইহার কারণ এই যে বাঙ্গালার উপযুক্ত পরিভাষা (technical terms) নাই। গ্রন্থকারকে প্রথমতঃ পরিভাষা প্রণয়ন করিয়া লইতে হয়। ইহা অতি

কঠিন ব্যাপার। কারণ বাঙ্গালা অভিধান হইতে এ বিষয়ে কিছুই সাহায্য পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার যে সমস্ত পরিভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিয়া ভালই করিয়াছেন। ইহাতে অভিধান লেখকদিগের সহায়তা হইবে। এবং অভিধানে স্থান লাভ করিলেই পরিভাষা গুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইবে। আমরা এখানে পরিভাষার ২।১টী নমুনা দিতেছি। অনুপ্রস্থচ্ছেদ (cross section) উৎক্রম ভাবে (Inversely) কাটান (offset) বিশ্রাম কোন (Angle of Repose) ছিন্নাগ্র (frustirum) নিত্যগুণক (Modulus) নিরপেক্ষ অক্ষরেখা (Neutical axis) ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই পরিভাষা গুলি ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়ের শিক্ষাদানের প্রথা এদেশে প্রচলিত হইলে এই জাতীয় গ্রন্থ যথোচিত সমাদর লাভ করিবে।

অপ্রত্যাশিত।

বুকের ভাঙ্গা সারিন্দাতে
কে দিল আজ সুর হে
তৃষিত এ প্রাণ যে আমার
সুধায় পরিপুর হে।
ভিখের চাউল মাপছি যবে
কে মিলালে মোর মাথবে
ঝুলিতে নীলকান্ত মনি
সকল ব্যথা দূর হে।

২

নিদাঘেতে পুড়ছি বালী
কোথায় পাব জল গো
এমন সময় রসের ভাসান
নদীর কলকল গো।
তাপে এ দীন মরছে জলে
বুক জুড়ানো জলদ এলে
শীতল বুকে জড়িয়ে নিলে
মোর প্রিয় মধুর হে।

৩

কলসী কাণা যখন মেরে
কাঁপাই থর থর রে,
নিতাই যে মোরে করবে কোলে
স্বপন অগোচর এ।
এলে আশার অতীত এলে
পতিত পাবন পতিত বলে
গড়লে মোরে নূতন করে,
করলে ভেঙ্গে চুর হে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক কথা।

মুদ্রা।

প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাম পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে তিনি বিখ্যাত "মৌর্যবংশীয়" ভূপতিগণের আদিম রাজা এবং উক্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামধেয় পুস্তক গুলিতে এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিবরণ প্রায় একই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একখানিতে লিখিত হইয়াছে, (১)

---

(১) Matriculation History of India, in Bengali. (In Strict accordance with the University Syblabus) by Nrisinha Chandra Mukhopadhyaya, M. A. B. L &c. Third Edition পৃষ্ঠা ৪১।

"চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম মুরা। মুরা অতি নীচবংশীয়া ছিলেন। 'মুরা' এই নাম হইতে মৌর্য্যবংশের নাম হইয়াছে।"

এই প্রকার পরিচয় প্রায় সমুদায় পাঠ্যপুস্তকেই প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের পাঠ্যপুস্তকে কেন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি যে বৃহদাকারের "প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামক পুস্তকের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও মুরা হইতে "মৌর্য" বংশের নামের উৎপত্তির বিষয়ও প্রায় একই প্রকারে লিখিত হইয়াছে। তবে এই পুস্তকের লেখক মহাশয় স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে এই নাম-পরিচয় ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের দ্বারাই উদ্ভাবিত হইয়াছে (২)।

কোনও বিশেষ রাজা অথবা রাজপুত্রের মাতার নাম হইতে তাঁহাদের বংশনামের উৎপত্তির হওয়ার কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণাপথের অন্ধ্র অথবা সাতবাহন রাজবংশে মাতার নামে কোনও কোন রাজার পরিচয়ের কথা (৩) পাওয়া যায় বটে, কিন্তু নারীর নাম হইতে কোন প্রসিদ্ধ রাজকুলের নামকরণের আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এপর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই (৩)। মৌর্যবংশের নামকরণও যে মুরানাম্নী কোনও নারীর নাম হইতে হইয়াছিল অথবা চন্দ্রগুপ্ত মহারাজের মাতার নাম যে প্রকৃতই মুরা ছিল তাহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। অথবা, স্পষ্টকথা বলিলে বলিতে হয় যে, আমরা এ সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে মুরার নাম ও বিবরণ সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং "মৌর্যবংশের" নাম নিরুক্তি ও কল্পনার উপর স্থাপিত বলিয়া বোধ হইয়াছে। মুরার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অথবা প্রবাদ মূলক যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্ত্তমান প্রস্তাবে প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য। আশাকরি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবর্গ আমাদের এই আলোচনার সহায় হইবেন।

গত শতাব্দে সুবিখ্যাত (স্বর্গগত) ডাক্তার এইচ, এইচ, উইলসন মহোদয় তাঁহার প্রসিদ্ধ "হিন্দু থিয়েটার" নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "মুদ্রারাক্ষস" নাটকের অনুবাদের ভূমিকায় দক্ষিণাপথে প্রচলিত এক উপাখ্যান বিশেষের উল্লেখ করত এই "মৌর্য" শব্দের উক্তরূপ নিরুক্তির (অর্থাৎ মুরার পুত্র অতএব মৌর্য) পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ডাক্তার উইলসনের এইরূপ উক্তির পর য়ুরোপে এবং ভারতে মৌর্য" শব্দের এই অর্থ অথবা নিরুক্তি সসম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ অনুবাদ এবং অনুলিপির ফলে এই তথ্য সর্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে বিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক রচয়িতৃগণ এসম্বন্ধে কোনরূপ দ্বিধা অথবা সন্দেহের স্থান না রাখিয়া একেবারে নিঃসংশয়িত ঐতিহাসিক তথ্যস্বরূপে উক্ত পরিচয় দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। অধিক কি, (পরলোকগত) পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এ সম্বন্ধে যে আদৌ কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করেন নাই, তাহাও আমরা এইমাত্র দেখিয়াছি।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম যে প্রকৃত পক্ষে "মুরা" ছিল, এবং তিনি "মুরার" পুত্র বলিয়া দেশবাসীর নিকট "মৌর্য্য" বলিয়া পরিচিত হইয়া ছিলেন এবং সেই হেতু তাঁহার প্রবর্ত্তিত রাজবংশ "মৌর্যবংশ" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই

(২) "Chandragupta (C. 321—297 B. C.) the low born son of Mura and the founder of the Mourya empire". The Cambridge History of India, Vol I (1922) ch. IX. p 223, and "Chandragupta is represented as a low born connection of the family of Nanda. His surname Mourya is explained by the Indian authorities as meaning 'Son of Mura' who is described as a concubine of the King." Ibid, ch XVIII. p 470.

(৩) ওড়িশার রাজবংশের মধ্যে "গঙ্গবংশ" অথবা "গঙ্গাবংশের" আদিপুরুষ চোড়গঙ্গ (চুড়ঙ্গ) দেব শ্রীশ্রী৺গঙ্গাদেবীর পুত্র ছিলেন বলিয়া গল্প আছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে দক্ষিণাপথের সুপ্রসিদ্ধ চোল (চোড় =) বংশসম্ভূত ছিলেন তাহাতে কোন সংশয় নাই।

সকল উক্তির অনুকূলে ঐতিহাসিক (অথবা এমন কি পৌরাণিকও) প্রমাণ নাই। এরূপ কথা আমরা কেন বলিতেছি, তাহাই এক্ষণে পাঠক সমাজে নিবেদন করিতেছি।

"মৌর্যবংশের" ঐতিহ্য সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত পৌরাণিক এবং লৌকিক কতক গুলি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ এবং শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে "মৌর্যবংশের" উল্লেখ এবং বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। এই পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে শিশুনাগ-বংশোদ্ভব মহাপদ্মনন্দ এবং তাঁহার পুত্রগণের পর চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক এবং তাঁহার পর তাঁহার বংশের কয়েক জন রাজার নাম, তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যকাল এবং এই বংশের মোট রাজ্যকালের বিষয় লিখিত হইয়াছে (৪)। এই সকল পুরাণের কোনও এক খানিতেও চন্দ্রগুপ্তের মাতৃ-নাম প্রদত্ত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার গল্প-ভাণ্ডার "কথা সরিৎ-সাগরে"ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মাতার নাম নাই (৫)। কবি বিশাখ দেব প্রণীত বিখ্যাত "মুদ্রারাক্ষস" নাটকখানি চাণক্য কর্তৃক নন্দবংশ-ধ্বংস ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য প্রাপ্তি অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে এবং এই নাটকে "মৌর্য" এই শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইলেও চন্দ্রগুপ্ত দেবের মাতার নাম যে "মুরা" তাহা কোথাও লিখিত হয় নাই,—অথবা "মুরার পুত্র" বলিয়া যে চন্দ্রগুপ্তকে 'মৌর্য' বলা হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ অথবা ইঙ্গিত আদৌ নাই।

পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ সুত্তান্ত গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত" নামক পুস্তকে "পিপ্পলীবন" নামক স্থানের "মোরিয়" আখ্যা বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় জাতির কথা লিখিত আছে। প্রাকৃত ভাষায় রচিত সিংহল দ্বীপের ইতিহাস "মহাবংশ" নামক গ্রন্থে, "অশোক অবসান" ও "দিব্যাবদান" প্রভৃতি পুস্তকেও এই বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু কোনও পুস্তকেই চন্দ্রগুপ্ত মহারাজের মাতার নাম প্রদত্ত হয় নাই।

আমাদের এই আদরের "প্রতিভা" পত্রে (নবমবর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) "মৌর্যবংশ" শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা এই বংশের বর্ণ বিনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি এবং তথায় আমাদের অনুসন্ধানের ফলে এই বংশকে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বলিয়া বুঝিয়াছি। সেই সকল যুক্তি তর্ক আমরা এখানে পুনরায় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি না; কৌতূহলী পাঠক আবশ্যক বোধ করিলে অবশ্যই দেখিয়া লইতে পারিবেন।

পালীভাষায় "মৌর্য" শব্দটি যে "মোরিয়" এবং প্রাকৃত ভাষায় "মোরিঅ" আকার পরিগ্রহ করে তাহা সকলেই জানেন। পালিভাষায় লিখিত "মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত" নামক গ্রন্থখানি যে গৌতম বুদ্ধের দেহত্যাগের অতি অল্পদিন মধ্যেই লিখিত হইয়াছিল এবং ইহা হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যে একখানি অতি প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থ তাহা য়ুরোপীয় এবং অস্মদ্দেশীয় বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের সময় লইয়া পণ্ডিতে২ ঘোরতর দ্বন্দ্ব থাকিলেও (৬) চন্দ্রগুপ্ত দেব মৌর্য যে বুদ্ধ নির্বাণের অনেক দিন পরে মগধ রাজ্যের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি তর্কের স্থলে ডাক্তার রিস্ ডেভিসের কথিত বুদ্ধ নির্ব্বাণের সময়ও গ্রহণ করা যায়

(৪) বায়ুপুরাণ, ৯৯ তম অধ্যায় (বঙ্গবাসী) মৎস্যপুরাণ অধ্যায় (বঙ্গবাসী,) বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায় (বোম্বাই) শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ১ম অধ্যায় (বোম্বাই)।

(৫) কথাসরিৎসাগর, কথাপীঠলম্বক ৫ম তরঙ্গ (বোম্বাই)।

(৬) বুদ্ধনির্বাণ সম্বন্ধে ফা-হিয়ান ১০৯৭ খৃঃ পূঃ, চীনদেশ প্রচলিত মতে ৬৩৮ খৃঃ পূঃ, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ প্রচলিত মতে ৫৪৪ খৃঃপূঃ, এবং সাহেবদিগের মতে ৩৮৮ খৃঃপূঃ (ডাক্তার কার্ণ) হইতে ৪৮৭ খৃঃপূঃ (বি, এ, স্মিথ) পর্যন্ত আছে। রায় বাহাদুর পণ্ডিত গৌরী শঙ্কর হীরাচাঁদ প্রণীত "প্রাচীন লিপিমালা" ১৬৪ পৃষ্ঠা। (হিন্দীভাষায় লিখিত গ্রন্থ-লিপি-বিস্তার এই অতুলনীয় পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য একত্র সংগৃহীত হইয়াছে)।

(৩১২ খৃষ্ট পূর্ব্ব) (৭), তাহা হইলেও চন্দ্রগুপ্ত তাহার অন্ততঃ একশত বৎসর পরে মগধরাজ্যের রাজা হইয়া ছিলেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত "মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র" গ্রন্থ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে "মোরিয়"নামে পরিচিত এক ক্ষত্রিয় জাতি পিপ্পলীবন নামক স্থানে বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় রাজ্য করিতেছিলেন (৮)।

"মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে" বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কুশীনগর অথবা কুশীনারা নামক স্থানে ভগবানের দেহত্যাগ ঘটিলে কুশীনগরের অধিপতি "মল্লগণ" তাঁহার মৃতদেহের সৎকার অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। এই সময়ে তৎকালীন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশের মধ্যে কতকগুলি বংশের অথবা জাতির লোক কুশীনগরে আসিয়া ভগবানের স্থূপ নির্ম্মাণের অভিপ্রায়ে তাঁহার পবিত্র দেহের ভস্মাবশেষ চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে কুশীনারার "মল্ল", মগধের "অজাতশত্রু", বৈশালীর লিচ্ছবি", কপিলবস্তুর "শাক্য", অল্লকপ্পের "বুলী", রামগ্রামের "কোলিয়", পাবার "মল্ল" এবং পিপ্পলী বনের "মোরিয়"গণ ভগবানের দেহাবশেষ লইতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে কেবল মগধে এবং কোশলে রাজতন্ত্রের (Monarchy) অস্তিত্ব ছিল কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগের অন্য অন্য স্থানে তখনও গণতন্ত্র মূলক (Oligarchy) শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেইজন্য মগধরাজ্য ভিন্ন অন্য কোন স্থানের রাজার নাম দেওয়া নাই কিন্তু শাসক সম্প্রদায়ের কুল অথবা জাতির নাম লিখিত হইয়াছে। এই ভস্মাবশেষ প্রার্থী সকল রাজ কুলের লোক আসিয়া বলিয়া ছিলেন, "ভগবান্ ক্ষত্রিয় বর্ণা-বর্ণভুক্ত ছিলেন, এবং আমরাও ক্ষত্রিয়; আমরাও ভগবানের দেহাবশেষের এক অংশ পাইতে অধিকারী। এই পবিত্র দেহাবশেষের উপর আমরা এক চৈত্য স্থাপন করিব এবং তাঁহার সম্মানার্থ একটি মহোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিব।" মগধ রাজ অজাতশত্রুর এবং কুশীনারার মল্ল প্রমুখ প্রত্যেক রাজ-কুলের দূতের ন্যায় পিপ্পলী বনের "মোরিয়"(মৌর্য) গণের দূতও ঐ একই কথা বলিয়া ছিলেন। উক্ত সূত্রগ্রন্থে লিখিত আছে, "এবং পিপ্পলী বনের মোরিয়গণ কুশীনারায় ভগবানের দেহত্যাগের সংবাদ শুনিলেন। তাহার পর পিপ্পলী বনের মোরিয়গণ কুশীনারার মল্লগণের নিকট দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন 'ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরা ভগবানের পবিত্র দেহাবশেষের এক অংশ পাইবার যোগ্য। এই পবিত্র দেহাবশেষের উপর আমরা একটী চৈত্য স্থাপন করিব এবং তাঁহার সম্মানের জন্য একটি মহোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিব।" (৯)

উপরিযুক্ত "মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র" গ্রন্থের ঐতিহ্য হইতে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া গেল যে চন্দ্রগুপ্ত দেব মৌর্য্যের

(৭) ডাক্তার রিস্ ডেভিস প্রণীত "Buddhism" Ed. 1880. ২১৩ পৃষ্ঠা। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ খৃঃ পূঃ ৩২০র কাছাকাছি হইবে।

(৮) Mahaparinibban Sutta, ch. IV. Translated by Rhys Davis in the Sacred Books of the East, Vol XI.

(৯) 61. And the Moriyas of Pipphalivana heard the news that the Blessed One had died at Kusinara. Then the Moriyas of Pipphalivana sent a messenger to the Mallas (of Kusinara) saying "the Blessed One belonged to the Soldier Caste, and we too are of the Soldier Caste, We are worthy to receive a portion of the relics of the Blessed One. Over the remains of the Blessed one will we put up a sacred cairen, and in their honour will we celebrate a feast."

Mahaparinibbana Sutta, ch. VI. Translated by Dr. Rhys Davis in the Sacred Books of the East Vol. XI. আমাদের নিকট পালী ভাষার মূল এ সময়ে না থাকায় ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

জন্মের অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও উত্তর বিহার অথবা তীরহুত প্রদেশস্থিত "কুশীনগর" অথবা "কুশীনারা" নামক নগরে "পিপ্পলীবন" নামক স্থানের "মোরিয়" (মৌর্য) নামে বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজকুলের দূত আসিয়াছিল। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের মতে এই পিপ্পলীবন হিমালয় পর্ব্বত মালার সন্নিহিত কোন প্রদেশে ছিল। সিংহলের ইতিহাস মহাবংশে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যকে এই পিপ্পলী বনের মোরিয়কুল সম্ভূত ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বলা হইয়াছে (১০) এবং উহার টীকায় তাঁহাকে উচ্চ রাজবংশের মহাদেবীর গর্ভজ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

কর্ণেল জেমস্ টড প্রণীত "রাজস্থানের ইতিহাস" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। "গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের প্রতিদ্বন্দী বলিয়া অনুমিত চন্দ্রগুপ্ত "মোর" বংশীয় ছিলেন এবং পবিত্র বংশাবলীতে তাঁহাকে তক্ষক বংশীয় বলা হইয়াছে। প্রামার-ক্ষত্রিয় কুলের প্রাচীন ক্ষোদিত লিপিতে লিখিত হইয়াছে যে "মোরি" কুল ভুক্ত এবং তক্ষক বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রামার কুলের এক বিখ্যাত শাখার নাম 'মোরি'।

"প্রামার কুলের পঞ্চত্রিংশ শাখা আছে।"

"মোরি। এই বংশ হইতেই চন্দ্রগুপ্ত এবং গেহ্লোটগণের (মেবাড়ের বর্ত্তমান বংশ) পূর্ব্ববর্ত্তী চিতোড় রাজগণ উদ্ভূত হইয়া ছিলেন।" (১১)

"একটি প্রাচীন ক্ষোদিত লিপি হইতে জানিতে পারাযায় যে সংবৎ ৭৭০ অব্দে (৭১৪ খৃষ্টাব্দ) মোরি বংশীয়গণের অধিকারেই চিতোড় রাজ্য ছিল। আর, রাণার প্রাসাদে রক্ষিত ইতিবৃত্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে বিখ্যাত বাপ্পা রাবল চিতোড়ের মোরি বংশীয় এক রাজার ভাগিনেয় ছিলেন (১২)।"

বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রণীত "দক্ষিণাপথের ইতিহাসে লিখিত আছে যে খৃষ্টীয় ৫৬৭ হইতে ৫৯১ অব্দের মধ্যে চালুক্যবংশীয় নরপতি কীর্ত্তিবর্ম্মা উত্তর কোঙ্কণ প্রদেশের মৌর্য বংশীয় রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। (১৩)

এই সকল প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০অব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে পিপ্পলীবন নামক স্থানে "মোরিয়" নামে বিখ্যাত এক ক্ষত্রিয় রাজকুল রাজত্ব করিতেছিলেন এবং খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে যে চন্দ্রগুপ্ত মগধের বিখ্যাত "মৌর্যবংশীয় রাজকুলের" (Dynasty'র) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি ঐ পিপ্পলী বনের মোরিয়গণের কুল হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার পরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-শতাব্দে মহারাষ্ট্রের উত্তর কোঙ্কণে এক মৌর্যবংশীয় রাজকুল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং পুনশ্চ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে রাজপুতনার চিতোড় (মেবাড়) রাজ্যেও এক 'মোরি'বংশীয় রাজা নিজ অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি এই সকল সংবাদকে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, 'মোরিয়' অথবা 'মৌর্য' নামে পরিচিত এক ক্ষত্রিয় রাজবংশ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দ হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের কিয়দংশ পর্য্যন্ত প্রায় ১৩০০ তেরশত বর্ষ ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে (খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দের কাছাকাছি) মুরা নাম্নী কোন নাপিত অথবা শূদ্র কন্যার নাম হইতে এই বংশের নাম সৃষ্ট হয় নাই।

(১০) মোরিআনং খত্তিয়ানং বংশজাত সিরিধরান্।
চন্দ্রগুত্তোতি পুঞ্ঞত্তন্ চাণক্কো ব্রাহ্মণো ততো ॥৫।১৩॥
ইত্যাদি। মহাবংশ, বিশ্বকোষ ধৃত।

(১১) Annals of Rajsthan, Vol I. Chapter VII p, 97 Mr. Ambika Ukil's Edition.

(১২) Annals of Mewar, Vol. I. Chapter II, p. 234. Ibid.

(১৩) Dr. R. G. Bhandarkar's. "Early History of the Dekkan", p p 37—39. (Inscriptions of Aihole).

আমাদের কিন্তু ধারণা হইতেছে যে এই 'মোরি' 'মোরিঅ' অথবা 'মৌর্য' নামে বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজকুল খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দের আরও অনেক পূর্ব্ব হইতে ভারতখণ্ডে বিখ্যাত ছিল। সংস্কৃত "ময়ূর" (Peacock) পক্ষীর নাম প্রাকৃত ভাষায় "মোর" হইয়া যায় এবং আজিও হিন্দীভাষায় ঐ পাখীকে "মোর" ই বলে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্ম সম্বন্ধে এবং 'মোরিয়' অথবা 'মৌর্য' এই আখ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে এদেশে এখনও অনেক উপকথায় ময়ূর পাখী এবং ময়ূরপালের গল্প প্রচলিত আছে। আমাদের বিশ্বাস যে প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন সময়ে যে বংশ "ময়ূর বংশ" নামে বিখ্যাত ছিল, উত্তরকালে পালী এবং প্রাকৃত ভাষার রাজত্বকালে, তাহাই 'মোরি', 'মোরিঅ', 'মোরিয়' অথবা 'মোর'-বংশ নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই ময়ূর বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের কথা প্রথমে আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই। মহাভারতে সভাপর্ব্বের দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহারাজ যুধিষ্ঠীরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রথমে নকুল ভারতখণ্ডের পশ্চিমদিক জয় করিতে গিয়া কার্ত্তিকের দেবের প্রিয়স্থান "রোহিতিক" আক্রমণ করত "ময়ূর ক্ষত্রিয়" দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন (১৪)। কার্ত্তিকের দেবের বাহন ময়ূর সম্ভবতঃ তাঁহার ভক্ত ক্ষত্রিয় রাজকুল ভক্তিবশতঃ তাঁহার বাহনের নামে নিজবংশ প্রখ্যাত করিয়াছিলেন।

ওড়িশা প্রদেশের আধুনিক ময়ূরভঞ্জ নামক রাজ্যের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ঐ রাজ্যের বর্ত্তমান রাজ-

(১৪) কার্ত্তিকেয়স্য দয়িতং রোহিতকমুপাদ্রবৎ ॥৪॥
তত্রযুদ্ধং মহচ্চাসী চ্ছূরৈর্মত্ত ময়ূরকৈঃ ।৫।
মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩২শ-অধ্যায়, ৪।৫ শ্লোক।

পাছে "শূর মত্ত ময়ূরগণ" শব্দে কোন পাঠক 'ময়ূরপাখীর সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল' বুঝিয়া বসেন, তন্নিমিত্ত টীকাকার শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ ভট্ট কৃপা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, "'ময়ূর' এই আখ্যাধারী ক্ষত্রিয়দিগের সহিতই মহাবীর নকুলের যুদ্ধ হইয়াছিল।"

গণের বংশনাম ভঞ্জদেব এবং তাঁহারা ভঞ্জবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পূর্ব্বপুরুষ মেবাড়ের সূর্য্যবংশীয় রাণাদিগের জ্ঞাতি অথবা দায়াদ ছিলেন এবং তিনি ঐ রাজ্যের পূর্ব্বতম অধিপতি ময়ূর বংশীয় রাজাকে অপসারিত করিয়া নূতন বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই ময়ূরবংশ এই রাজ্যে যে কত কাল পূর্ব্ব হইতে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা কেহই নিঃসংশয়সরূপ বলিতে পারেন না। তবে সেই ময়ূর বংশীয় রাজকুলকে ভগ্ন করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ত্তমান রাজবংশ ভঞ্জ উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাজ্যের নামও ময়ূরভঞ্জ রাখিয়াছিলেন। এখনও ঐ রাজ্যে ময়ূর পক্ষী অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত এবং ময়ূর বধ ঐ রাজ্যে নিষিদ্ধ বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এই ময়ূরভঞ্জ রাজ্য প্রাচীন সুহ্ম (রাঢ়) দেশের অন্তর্গত ছিল; সুতরাং আমাদের প্রতিবেশী রূপে ময়ূর অথবা মৌর্য বংশীয় এক রাজকুল কিছুদিন অগ্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তেও বিদ্যমান ছিলেন বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমাদের অনুমান হয় যে ভারত খণ্ডের অগণ্য স্বাধীন রাজকুলের মধ্যে এখনও এই (মরিয় অথবা মৌর্য কুলের দায়াদগণ কোথায়ও না কোথায় বিদ্যমান রহিয়াছেন।

মহাভারত রচনার কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে যতই বিবাদ থাকুক না কেন, উক্ত মহাগ্রন্থে লিখিত ঐতিহ্যগুলির প্রাচীনতা বিষয়ে সন্দেহ প্রায় কাহারও নাই। উক্ত গ্রন্থে যখন "ময়ূর" নামে বিখ্যাত এক ক্ষত্রিয় রাজকুলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দ অথবা তাহার পূর্ব্বেও যখন "মোরিয়" নামক ক্ষত্রিয় রাজবংশের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তখন খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে যে 'মুরা' নাম্নী কোন নারী হইতে এই বিখ্যাত "মোরিয় মোরিঅ, অথবা মৌর্য" বংশের নামের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না।

চন্দ্রগুপ্ত মহারাজকে "মৌর্য" বংশের প্রথম রাজা বলিয়া

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিকগণ পরিচিত করায় সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতেরা এই "মৌর্য" শব্দের নিরুক্তি অথবা উৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত দেবের পিতার নাম যে "নন্দ" ছিল তাহা কেহ কেহ অনুমান করায় এই নিরুক্তি নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হইয়াছিল। নন্দবংশের দায়াদ হইলেও তাঁহার উপাধি "নন্দ" না হইয়া কেন "মৌর্য" হইল, এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান আবশ্যক বলিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা মনে করিয়াছেন এবং সেই জন্যই "মৌর্য" শব্দের প্রকৃত নিরুক্তি জ্ঞানের অভাব বশতঃ কাল্পনিক নিরুক্তি (মুরার পুত্র মৌর্য) গ্রহণ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।
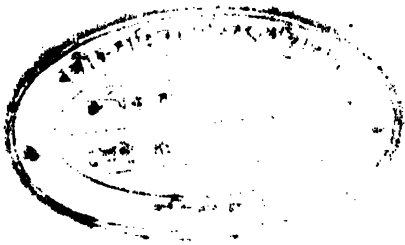
সূর্য্যমুখী ফুল।

আমি, সূর্য্যমুখী ফুল।
কেউ তো আমার গন্ধে রূপে হয় না সমাকুল।
আমার মাঝে নাই সে মধু, হয়না পাগল দ্বিরেফ-বঁধু,
গুঞ্জরিয়া গুণ গাহেনা কেউ তো আমার কভু!
আমি, সূর্য্যমুখী তবু!

আমি, কেবল আশা লই!
সূর্য্য হেরি' আকুল প্রাণে সদাই চেয়ে রই!
বড়ই মিঠে প্রেমের আলো, তাই তো তাকে বাসি ভালো,
তপন আমার মন মজালো, তাই তো অলপ্পেয়ে!
তবু, কেবল থাকি চেয়ে!

আমি, তুচ্ছ তবু সতী!
প্রাণ দিয়ে যা'য় বাসি ভালো তারেই করি পতি!
চাই দেবতার সকল মনে, প্রেম যাচিনা সঙ্গোপনে,
নাম শুনে, মোর কে-ই না জানে চাচ্ছি কা'কে আমি!
এস, সূর্য্যমুখীর স্বামী!

আমি, নই তো মধুর ফুল!
না হই কেন গোলাপ যুথি, বজায় রাখি কুল!
হই না লম্বা ঢেঙা, দেখতে সরু বাঁশের ঠেঙা,
আলোর প্রেমে মত্ত থাকি, চাইরে অরুণ-আলো!
কভু, বাসবে না সে ভালো?

আমি, রইব চেয়ে তবু!
নয় তো প্রিয় সদয় হবে এই জীবনে কভু!
লক্ষ যোজন দূরে থেকে, কেবল তাকেই যাব দেখে,
না-পাওয়া মোর পাওয়ার নেশায় পূর্ণ আমার প্রাণ!
আর, চাই না প্রতিদান!

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

REGTD. NO. C. 768.

১৪শ বর্ষ কার্ত্তিক, অগ্রাহায়ণ ও পৌষ ১৩৩১ ৩য় সংখ্যা

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত

প্রতিভা

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার

এম্-এ, পি-এইচ-ডি, এফ্-সি-এস

সূচী

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২।৵০ } শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রতিভা কার্য্যালয়, ঢাকা। { এই সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সহ ॥৵০

——(•)——

প্রতিভার নিয়মাবলী

১। প্রতিভার বার্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ২।৴৹ আনা। এক সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র। নমুনার জন্য ।৹ আনা পাঠাইতে হইবে। সাধারণের সমিতি বা পাঠাগার হইতে ৴১০ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। বৈশা হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকেও বৈশাখ হইতে পত্রিকা লইতে হয়। মূল্যাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট পাঠাইবেন

৩। বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলম—১০৲, অর্দ্ধপৃষ্ঠা বা এক কলম—৫৷৹ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—৩৲, সিকি কলম—২৲।

কভারের পৃষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা তদূর্দ্ধ কালের জন্য বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহা পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে, নতুবা পূর্ব্ব ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রহিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

প্রতিভার জন্য বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। সমালোচনার জন্য গ্রন্থ দুইখানি করিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার প্রতিভা।
ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ কার্য্যালয়,
৬৭-নং লায়েল ষ্ট্রীট, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

ঢাকা, বনগ্রাম রোড, সন্তোষ প্রেস—প্রিণ্টার শ্রীমদনমোহন দে সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

১৪শ বর্ষ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩১ ৩য় সংখ্যা

সাঁওতালী ভাষা।

(২)

সাঁওতালদিগের ভাষায় বহু শব্দ আমাদের বঙ্গভাষায় প্রচলিত হইয়াছে। তবে সাঁওতালী ভাষায় গৃহীত বঙ্গভাষার শব্দের সংখ্যা অনেক বেশী। সভ্যতার উপাদান মাত্রই তাহারা বঙ্গবাসীর নিকট পাইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে সেই সকল বস্তুর নামও তাহারা বঙ্গভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে সাঁওতালেরা যে সকল স্থানে বিচরণ করিয়াছে, সেই সকল স্থানের নাম তাহাদের পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়েও তাহারা ভাবনিষ্কর্ষ (abstraction) দ্বারা কোনও কিছুর জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই। যে দেশ বা যে স্থান তাহাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছে সেই দেশ বা সেই স্থানের নাম তাহারা রাখিয়াছে। কিন্তু 'সাসাংবেড়া'ও নহে, 'হিহিড়িপিহিড়ি'ও নহে, 'খোজ্-কামান্'ও নহে, 'হারাবুরু'ও নহে, 'চাম্পা'ও নহে, অথবা অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশও নহে, অথচ সকল দেশেই প্রযোজ্য 'দেশ' শব্দ তাহাদের ভাষায় নাই। কারণ এরূপ নামকরণে ভাবনিষ্কর্ষ আবশ্যক। তাই তাহারা এ শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে। 'দেশ'-কে তাহারা 'দিশম্' বলে। সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত অধিকাংশ শব্দের শেষেই তাহারা (দ্রাবিড় দিগের ন্যায়) 'অম্' জুড়িয়া দেয়; যেমন,—'মুন্দাম্' (মুদ্রা, অঙ্গুরী), 'দাত্রম্' (দাত্র, কাস্তে), 'সুতাম্' (সূত্র, সুতা), 'শাকাম্' (শাখা, বৃক্ষপত্র); 'এরাডোম্' (এরণ্ড), 'সার্জ্জম্' (সর্জ্জ, শাল-গাছ), 'মাংকম্' (মধুকম্, মহুয়া), 'কাটকম্' (কর্কট), 'ডাঁড়ম্' (দণ্ড, জরিমানা), ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষা, বঙ্গভাষা, আরবী ভাষা, হিন্দী ভাষা বা অন্য যে কোনও ভাষা হইতেই ইহারা শব্দ গ্রহণ করুক না কেন, শব্দের উচ্চারণ নিজেদের মত করিয়া লইয়াছে। যেমন, 'পৃথিবী' স্থানে

'পিরথিমি' 'ইলিম' (বিদ্যা), ইত্যাদি। এ সকল নানা কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি এইখানে বঙ্গভাষায় গৃহীত কতিপয় সাঁওতালী শব্দের তালিকা দিলাম। আমি এই শব্দ গুলিকে মৌলিক সাঁওতালী শব্দ বলিয়াই মনে করি ; কারণ বঙ্গভাষার প্রকৃতি অনুসারে ইহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না। তাহা ছাড়া সভ্যতার দিক্ দিয়া দেখিলেও এ শব্দগুলিকে মৌলিক সাঁওতালী শব্দ বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে কোনও বাধা হয় না।

১। কু'লি (সাঁং 'কুল্হি' = গ্রাম্য পথ, বীরভূম জেলায় 'কু'লি' শব্দে সেই প্রকার গ্রাম্য পথকে বুঝায়, যাহার উপর দিয়া বর্ষায় জল বহিয়া যায়)।

২। গোড়া (মূল, সাঁং 'গোডা' শব্দে 'ভিটা' বুঝায়)।

৩। জোল্ জমি (সাঁং 'জোলা' = বিল)।

৪। খুঁটী, খুঁটা (সাঁং 'খুন্টী')।

৫। কাঁথ্ (সাঁং কাঁথ্ = দেওয়াল)।

৬। ঠেঙ্গা (সাঁং ঠেঙ্গা = লাঠি)।

৭। লিগে (সাঁং 'নিঙ্ঘা = গাড়ির ধুর, অক্ষদণ্ড)।

৮। বাধা (সাঁং বাধা = খড়ম্)।

৯। উথ্ড়া (সাঁং উথ্ড়া = মুড়্কি)।

১০। গজাল (সাঁং গোজাল = পেরেক)।

১১। টাঙ্গী (সাঁং টাঙ্গা = কুড়াল)।

১২। কাঁড় (সাঁং কাঁড় = তীর, বাণ)।

১৩। ঢেঁকি (সাঁং ঢিঙ্কি)।

১৪। বোঁক (সাঁং বন্ক্ = বৃন্ত, বোঁটা)।

১৫। ঝিঙে (সাঁং ঝিঙ্গা)।

১৬। সারো কচু (সাঁং সারু = কচু)।

১৭। ডে'ও (সাঁং ডাহু = বড়াল, মাদার)।

১৮। দামড়া (সাঁং ডাংরা = বলদ) ।

১৯। কাড়া (সাঁং কাড়া = মহিষ)।

২০। বীরভূমের প্রাং "কো'ও", (Kouo) চট্টগ্রামের "কাউআ" "সাঁং কাহু (= কাক) শব্দের প্রভাব পাইয়াছে।

চট্টগ্রামের একটী ঘুমপাড়ানী ছড়া।

"কাউআ কা কা
বোল্ বিবিরে খা
আর, হন্দরীরে বিহা কম্মি ঢাগা চলি যা।"

২১। সাক্রেদ (= মন্দকার্য্যের সাহায্যকারী, সাঁং সাড্গেং = ভায়রা ভাই)।

২২। ডোঙো, ডেঙো, ডোক্রা, ডেক্রা (সাঁং ডাঙোআ কোড়া = অবিবাহিত বালক)।

২৩। চাঁদি (মাথা, সাঁং চান্দি)।

২৪। গুলুক (সাঁং গুলুক = মিলন ; বাং উদাহরণ—গুলুকে গুলুক মারে)।

২৫। নেড়া, নেংড়া (= খঞ্জ, সাঁং লেঢা = খঞ্জ)।

২৬। ঠুটা (সাং ঠুন্টা = যাহার হাতের আঙ্গুল কাটা)।

২৭। গোদা (= মোটা, ভারী, সাঁং গোদা = গোদ)।

২৮। কালা (সাং কালা = বধির)।

২৯। তোৎলা (সাঁং তোৎড়া)।

৩০। হেঁদে। (= মোটা, সাঁং হেন্দে)।

৩১। ঢের্ (= বেশী, অনেক ; সাঁং ঢের)।

৩২। ওদা (সাঁং ওদা = ভিজা)।

৩৩। কা'-লা (= ঠাণ্ডা, সাং কাল্হা = ঠাণ্ডা)।

৩৪। গেঁড়া (= বেঁটে খর্ক ; সাঁং গেডা)।

৩৫। ওসার (সাং 'ওসার' = চওড়া, চওড়াই)।

৩৬। উনি, ইনি, (সাঁং 'ইনি', উনি = সে)।

৩৭। গা 'রিস্ রিস্' করা (সাঁং 'রিস্ রিস্' = রোমাঞ্চ)।

৩৮। বীরভূমের প্রাং 'টেঁকুলে' দেওয়া (সাঁং ঢাকা = ধাকাদেওয়া)।

৩৯। 'উছ্রে' দেওয়া (= বমি করা ; সাঁং উছলাউ = বমি করা)।

৪০। আড়্ (সাং আড়্ = আড়াল করা)।

৪১। দৌড় (= ধাব ; সাং দেউড়্ = পলাইয়া যাওয়া)।

৪২। সাড়া (সাঁং সাড়ে = শব্দ করা)।

৪৩। বিটুলামি (সাঁং বিটোল = জাতি নাশ করা)।

৪৪। ঘাট (= অপরাধ ; সাঁং ঘাটু = অপরাধ করা)।

৪৫। ওড়োং (বীরভূমের প্রাং = নারিকেলের মালা দিয়া তৈয়ারী দুধ নাড়িবার পাত্র বিশেষ ; সাঁং ওডোং = বাহির করা।

৪৬। নেঙ্গা হাত (বাম হস্ত, সাঁং লেঙ্গাতি)।

৪৭। মধুনি, মুড়নি (= মটকা)।

৪৮। হাঁকুপাকু (সাঁং হাকো পাকো = তাড়াতাড়ি)।

৪৯। এলোপাথালি (সাঁং আউরিপাথাউড়ি = বিশৃঙ্খলভাবে)।

৫০। সতর থাকা, যেমন চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্তকে বলে সতর (বা সতর্ক) থাকতে। (সাঁং হোঁশিয়ারমে = সাবধান)।

৫১। ঢিল ঢেলা ডেলা (সাঁং ধিরি, ধির = পাথর)।

৫২। ঠাকুর (= দেবতা।

৫৩। ফস্‌কে যাওয়া (সাঁং ফসকাও কানা)।

৫৪। প্রাচীন বা হউস (সাঁং হেউস = আনন্দ)।

৫৫। লেলা, নেলা (সাঁং লেলহা = বোকা)।

৫৬। আউড়, আউড়ি (সাঁং এড় খড়)।

৫৭। গোটা (সমগ্র)।

সাঁওতালী ভাষায় গৃহীত আরবী পার্সী শব্দ।

হিন্দী ও বাঙ্গালা হইতে এই সকল শব্দ গৃহীত হইয়াছে। জুমি (জমি,) সুরকি, (সুরকি), বাগয়ান, (বাগান,) তাকিয়া (বালিস,) কিতাব্ (বই), কাগাৎ (কাগজ), অল্ (লেখা), কুসি (সন্তোষ), হুদিস (বুদ্ধি), হুনির্ (বিদ্যা), সাফা (পরিষ্কার), আকিল্ (বুদ্ধি), আকিলান্ (বুদ্ধিমান্), অল্ (লেখা), সদর (প্রকাশ), ইত্যাদি।

সাঁওতালী ভাষায় গৃহীত বাঙ্গালা শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা

পির্‌থিমি (পৃথিবী) ধারতি (ধরিত্রী), জুমি (জমি), থ্যাদ (খাদ, খনি), কুঁই (কূপ, কুআ), পুখ্‌রী (পুকুর), স্তার্ (সায়ের, দীঘি), কুইলে (কয়লা), সুরকী, বাগয়ান্ (বাগান), বিজ্‌লি (বিদ্যুৎ), কুহুড়া (কুয়াসা), দুআর (দুয়ার), কাপাট (কপাট), শিক্‌লি (শিকল), সাগাড় (শকট গাড়ি), ছাতম্ (ছাতা), চাউলি (চাউল), স্তাল্ (ডাল, দাইল), পিঠে (রুটি), আটা (ময়দা), সাতু (ছাতু), নিন্নু (ননী), গোতম্ (ঘৃত, সংস্কৃত শব্দ), দাহি (দই), ফাল ল ঙ্গলের ফাল), পুঁথি (বই), খেত (ক্ষেত), ডাভর্ (ডাল, বৃক্ষশাখা), জাও (যব), গুহম্ (গম), মাটর্ (মটর), ভুট্ (বুট), খিসাড়ি (খেঁসারি), ঠিসি (তিসি), তিল মিঞ (তিল), আধে (আদা), গোটোল্ (পটোল), নারকোঁড় (নারিকেল), গুয়া (সুপারি), কাঠার (কাঁটাল), তালী (তাল), থাজুর (খেজুর), গাবলা (বাদলা), কাদাম (কদম্ব), দাতরে (ধুতুরা), শুকরী (শূকর), গেই (গাই), ভিড়ি (ভেড়া), মন (সং—মনস্), জিউই (জীবন), লভ (লোভ), পাণ্ডু (পাকাচুল) লাজাও (লজ্জা, লজ্জাকরা), ভাবনা (চিন্তা), জানাম (জন্ম), দেদ্ (দাদ), তোৎড়া (তোৎলা, উড়াও (উড়া), পাতিয়াও (প্রাং বাং প্রত্যয়) সাজাও (সাজান), ইত্যাদি।

সাঁওতালী ভাষায় গৃহীত হিন্দী শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা

টোলা (পাড়া), হাটিয়া (হাট), ধুড়ি (ধুলা) কুহুড়া (কুয়াসা), তাকিয়া (বালিস), ঢাকনী (সরা), ভেঁড়িয়া (lamb), চিলিম্ (কলিকা) পানাহি (জুতা, সং- উপানহ্) আটা (ময়দা), সাতু (ছাতু), থারি (থালা), কাড়ছু (হাতা), ঘাঁস (ঘাস), কিয়া (কেতকী), রুহি (রুই), হিলসা (ইলিশ), বোয়াড় (বোয়াল), মাগুরি (মাগুর), চেঁড়ে (পাখী), কেলে (কোকিল), পারেয়া (পায়রা) লোহু (রক্ত), তারু (তালু), পাঞ্জার (পঞ্জর) জাঙ্গা (পা, স জঙ্ঘা), লালচ (লালসা), আকিল (বুদ্ধি), বুধ (বুদ্ধি) হুদিস (বিবেচনা) তোৎড়া (তোতলা), হরিয়াড় (সবুজ), সাফ (পরিষ্কার)

ছুল্যাড় (প্রিয়), নিজোর (শক্তিহীন) শুঝি (সোজা), বেবুজ (বোকা), নাওয়া (নূতন), থাপা (চপেটাঘাত), পাড়হাও (পড়া, পাঠ করা, পাঠ), লাদে (ভার, বোঝা, চাপান), এয়াদ (মনে রাখা, স্মৃতি) সদর (প্রকাশ্য, ইত্যাদি)।

ব্যাকরণ

অতঃপর সাঁওতালী ব্যাকরণের কথা। এ ব্যাকরণের সহিত আমাদের ব্যাকরণের মিল বড় কম। ইহাদের ব্যাকরণের বৈশিষ্ট সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় অল্পই লক্ষিত হয়; কিন্তু যাহারা ভাল সাঁওতালী জানে তাহারা নিজের ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া কথোপকথন করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সাঁওতালী ভাষা বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার বহিঃ-প্রভাবে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য হারাইয়া ফেলিতেছে। সাঁওতালী ভাষার বহু প্রাচীন বৈচিত্র্য এখন লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

উচ্চারণ

বঙ্গভাষার ন্যায় সরল উচ্চারণ যে সাঁওতালীর নহে তাহা বঙ্গভাষা হইতে গৃহীত কতিপয় শব্দের উচ্চারণেই ধরা পড়ে। প্রথম অক্ষর স্থিত অ-কার স্থানে আ-কারের উচ্চারণ হয়; যেমন, নদী স্থানে নাঙ্গ, কপাট—কাপাট, দহি—দাহি, মসুর—মাস্‌রী, মটর—মাটর, গরুড়—গারুড়, জঙ্ঘা—জাঙ্গা, নব (নূতন)—নাউআ, ইত্যাদি। প্রথম অক্ষরস্থিত আ-বর্ণ স্থানে 'এক' শব্দের এ-বর্ণের ন্যায় বক্র-উচ্চারণ-বিশিষ্ট এ-কারের উচ্চারণ হয়। খাদ (খনি, যেমন কয়লা খাদ)—খেদ্ (খ্যাদ্), সায়র (=দীঘি)—সের্, ডাল (=শাখা)—ডের্ (dar), গাই (গাভী)—গেই, ইত্যাদি।

ওষ্ঠ্যবর্ণ সন্নিহিত অ-কার স্থানে ও বা উ হয়—পয়সা স্থানে পুইসা (পোইসা), কিন্তু পার্‌গানা (পরগণা)।* বহু স্বরবর্ণ উপর্য্যুপরি উচ্চারিত হইবার পক্ষে বাধা নাই। তবে দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তী এ স্থানে য়্ এবং ও স্থানে ব্ (w) হয়। পদান্তস্থিত ক চ ত প বর্ণের অর্দ্ধ উচ্চারণ হয়। এই চারি বর্ণের উচ্চারণের এমন একটা বৈচিত্র্য আছে যে তাহা আমরা কানে শুনিয়া ধরিতে পারিনা। সাঁওতালী ভাষায় একটী মাত্র স-বর্ণ; ইহার উচ্চারণ দন্ত-তালব্য। ঋ, ৯, ঐ, ঔ এবং ণ ছাড়া বঙ্গভাষার সকল বর্ণই সাঁওতালী ভাষায় আছে।

সন্ধি ও স্বরস্থিতি

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ক্ চ্, প্ ত্, স্থানে গ্ জ্ ব্ দ্ হয় এবং দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তী এ এবং ও স্থানে য় এবং ব্ হয়। দ্ব্যক্ষর শব্দ সমূহের প্রথম অক্ষরেই স্বর স্থিত সাধারণ, তবে অভ্যস্থ ধাতুর দ্বিতয়ার্দ্ধেই স্বরস্থিতি হয়। ইহা ছাড়া স্বরস্থিতি বিষয়ে আরও অনেক বৈচিত্র্য থাকিলেও তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

লিঙ্গ ও বচন

সাঁওতালী ভাষায় আমাদেরই ভাষার ন্যায় তিন লিঙ্গের (পুং, স্ত্রীং, নপুং,) সত্তা আছে বটে, কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষার ন্যায় সজীব-নির্জীবের প্রভেদ মানিয়া ইহাদের লিঙ্গ গণনা হয়। নির্জীব বস্তু মাত্রেরই নপুংসক লিঙ্গ। সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়া পদে সজীব ও নির্জীব ভেদে দ্বিবিধ লিঙ্গ। আমাদের কিন্তু ক্রিয়াপদে কোনও লিঙ্গ বা কারক নাই। ইহাদের ক্রিয়াপদে উভয়ই আছে। ইহাদের বিশেষণ পদে কখনও কখনও পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের বিচার হয়, কখনও কখনও হয় না। বীরভূমের প্রাদেশিকে ইহার অনুরূপ প্রয়োগ আছে—'সোন্দর্ মেয়ে'।

সাঁওতালী ভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় তিন বচন। কিন্তু দ্বিবচন ও বহুবচনের প্রয়োগে বিবিধ বৈচিত্র্য আছে। যুগ্ম ভাব বিশিষ্ট শব্দে দ্বিবচনের প্রয়োগ হয়। বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রই দ্বিবচনে অভিধেয়। জামাইকে বসিতে বলিতে হইলে বলা হয়—দুড়ুপ্‌বেন্ জাঁওয়াই! (বস—তোমরা দুজনে—ওহে জামাই)। নতুবা সম্ভ্রম রক্ষা হয় না।

* মৌলিক শব্দ ?

একবচনে বাক্যটী হইত—ডুড়ুপ্‌মে জাঁওয়াই ! ইহার প্রত্যুত্তরে জামাইও দ্বিবচনশব্দ প্রয়োগ করিবে। মালিঙ ডুড়ুপ-আ (হাঁ আমরা দুজনে-বসি)। কিন্তু এখানে দুইজনের সত্তা মোটেই নাই। বহুবচনের প্রয়োগেও এই প্রকার সম্ভ্রমের বিচার আছে। বৈবাহিককে বসিতে বলিলে বহুবচনের প্রয়োগ হয়। কারণ বোধহয় এই যে বৈবাহিকের সঙ্গে ছেলে ও মেয়ের কল্পনা অনুমান করিয়া লইতে হয় ডুড়ুপ্‌পে সুমৃধি ! (বস হে-তোমরা সকলে-বেয়াই)। ইহার উত্তরে বৈবাহিকও বহুবচনের ব্যবহার করিবে—য়ালে ডুড়ুপ কানা. (হাঁ—আমরা সকলে—বসি)। দুই বৈবাহিকে কথোপকথনের সময়ও বহুবচনের প্রয়োগ করিবে; দ্বিবচনের নহে। এখানেও বোধ হয় পুত্র ও পুত্রবধূ, অথবা কন্যা ও জামাতার সত্তা কল্পনায় আসিয়া পড়ে। এইরূপ দ্বিবচন ও বহুবচনের প্রয়োগ না হইলে শিষ্টাচার বজায় থাকে না। কিন্তু ইহাছাড়া ইহাদের গৌরববাচক কোনও সর্ব্বনাম পদ নাই। গৌরবে বহুবচনের প্রয়োগও নাই। বঙ্গভাষায় কথা বলিবার সময়ও ইহারা 'তুই' শব্দের দ্বারাই তুমি ও আপনি শব্দের অর্থ প্রকাশ করে।

উত্তম পুরুষের দ্বিবচন ও বহুবচনে আরও একটী বৈচিত্র্য আছে। যাহার সহিত কথা বলা হয় তাহাকে লইয়া কোনও কাজ করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে দ্বিবচনে আলাঙ ও বহুবচনে আবো বা আবোন্ পদের প্রয়োগ হয়; কিন্তু আকার্য্যমান ব্যক্তিকে বাদ দিয়া কার্য্যকরা উদ্দেশ্য হইলে আলিঙ (দ্বিবচনে) ও আলে (বহুবচনে) ব্যবহৃত হয়।

কারক

এখন সাঁওতালী ভাষায় আমাদের ন্যায় আট কারকেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু মূলতঃ এতগুলি কারক ছিল বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য ভাষার ন্যায় এ ভাষাতেও মুখ্য ও মৌলিক কারক দুইটী—কর্ত্তৃকারক ও কর্ম্মকারক। অন্য সকল কারকই গৌণ কারক। সাঁওতালী ভাষায় সর্ব্বপ্রধান গৌণকারক বোধ হয় দেশ-বাচক। বলা বাহুল্য কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারকের কোনও প্রত্যয় নাই। বাক্যমধ্যে স্থিতি অনুসারে কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারকের ভেদ বুঝা যায়। কর্ত্তৃকারকের অগ্রবস্থান ও কর্ম্মকারকের প্রাগবস্থান হয়। ইহাদের ভাষায় দেশ-বাচক প্রত্যয় 'রে'। এই 'রে' প্রত্যয় যে কোনও শব্দের সহিত ব্যবহৃত হইয়া অধিকরণ কারকের অর্থ প্রকাশ করে। দেশ-বাচক প্রত্যয় হইলেও ইহা কালার্থ প্রকাশক। এই 'রে' প্রত্যয়ের সহিত ব্যক্তি বা বস্তু বাচক সর্ব্বনামের অংশযোগে সম্বন্ধ কারকের প্রত্যয় গঠিত হয়। যেমন, রে+ওন্=রেন্, ব্যক্তিবাচক সম্বন্ধ কারকের প্রত্যয়। সজীব বস্তুর নামের পূর্ব্বে সম্বন্ধ কারকে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। বিশেষ্য পদ বস্তুবাচক, অর্থাৎ নির্জ্জীব বস্তুবাচক হইলে এ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় না। এ ভাষার সর্ব্বত্রই সজীব-নির্জ্জীবের প্রভেদ। নির্জ্জীব বস্তুবাচক সর্ব্বনাম পদ ও সজীব বস্তু বাচক সর্ব্বনাম হইতে পৃথক। কোনও শব্দের সহিত জুড়িবার সময় এই সর্ব্বনাম 'আ' বা 'আক্' অথবা 'আঙ্' আকার প্রাপ্ত হয়। ইহার পূর্ব্বে 'রে' ব্যবহার করিলে 'রেআক্' 'রেআঙ্' অথবা কেবলমাত্র 'আক্', 'আঙ' নপুংসক লিঙ্গে সম্বন্ধ কারকের প্রত্যয়। নপুংশকলিঙ্গে এতগুলি প্রত্যয় থাকিলেও সজীব-লিঙ্গে কেবলমাত্র এক প্রত্যয় 'রেন্'। ইহাদের উত্তর আবার দ্বিবচনের 'কিন্' ও বহুবচনের 'কো' জুড়িয়া যায়।

দেশবাচক 'রে' যেমন একটী মৌলিক কারক বিভক্তি, দিগ বাচক 'তে' বোধ হয় সেইরূপই মৌলিক এবং গৌণ কারকের অর্থ প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয়। করণ ও সম্প্রদানের চিহ্ন রূপে এই 'তে' প্রত্যয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে। অপাদানার্থক 'খন্' 'খচ্' বা 'খনাক্' বোধহয় আর একটী মৌলিক প্রত্যয়। কিন্তু করণ ও সম্প্রদান বাচক 'ঠেন্ ও 'ঠেচ ' প্রত্যয় খুব আধুনিক এবং 'ঠাঁই' শব্দ হইতে সমুদ্ভূত। সজীব-নির্জ্জীব-ভেদে এই বিভক্তিসমূহের দ্বিবিধ শ্রেণীবিভাগ। কেবলমাত্র চতুর্থী বিভক্তি বা সম্প্রদান কারকের প্রত্যয়ের বিভিন্নতা ধরিয়া এই নপুংসক প্রত্যয় সমূহেরও আবার দ্বিবিধ শ্রেণীবিভাগ।

কারক বিভক্তি

	সজীব	নির্জীব
কর্ত্তৃককারক (১মা)	——	——
কর্ম্মকারক (২য়া)	——	——
করণকারক (৩য়া)	ঠেন্, তে, হতেতে	তে
সম্প্রদান (৪র্থী)	ঠেন্	ঠেন্, ঠেচ্
[কিন্তু কতিপয় প্রাচীন শব্দে 'তে' প্রত্যয়]		
অপাদান (৫মী)	থন্	থন্, থনাক, থচ্
সম্বন্ধ (৬ষ্ঠী)	রেন্	রেআক্, রেআঙ্, আক্, আঙ্, আ
অধিকরণ (৭মী)	রে	রে
সম্বোধন (৮)	এ (অব্যয়)	এ! (অব্যয়

শব্দরূপ

কোড়া (বালক) শব্দ—সজীব

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১২।	কোড়া	কোড়াকিন্	কোড়াকো
৩।	কোড়াঠেন	কোড়াকিনঠেন	কোড়াকোঠেন,
	-তে,-হতেতে	তে, হতেত	-তে,-হতেতে
৪।	কোড়াঠেন	কোড়াকিন্ঠেন	কোড়াকোঠেন্
৫।	কোড়াথন্	কোড়াকিন্থন্	কোড়াকোথন্
৬।	কোড়ারেন্	কোড়াকিন্রেন্	কোড়াকোরেন্*
৭।	কোড়ারে	কোড়াকিন্রে	কোড়াকোরে
৮।	এ কোড়া!	এ কোড়াকিন্!	এ কোড়াকো!

বুরু (পর্ব্বত) শব্দ—নির্জীব

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১।২।	বুরু	বুরুকিন্	বুরুকো
৩ ৪।	বুরুতে	বুরুকিন্তে	বুরুকোতে
৫।	বুরুথন্,-থচ্,-থনাচ্	বুরুকিন্, থন্, থচ্, থনাচ্	বুরুকোথন্, থচ্ থনাচ্
৬।	বুরু রেআক্, বুরুরেআঙ্, বুরু আক্, বুরুআঙ্, বুরুআ -রেন্ *	বুরুকিন্রেআক্,-আঙ্, রেআক্,-আক্,-আ -রেন্ *	বুরুকো-রেআক্,-রেআঙ্, আঙ্,-আক্, আ -রেন্ †
৭।	বুরুরে	বুরুকিন্রে	বুরুকোরে
৮।	এ বুরু!	এ বুরুকিন্!	এ বুরুকো!

---

* এই-রেন্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ বিশেষণ পদ বলিয়া গণ্য। সুতরাং ইহার পরস্থিত বিশেষ্যের প্রকৃতি অনুসারে বচন বাচক কিন্ ও কো প্রত্যয় জুড়িতে হইবে। বালক দুইটার দুইটী ঘোড়া = কোড়া-কিন্-রেন্-কিন্ সাদম্; বালক দুইটার অনেক ঘোড়া=কোড়া-কিন্-রেন্-কো সাদম্; ইত্যাদি।

† পরবর্ত্তী বিশেষ্য পদের প্রকৃতি অনুসারেই বিশেষণ পদের সজীব-নির্জীবতা বা লিঙ্গ নির্দ্ধারিত হইবে। যথা, বুরুরেন্ কাড়া = পার্ব্বত্য মহিষ।

চতুর্থী বিভক্তিতে আধুনিক যুগে 'তে' প্রত্যয় স্থানে ঠেন প্রত্যয়ের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু বুরু প্রভৃতি শব্দে সে প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় না।

সর্ব্বনাম

উত্তম পুরুষের সর্ব্বনাম (অস্মদ্)

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১।২।	ইঙ্	আলিঙ্ [আলাঙ্]	আলে [আবোন্, আবো]
৩।	ইঙ্‌তে, ইঙ্‌হতেতে, ইঙ্‌ঠেন, ইঙ্‌ঠেচ	আলিঙতে, আলিঙহতেতে আলিঙঠেন, আলিঙঠেচ্	আলেতে, হতেতে, ঠেন, ঠেচ্
৪।	সেন্, সেচ্	সেন্, সেচ্	আলেঠেন্, আলেঠেচ্, সেন্, সেচ্
৫।	ইঙখন্, ইঙখনকে, ইঙখচ্	আলিঙখন্, খনাক্,-খচ্	আলেখন্, খনাক্, খচ্
৬।	ইঙরেন্, [ইংরেন্‌কিন্, ইংরেন্‌কো-পরবর্ত্তী বিশেষ্য দ্বি ও বহুবচন হইলে] ইঙআক্, ইঙআঙ, ইঙ রেআক্, ইঙ রেআঙ	আলিঙরেন্ [রেন্‌কিন্, রেন্‌কো] আলিঙআক্,-আঙ-রেআঙ রেআক্	আলেরেন্ [রেন্‌কিন্, রেন্‌কো] আলে-আক্, আঙ, রেআক্ রেআঙ
৭।	ইঙরে, ইঙতালারে	আলিঙরে, আলিঙতালারে	আলেরে, আলেতালারে

মধ্যম পুরুষ (যুষ্মদ্)

১।২।	আম্	আবেন্	আপে
৩।	আম্‌তে, হতেতে আম্‌ঠেন্ ঠেচ্	আবেন্‌তে, হতেতে ঠেন্‌ঠেচ্	আপেতে, আপেহতেতে আপেঠেচ্ ঠেন্
৪।	আম্‌ঠেন্, আম্‌ঠেচ্ সেন্, সেচ	আবেন্‌ঠেচ্, সেন্ সেচ্	আপেঠেন্ ঠেচ্ সেন্, সেচ্
৫।	আম্‌খন্, খনাক্	আবেন্ খন্ খনাক্	আপেখন্, খনাক্
৬।	আম্‌রেন্ [রেন্‌কিন্, রেন্,কে] আক্ আঙ্ রেআক্ রেআঙ্	আবেন্‌রেন্ [রেন্‌কিন্ কো] আক্, আঙ্ রেআক্,	আপেরেন্, [কিন্, কো] রেআঙ্
৭।	আম্‌রে, আম্‌তালারে	আবেন্‌রে আবেন্‌তালারে	আপেরে, আপেতালারে

প্রথম পুরুষ (তদ্)

১।২।	আচ্	আকিন্	আকো
৩।	আচ্‌তে, হতেতে আচ্‌ঠেন্, ঠেচ্	আকিন্‌তে, হতেতে আকিন্‌ঠেন্, ঠেচ্	আকেতে, আকো-হতেতে আকোঠেন্, ঠেচ্
৪।	আচ্‌ঠেন্, ঠেচ্ সেন্, সেচ্	আকিন্‌ঠেন্, ঠেচ্ সেন্, সেচ	আকোঠেন্, ঠেচ্, সেন্ সেচ
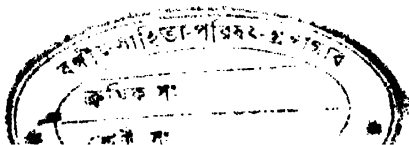
৫।	আচ্ থনাক্ খন্	আকিন্থন, খনাক্	আকোখন্, খনাক্
৬।	আচ্রেন্ [আচ্রেন্কিন্] আচ্রেন্কো, আচ্আক্, আচ্আক্, অচ্রেআক্ আচ্রেআক্	আকিন্রেন্ [রেন্কিন্, রেন্কো] আকিন্আক্, আঙ্রেআঙ রেআক্	আকোরেন্, [রেনকিন্, রেন্কো আক, আচ্রেঅং, রেআক্
৭।	অচ্রে, আচ্তালারে	আকিন্রে, আকিন্তালারে	অকোরে, আকোতালরে

সর্ব্বনাম প্রত্যয়।

এই সকল সর্ব্বনাম ও ইহাদের সংক্ষিপ্ত আকার শব্দ ও ধাতুর উত্তর প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত আকার নিম্নরূপ:—

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	ঙ্	লিঙ্ [লাঙ্]	লে [বোন্,বো]
মধ্যমপুরুষ	ম্	বেন্	পে
প্রথমপুরুষ	এ	কিন্	কো

ব্যঞ্জনান্ত শব্দ বা ধাতুর পরে সমগ্র সর্ব্বনামেরই উচ্চারণ হয় এবং মধ্যম পুরুষের একবচনে 'আম্' স্থানে 'এম্' বা 'মে' হয়। ক্রিয়াপদের শেষভাগে যখন ইহাদের অবস্থিতি হয়, তখন ইহারা 'পুরুষ' (বা person) বাচক। কিন্তু অন্যান্য স্থানে ইহারা সমাসের ন্যায় অনেকগুলি সর্ব্বনামের একত্র ব্যবহার হয়। কিন্তু সমাসের সহিত তাহাদের প্রভেদ এই যে সমাসের অন্তর্গত সকল শব্দের সমাবেশ সংস্কৃতাদি ভাষায় একটীমাত্র পদ গঠিত হয়, সাঁওতালী ভাষায় এই সকল পদের যোগে বাক্য গঠিত হয়। সময়ে সময়ে সেই সমস্ত বাক্যটীও পদরূপে বা প্রাতিপদিকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে সমস্ত বাক্যের অন্তর্গত সর্ব্বনাম-গুলি চারি কারকের বিভক্তি গ্রহণ করে—কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, সম্প্রদান ও সম্বন্ধ। সময়ে সময়ে অধিকরণ কারকও থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে বিভক্তি যোগে সর্ব্বনামের রূপ অন্যপ্রকার হয় যথা:—

উত্তম পুরুষ।

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১।২	ঙ্	লিঙ্ [লাঙ্]	লে [বোন্,বো]
৪।	আ-ঙ্	আ-লিঙ [-লাঙ্]	আ-লে [-বোন্,-বো]
৬।	তি-ঙ্	তা-লিঙ্ [তা-লাঙ্]	তা-লে [-বোন্,বো]

মধ্যম পুরুষ।

১।২	ম, এম্	বেন্	পে
৪।	আ-ম্	আ-বেন্	আ-পে
৬।	তা-ম্	তা-বেন্	তা-পে

প্রথম পুরুষ (সজীব)।

১।২	এ	কিন্	কো
৪।	আ-এ	আ-কিন্	আ-কো
৬।	তা-এ	তা-কিন্	তা-কো

নির্জীব-বাচক প্রথম পুরুষে 'এ' স্থানে 'ক্', 'আ-এ' স্থানে 'আ-ক্' এবং 'তা-এ' স্থানে 'তা-ক্' হয়।

ক্রিয়াপদ।

ক্রিয়াপদ রচনার পদ্ধতি অতি সরল হইলেও অতি বিচিত্র। আমাদেরই ন্যায় সর্ব্বনাম প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াপদ রচনা হয় বটে, কিন্তু একই ক্রিয়াপদের মধ্যে বহু সর্ব্বনাম পদ অন্তর্নিহিত থাকে। কর্ম্ম ও কর্ত্তৃপদ ত থাকেই, তাহা ছাড়া সম্বন্ধ ও সম্প্রদান কারকও এক ক্রিয়া পদের অভ্যন্তর ভাগের স্ফীতি সাধন করে। ইহা ছাড়া ক্রিয়াপদের অন্তর্নিহিত যাবতীয় সর্ব্বনাম গুলির লিঙ্গ ও বচন আছে, আর তাহার উপর আছে ক্রিয়াপদের বাচ্য-কালাদি বাচকরূপ

বিভিন্নতা। পীরেনিজ পর্ব্বতের উপত্যকায় যে বাস্ক্ (Basque Language) ভাষা প্রচলিত আছে তাহাতেও এই সাঁওতালী ভাষার ন্যায় ক্রিয়াপদে সর্ব্বনাম-সংযোজন-প্রণালী (the principle of pronoun-incorporation) দেখা যায়। যথা,—"দা-কার্-কি-ও-২" (=ইহা-বহন করি-নিকটে-তাহার-আমি, অর্থাৎ আমি ইহা তাহার কাছে লইয়া যাই), "না-কার্-সু" (=আমাকে—বহন কর-তুমি, অর্থাৎ তুমি আমায় লইয়া চল), 'হা-কার্ ৎ' (=তোমাকে-বহন করি আমি), "দা-কার্-সু-ৎ" (=ইহা—বহি-তোমাকে-আমি), 'না-বিল্' (=আমি যাই), 'হা-বিল্' (তুমি যাও) 'দা-বিল' (=সে যায়), 'হা-বিল্-কি-ৎ' (=তুমি-যাও-কাছে-আমি, অর্থাৎ তুমি আমার নিকট এস) ইত্যাদি। বাস্ক্ ভাষায় ক্রিয়া-মূল ধাতুটীর প্রয়োগ দ্বিতীয় স্থানে হয়, কিন্তু সাঁওতালী ভাষায় প্রথমেই ধাতুর প্রয়োগ এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাম কর্তৃপদের প্রয়োগ হয়। বাস্ক্ ভাষাতে কর্তৃপদের প্রয়োগ সর্ব্বশেষেই হইয়া থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র কর্তৃপদ ও ক্রিয়াপদের প্রয়োগ মিলন হইলে প্রথম স্থানে কর্তৃপদ ও দ্বিতীয় স্থানে ক্রিয়াপদ থাকে। সাঁওতালী ভাষায় কিন্তু ধাতু ও সর্ব্বনাম জুড়িয়া একত্র করিলে ধাতুর পদের কর্তৃ সর্ব্বনামের স্থান; আর যদি বঙ্গভাষার প্রভাবে কর্তৃপদ ও ক্রিয়াপদ পৃথক করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রথমে কর্তৃপদ ও পরে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ:—

আগু-কেৎ-তাম্-আ-কো [=আনয়ন-কৃত-তোমার-তাহারা, অর্থাৎ তাহারা তোমার (কোনও কিছু) আনয়ন করিয়াছে।]

কোম্ড়ো-আকাৎ তিঙ্-আ-কো [=চুরি-কৃত-আমার-তাহারা, অর্থাৎ তাহারা আমার (কোনও কিছু) চুরি করিয়াছে।]

আগু-কো-ম্ [=আনয়ন-তাহাদিগকে-তুমি, তুমি তাহাদিগকে আন।]

ঞেল্-কেৎ-কো-আ-ঙ্ [=দৃষ্টি-কৃত-তাহাদিগকে-আমি, আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছি।]

দাল্-এ-মে] =প্রহার-তাহাকে-তুমি, তাহাকে তুমি প্রহার কর।]

এদ্রে আৎ-কো-আ এ [=ক্রোধ-কৃত-তাহাদিগের প্রতি-সে, সে তাহাদের উপর চটিয়াছে]

হিঙ্সা-আদ্-ইঙ্-আ-এ [=হিংসা-কৃত-আমাকে-সে, সে আমার হিংসা করিয়াছে।

এ স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে সাঁওতালী (অথবা বাস্ক্) ভাষায় ক্রিয়াপদের অঙ্গ মধ্যে বিশেষ্য বা বিশেষণের স্থান নাই; ক্রিয়াপদের মধ্যে কেবল বহু সংখ্যক সর্ব্বনাম অন্তর্নিহিত থাকিতে পারে। ঠিক এই কারণেই বাস্ক্ ভাষাকে সর্ব্বনামসংযোজী (বা pronoun-incorporating) ভাষা বলা হয়। সুতরাং সাঁওতালী ভাষাকেও আমরা সর্ব্বনাম-সংযোজী ভাষা বলিব।

সাঁওতালী ক্রিয়াপদের ৫ বাচ্য (voice), ৬ ভাব (mood), ২৩ কাল (tense), ২ লিঙ্গ, ৪ বচন, ৩ পুরুষ, (person), ৪ কারক (cases), ৩ রূপ (form), ও ২ গঠন প্রণালী (conjugation)। সুতরাং কেবল মাত্র বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের জ্ঞান লইয়া সাঁওতালী ক্রিয়া-রচনা-প্রণালী বুঝা যাইবে না। আমাদের দেশের অনেকেই সাঁওতালদিগের ক্রিয়ার এই বৈচিত্র না জানিয়াও তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন, এবং বলেন যে সাঁওতালী ভাষা খুব সোজা। কিন্তু তাঁহারা সাঁওতালী ক্রিয়াপদের প্রকৃত পরিচয় জানেন না এবং জানিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের নিকট সাঁওতালী ভাষা সোজা বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদিগের এ ধারণার আরও একটা কারণ আছে। সাঁওতালদিগের ক্রিয়ার গঠন প্রণালীও দ্বিবিধ!—সগর্ভ ও শূন্যগর্ভ। শূন্যগর্ভ ক্রিয়াপদের রচনা বাঙ্গালা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষারই অনুরূপ বটে; ইহাতে কর্তৃ-কর্ম্মাদি কারক ক্রিয়াপদ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। যেমন, "হাকোকো সাপাপ্ কানা" (=মাছ-তাহারা-ধরিতেছে) অর্থাৎ তাহারা মাছ ধরিতেছে; "পাণ্ডু এ বাঁলাকা" (=পাণ্ডু-সে যাবে) অর্থাৎ পাণ্ডু যাইবে। দ্বিতীয় উদাহরণের 'পাণ্ডু এ' পদের

'এ' কর্ত্তৃকারকের একবচনের প্রত্যয়বৎ প্রযুক্ত হয়। * কিন্তু এটী সর্ব্বনাম-প্রত্যয়, অর্থ 'সে'। এ-সকল স্থলে আর্য্যভাষা সমূহের ক্রিয়া-রচনা-প্রণালী ও সাঁওতালী ক্রিয়া-রচনা-প্রণালী কোনও প্রভেদ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু সগর্ভ ক্রিয়াপদের রচনা প্রণালী আর্য্যভাষা ভাষীর নিকট অতি বিচিত্র। এ প্রকার রচনার উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারের ক্রিয়া পদেই বহু সর্ব্বনাম পদ অন্তর্নিহিত থাকে, যাহা বাঙ্গালীর নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই সর্ব্বনাম-সংযোজী ক্রিয়াপদ রচনাই বোধ হয় সাঁওতালী ভাষার অতি প্রাচীন লক্ষণ। শূন্যগর্ভ ক্রিয়াপদ বোধ হয় পর-প্রভাব-সম্ভূত। পীরেনীজ্ পর্ব্বতনিবাসী বাস্ক্ জাতির সহিত সাঁওতাল পরগণার পাহাড়িয়া জাতির কখনও কোনও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মিলন ঘটিয়াছিল কি না এখন তাহা জানিবার কি উপায় আছে?

সাঁওতালী ক্রিয়ার কাল ভবিষ্যৎ হইতে আরম্ভ হইয়া পরোক্ষায় শেষ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ হইতে পরোক্ষা পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে পনরটী বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। সময়ের পরিমাণ করিতে হইলে এই পনরটী স্তরের কল্পনা চাই। ভবিষ্যৎকালের কোনও প্রত্যয় নাই, ধাতুমাত্রের উচ্চারণের ভবিষ্যৎ কাল বুঝায়। অন্যান্য কালের প্রত্যেকটীতে পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যয় আছে। সে প্রত্যয় ধাতুর পরেই জুড়িতে হয়। এ প্রত্যয়ে কেবলমাত্র কালই বুঝায়। পুরুষ, বচন ও লিঙ্গাদি বুঝাইতে সর্ব্বনাম প্রত্যয় আবশ্যক হয়। তাহা কালবাচক প্রত্যয়ের পরে বসে। উদাহরণ :—

দাল্ = প্রহার করা।

১। ভবিষ্যৎ—দাল্-আ-এ = সে মারিবে। [কর্ম্ম নির্জীবলিঙ্গ হইলে এইরূপ। সজীবলিঙ্গ হইলে অন্যরূপ কর্ম্ম চাই।]

২। ভবিষ্যৎ-পূর্ব্ব—দাল্-লে-গি-এ = সে প্রথমে মারিবে। [তারপর অন্য কিছু ঘটিবে।]

৩। অনারব্ধ ভবিষ্যৎ—দাল্-লাগিদ্-এ = সে মারিবার উপক্রম করিবে।

৪। অসম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ—দাল্-আকাএ-তাহেন্-আ-এ = সে মারিতে থাকিবে। [মারা আরম্ভ হইবে, শেষ হইবে না।]

৫। বর্ত্তমান—দাল্-এদ্-আ-এ = সে মারে।

৬। অসম্পূর্ণ বর্ত্তমান—দাল্-এদ্-কান্-আ-এ = সে মারিতেছে। [কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, শেষ হয় নাই।]

৭। অনারব্ধ বর্ত্তমান—দাল্-লাগিদ্-ওক্-কান্-আ-এ = সে মারিতে উদ্যত। [প্রস্তুত হইয়াছে আরম্ভ করে নাই।]

৮। অদূরবর্ত্তী অতীত—দাল্-কেদ্-আ-এ = সে মারিয়াছে, বা মারিল।

৯। দূরবর্ত্তী অতীত—দাল্-লেদ্-আ-এ = সে মারিয়াছিল। [কোনও কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে।]

১০। অসম্পূর্ণ অতীত—দাল্-এদ্-তাহেঁ-কান্-আ-এ = সে মারিত, বা মারিতেছিল।

১১। " " (বিশিষ্ট প্রয়োগ)—দাল্-এদ্-কান্-তাহেঁকান্-আ-এ = সে প্রহার চালাইতেছিল। [অনেকক্ষণ ধরিয়া।]

১২। অনারব্ধ অতীত—দাল্-লাগিদ্-ওক্-কান্-তাহেঁকানাএ = সে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল।

১৩। অসম্পূর্ণ দূরবর্ত্তী অতীত—দাল্-লেদ্-তাহেঁকান্-আ-এ = সে মারিতে আরম্ভ করিয়াছিল। [কোনও কিছুর পূর্ব্বে]

১৪। অসম্পূর্ণ দূরবর্ত্তী অতীত—দাল্-আকাদ্-তাহেঁকান্-আ-এ = সে মারিয়া ফেলিতেছিল।

১৫। অতি দূরবর্ত্তী অতীত (পরোক্ষণ)—দাল্-আকাদ্-আ-এ = সে [বহু পূর্ব্বে] মারিয়া ফেলিয়াছিল।

---

* মাগধী প্রাকৃতের প্রথমার একবচনের 'এ' প্রত্যয়ের সহিত এই প্রত্যয়ের কোনও সম্পর্ক আছে কি?

এই পনরটীকেই সময়ানুগামী কাল বলা যায়। তবে আরও অনেক কাল সাঁওতালী ক্রিয়ার আছে। যথা:—

১৬। ইচ্ছাবাচক—দাল্-কে-আ-এ = সে মারিতে পারে। [তাহার ইচ্ছা হইলে]

১৭। সম্ভাবনা বাচক—(অহ্) দাল্-লে-আ-এ = সে মারিতে পারে [না]। [সম্ভাবনা নাই]

১৮। অনিশ্চয়তাবাচক—দাল্-কেৎ-পি-এ = যদি সে মারে বা মারিত। [ঘটনাক্রমে।]

পূর্ব্ব কালতা-বাচক

১৯। তিরস্কার—দাল্-লে-আহিঁ-এ = প্রথমেই তাহার মারা উচিত। [তিরস্কার]

২০। অনুরোধ—দাল-লে-বা-এ = প্রথমেই সে মারিলে ভাল হয়।

২১। অনুমতি—দাল্-লে-এন্-আ-এ = আচ্ছা, সে প্রথমেই মারুক।

২২। আদেশ—দাল্-লে-ম্ = প্রথমেই তুমি মার। [মধ্যম পুরুষ না হইলে আদেশ হয় না]

২৩। আশীর্ব্বাদ—দাল্-লে-আ-ম্ = তুমি যেন প্রথমেই মারিতে পাও। [মধ্যম পুরুষ]

২৪। আশীর্ব্বাদ—দাল্-মা-ম্ = তুমি যেন মারিতে পার।

২৫। আদেশ—দাল্-মে = মার।

২৬। তুমর্থক—দাল্ = মারিতে।

সাঁওতালী ক্রিয়ার পাঁচ বাচ্য ও তিন রূপ।

১। কর্ত্তৃবাচ্য—

ক। ক্রিয়া মাত্র বাচক রূপ:—দাল্-এৎ-কো-কান্-আ-এ = সে তাহাদিগকে মারিতেছে। ডাড়েৎকানাএ = সে দৌড়াইতেছে।

খ। সংরক্ষণ বাচক রূপ:—দাল্-কা কো কানাএ = সে তাহাদিগকে মারিয়া রাখিতেছে।

গ। আতিশয্যবাচক রূপ:—আম দাদল্ কানা = সে তোমাকে খুব মারিতেছে।

২। অন্যোন্য বাচ্য:—

ক। ক্রিয়ামাত্র বাচক রূপ:—দাপাল্এৎ কানাএ = সে মারামারি করিতেছে।

খ। সংরক্ষণ বাচক:—দাপাল্ কাক্ কানাএ = সে মারামারি করিয়া রাখিতেছে।

গ। আতিশয্য বাচক:—দাক্পাল্ কানাএ = সে খুব মারামারি করিতেছে।

৩। আত্মনেপদ বাচ্য:—

ক। ক্রিয়ামাত্র বাচক:—দাল্ ওক্ কানাএ = সে নিজেই নিজেকে মারিতেছে। গুজুক্ কানাএ = সে মরিতেছে।

খ। সংরক্ষণ বাচক রূপ:—দাল্ কোক্ কানাএ = সে নিজকে মারিয়া রাখিতেছে।

গ। আতিশয্য বাচক—দাল্ ওগ্ ওক্ কানাএ = সে নিজকে খুব মারিতেছে।

৪। ব্যতীহার বাচ্য:—

ক। ক্রিয়ামাত্র বাচক রূপ:—দাপাল্ ওক্ কানাএ = পরস্পরের মধ্যে মারামারি (অর্থাৎ যুদ্ধ) করিতেছে।

খ। সংরক্ষণ বাচক:—পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।

৫। কর্ম্ম কর্ত্তৃ বাচ্য:—হোড়াএ ইরোক্ কানা—ধান কাটিতেছে।

[= ধান সে কাটা বর্ত্তমান।]

সাঁওতালী ক্রিয়ার পাঁচ ভাব, দুই লিঙ্গ ও তিন বচন।

পাঁচ ভাব;—১। সূচনা (Indicative):—দাল্আ এ = সে মরিবে।

২। কল্পনা (Subjunctive):—দাল্ খান্ এ = যদি সে মারে।

৩। কামনা (Benedictive):—দাল্ চো এ = সে মারুক।

৪। অনুজ্ঞা (Imprative):—দাল্ মাম = তুমি মারিও। দাল্মে = মার।

৫। অপূর্ণতা (Infiintive):—মুর্মুএ দাল্এ সেনা কানা = সে মুর্মুকে মারিতে গিয়াছে।

দুই লিঙ্গ ও তিন বচনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। লিঙ্গ ও বচন দ্রষ্টব্য।

অতঃপর ক্রিয়ার অন্তর্বর্ত্তী কারকের কথা। সাঁওতালী ক্রিয়া পদ গঠনে সর্ব্বনামের চারিটী কারক অন্তর্নিবিষ্ট হয়; কর্ত্তৃকারক, কর্ম্মকারক, সম্প্রদানকারক ও সম্বন্ধকারক। তবে এক সঙ্গে চারিটী কারকের ব্যবহার হয় না। সর্ব্বনাম পদের সহযোগে নিম্নলিখিত নয় প্রকার ক্রিয়াপদ গঠিত হয়:—

১। কর্ত্তৃকারক যোগে—দাল্ আ এ=সে মারিবে।

২। কর্ত্তৃকারক ও সম্বন্ধকারক যোগে—দাল্-তাএ-আএ =সে তাহার লোককে মারিবে।

৩। একটী কর্ত্তৃকারক ও দুইটী সম্বন্ধকারক যোগে—দাল্-তাএ-তিঙ্ আএ=সে তাহার লোককে মারিবে যে আমারও লোক।

৪। কর্ত্তৃকারক ও সম্প্রদানকারক যোগে—দাল্ আএ আএ =সে তাহার জন্য মারিবে।

৫। কর্ত্তৃ, সম্প্রদান ও সম্বন্ধ যোগে—দাল্ আএ তাএ আএ=সে তাহার জন্য মারিবে যে তাহারই।

৬। কর্ত্তৃ, সম্প্রদান ও দুইটী সম্বন্ধকারক যোগে—দাল্ আএ-তাএ তিঙ্-আএ=সে তাহার জন্য মারিবে যে তাহার জন্য মারিবে যে তাহার ও আমার।

৭। কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম যোগে—দাল্ কো আ এ=সে তাহাদিগকে মারিবে।

৮। কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও সম্বন্ধ—দাল্-এ-তাএ-আএ=সে তাহাকে মারিবে যে তাহার।

৯। কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও দুইটী সম্বন্ধ—দাল্ এ তাএ তিঙ আএ =সে তাহাকে মারিবে যে তাহার ও আমার।

সময়ে সময়ে ক্রিয়াপদের সর্ব্বনাম-বিচ্ছিন্ন-রূপ পাওয়া যায়। সেটা বোধ হয় পর প্রভাব জাত লক্ষণ। তবে এ লক্ষণ বিশেষভাবে আতিশয্য বাচক ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ। মৌখিক ভাষায় সাঁওতালেরা এখন বিচ্ছিন্ন রূপই ব্যবহার করে। কালক্রমে বোধ হয় তাহাদের ভাষার সর্ব্বনাম-সংযোজী ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াও যাইতে পারে। বিচ্ছিন্ন রূপের উদাহরণ—ওন্ কোএ দাদল্ আ=তাহাদিগকে সে খুব মারিবে।

সংখ্যা গণনা

গণ্ডা, পণ, কাহণ, কুড়ি প্রভৃতি নানা প্রণালীতে আমাদের সংখ্যা গণনা হইয়া থাকে, রোমানদের মধ্যে পাঁচ পাঁচ করিয়া অর্থাৎ পাঞ্চমিক প্রণালীতে সংখ্যা গণনা হইত। আমেরিকার মায়া জাতির মধ্যেও পাঞ্চমিক গণনা ছিল। এই সকল গণনা প্রণালী অপেক্ষা দশমিক গণনা প্রণালী (অর্থাৎ দশ, শত, সহস্র, ইত্যাদি ক্রমে গণনা) যে উৎকৃষ্ট ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আবিষ্কৃত সে বিষয়ে এখন মতদ্বৈধ নাই। এটা আর্য্যগণের আবিষ্কার। আর্য্য গণের দশমিক গণনা প্রণালী সাঁওতালদিগের মাথায় গিয়া একটা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। শত সহস্রাদি উচ্চ সংখ্যার কল্পনা করিতে না পারিয়া তাহারা 'বিশ' 'বিশ' করিয়া সংখ্যা গণনা করে। তাহাদের হিসাবে 'বিংশ'ই উচ্চ সংখ্যা এব বিশ-বিশ অর্থাৎ চারি শতের (২০×২০=৪০০) অধিক সংখ্যা তাহাদের কল্পনায় আসে না। নিকোবর বাসিদিগের ভাষাতেও ঠিক এই রীতি দেখা যায়। তাহাদেরও কুড়ি কুড়ি করিয়া গণনা এবং সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪০০। সাঁওতালী সংখ্যার নাম এই প্রকার:—

১। মিৎ=এক
২। বার্=দুই
৩। পে=তিন
৪। পুনিয়া=চারি
৫। মোড়ে=পাঁচ
৬। তুড়ুই=ছয়
৭। ইয়াই=সাত
৮। ইরাল্=আট
৯। আড়ে=নয়
১০। গেল্=দশ
১১। গেল্-মিৎ=এগার
১২। গেল্-বার্=বারো
১৩। গেল্-পে=তেরো
১৪। গেল্-পুনিয়া=চৌদ্দ
১৫। গেল্-মোড়ে=পনর
১৬। গেল্ তুড়ুই=ষোল
১৭। গেল্-ইয়াই=সতর
১৮। গেল্-ইরাল=আঠার
১৯। গেল্-আড়ে=উনিশ
২০। মিৎ-ইসি=এক কুড়ি
২১। মিৎ ইসি মিৎ=এককুড়ি এক =একুশ
২৫। মিৎ ইসি মোড়ে=এক কুড়ি পাঁচ=পঁচিশ
৩০। মিৎ ইসি গেল্=এক কুড়ি দশ ত্রিশ
৪০। বার্ ইসি=দুকুড়ি=চল্লিশ।
১০১। মোড়ে ইসি মিৎ=পাঁচ কুড়ি এক=১০১।
৪০০। ইসি ইসি=কুড়ি কুড়ি।

ইহা অপেক্ষা উচ্চ সংখ্যা ইহাদের মাথায় ধরে না। এখন ইহারা 'শ' (=১০০) কথাটীর ব্যবহার করিতেছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

—(*)—

প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক কথা।

মুরা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চন্দ্রগুপ্তদেবের পিতৃনাম আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের কোথায়ও নাই। নন্দবংশের উচ্ছেদের পরে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

(ক) "মহাপদ্মস্য পর্য্যায়ে ভবিষ্যন্তি নৃপাঃ ক্রমাৎ ॥৩২॥
উদ্ধরিষ্যতি তান্ সর্বান কৌটিল্যো বৈ দ্বিরষ্টভিঃ।
ভুক্ত্বা মহীং বর্ষশতং নন্দেন্দুঃ স ভবিষ্যতি ॥৩৩॥
চন্দ্রগুপ্তং নৃপং রাজ্যে কৌটিল্যঃ স্থাপয়িষ্যতি।"
বায়ুপুরাণ, ৯৯তম অধ্যায়, (বঙ্গবাসী)

(খ) "মহাপদ্মস্য পর্য্যায়ে ভবিষ্যন্তি নৃপাঃ ক্রমাৎ ॥২০॥
উদ্ধরিষ্যতি কৌটিল্যঃ সমা দ্বাদশভিঃ সুতান্।
ভুক্ত্বা মহীং বর্ষশতঃ ততো মৌর্য্যান্ গমিষ্যতি॥২১॥"
মৎস্যপুরাণ, ২৭২তম অধ্যায়, (বঙ্গবাসী)

(গ) "মহাপদ্মপুত্রাশ্চৈকং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥২৫॥
ততশ্চ নবৈচতান্নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃসমুদ্ধরিষ্যতি ॥২৬॥
তেষামভাবে মৌর্য্যাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ॥২৭॥
কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তমুৎপন্নং রাজ্যে হভিষেক্ষ্যতি ॥২৮॥
বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪তম অধ্যায়, (বোম্বাই)।

(ঘ) "শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ ॥১০॥
তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানঃ স্ম শতং সমাঃ ॥১১॥
নব নন্দান্দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥১২॥
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।"
শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, ১২শ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায় (বোম্বাই)

এই বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণই মহাপুরাণ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া প্রাচীন এবং নব্য ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। পুরাণগুলির পাঠে অনেক গোলমাল থাকিলেও মোটের উপর চারিখানিতেই একরূপ ঐতিহ্যই গৃহীত হইয়াছে। "মগধের শেষ নাগ অথবা শিশুনাগবংশীয় শেষ রাজা 'মহাপদ্ম' অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি "মহাপদ্ম নন্দ" নামে বিখ্যাত ছিলেন; তিনি এবং তাঁহার পর তাঁহার সুমালী (সুমাল্য) প্রমুখ অষ্ট পুত্র (এই নয় জন নন্দ মোট একশতবর্ষ পৃথিবী ভোগ করিলে নর কৌটিল্য নামক ব্রাহ্মণ নন্দগণকে উচ্ছেদ (১৫) করিবেন এবং নন্দগণের অভাবে পৃথিবী 'মৌর্য্য'গণের অধিকৃত হইবে। কৌটিল্য ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।"

পাঠক মহাশয় লক্ষ্য করিবেন যে উপরিকৃত চারিখানি পুরাণের মধ্যে প্রথমখানিতে (বায়ুপুরাণে) "মৌর্য্য" কথাটি নাই, কিন্তু বাকি তিন খানিতেই "মৌর্য্য" কথাটি বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই আমরা মর্ম্মানুবাদে "মৌর্য্যগণ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে কোনও পৌরাণিক গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের পিতৃনাম পাই নাই। প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী "চন্দ্রগুপ্তমুৎপন্নং" (বিষ্ণুপুরাণের উদ্ধৃত অংশ দেখুন) শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, "চন্দ্রগুপ্তমুৎপন্নং নন্দস্যৈব ভার্য্যায়াং মুরা সংজ্ঞায়াং জাতম্" অর্থাৎ "নন্দের 'মুরা' নাম্নী ভার্য্যার জাত পুত্র" ইতি। এই ঐতিহ্য তিনি যে কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের অনুমান হয় যে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের তদ্ধিত প্রত্যয় অনুসারে "মুরার পুত্র মৌর্য্য" এই নিরুক্তি স্থির করিয়া উক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার অনুকারী "বিষ্ণুচিত্তী" নামক অন্য এক টীকার কর্ত্তা শ্রীধর স্বামীর উপর

(১৫) প্রাচীন রাজনৈতিক ভাষায় "উদ্ধার" শব্দে "উচ্ছেদ" অথবা "ধ্বংস সাধন বুঝায়।"

আরও রঙ চড়াইয়া লিখিয়াছেন, "চন্দ্রগুপ্তং নওস্যৈব শূদ্রায়াং মুরায়াং জাতং মৌর্য্যানাং প্রথম"—অর্থাৎ "নন্দের শূদ্রজাতীয়া (স্ত্রী অথবা দাসী ?) মুরাতে জাত মৌর্য্যগণের প্রথম যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে"—শ্রীধর স্বামী মুরাকে "নন্দরাজের ভার্য্যা" বলিয়াছিলেন এই টীকাকার ভট্টাচার্য্য আবার তাঁহাকে "নন্দরাজের শূদ্রা" এই অদ্ভুত আখ্যা দিয়াছেন। এই উত্তর টীকাকারের প্রদত্ত নিরুক্তিই কাল্পনিক, কেবল ব্যকরণের উপর নির্ভর করিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল। তথাচ, এই ভারতীয় পণ্ডিতগণের" এইরূপ কাল্পনিক কথার উপর নির্ভর করিয়াই, য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্তকে নীচ জাতীয়া মুরার (নন্দরাজের উপপত্নীর) গর্ভজ পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং পুনশ্চ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ঐ কথারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করত উক্ত কাল্পনিক কথাকে প্রামাণ্য এবং সুপ্রমাণিত ঐতিহাসিক তথ্যের আকারে ইতিহাস-শিক্ষার্থীগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অভ্যাস করিতে করিতে মিথ্যাকথাও সত্যের মত প্রতীত হয়, এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে।

অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীধর স্বামীপাদ-প্রমুখ টীকাকারগণের নিকট এই "মৌর্য্য" শব্দ নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবীমাহাত্ম্য অথবা সপ্তশতীচণ্ডীর উপাখ্যানে "মৌর্য্যগণ" এক প্রকার অসুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তথায় অসুররাজ শুম্ভের সেনাদলের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে,—

> "কালকা দৌহৃদা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ—
> যুদ্ধায় সজ্জা নির্য্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতামম ॥৫॥"
>
> মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮৮তম অধ্যায় (চণ্ডীর ৮ম অধ্যায়
> (বঙ্গবাসী)

অর্থাৎ অসুর রাজ শুম্ভ আদেশ দিতেছেন,—"আমার আদেশে কালক, দৌহৃদ, মৌর্য এবং কালকেয় অসুরগণ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ত্বরায় গমন করুণ।" টীকাকার পণ্ডিতেরা এখানে আর "মুরার পুত্র মৌর্য" এই নিরুক্তি করিতে পারেন নাই; তাঁহারা এই মৌর্যদিগকে "প্রসিদ্ধ 'মুর' নামক অসুরের বংশসম্ভূত" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে (অসুর দেশে বা আসীরিয়ায়) 'মৌর্য' নামে বিখ্যাত একদল অসুর বাস করিতেন। ভারতখণ্ডের "মোহণ্ডিকের ময়ুরগণ" (মহাভারত সভাপর্ব্ব, ১৪শ পাদ টীকা) পিপ্পলীবনের "মোরিয়গণ (৯ম পাদটীকা), মগধের 'মৌর্যবংশ', উত্তর কোঙ্কন এবং মেবাড়ের 'মোরিগণ (১০—১৩ সংখ্যাক পাদটীকা) এবং ময়ূর ভঞ্জের 'ময়ুরবংশ' ইত্যাদি নামে বিখ্যাত রাজকুলের সহিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণিত অসুর 'মৌর্য' গণের কোন সম্বন্ধ ছিল অথবা থাকিতে পারে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত অথবা অশোকের নির্ম্মিত পাটলিপুত্রের প্রাসাদের ধ্বংশ-শেষের সহিত প্রাচীন পারস্যের পারসিপোলিশের বিখ্যাত প্রাসাদের (গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার অগ্নি সংযোগে যাহার ধ্বংশ-সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন) তুলনা করিয়া মগধের মৌর্য রাজবংশের সহিত প্রাচীন পারস্যের যে নৈকট্য সংস্রবের কল্পনা ডাক্তার স্পুনার করিয়াছিলেন, তাহাকে একেবারে উপেক্ষা করাও বোধ হয় উচিত নহে। অতি প্রাচীনকালে পারস্যের সহিত ভারত খণ্ডের যে নানা বিষয়ে নিতান্ত নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

যাহা হউক, এপর্য্যন্ত যত দূর আলোচনা করিয়াছি, তাহার ফলে বলিতে পারি যে চন্দ্রগুপ্তকে মুরা নাম্নী নারীর গর্ভজ পুত্র এবং সেই নারীর নাম হইতে তাঁহার বংশোপাধি 'মৌর্য' শব্দের উৎপত্তির প্রবাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চন্দ্রগুপ্তের পিতার নাম কোন পুরাণে নাই; নন্দরাজা যে তাঁহার পিতা ছিলেন, তাহা টীকাকারগণের কথা। এই কথার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে সংস্কৃত ভাষার উপকথা অথবা গল্পের সমুদ্র বিশেষ "কথা সরিৎ-সাগর" নামক পুস্তকে লিখিত আছে,—

"হত্বা হিরণ্যগুপ্তংচ শকটালেনচ তৎসুতম্।
পূর্ব্বনন্দ-সুতে লক্ষ্মী-চন্দ্রগুপ্তে প্রনিবেশি-
তা ॥১২৩॥'
কথা সরিৎ সাগর, কথাপীঠলম্বক, পঞ্চমতরঙ্গ।
(বোম্বাই।)

ইহার অর্থ এই, "শকটাল হিরণ্যগুপ্ত এবং তাঁহার পুত্রকে বধ করিয়া পূর্ব্বনন্দ-পুত্র চন্দ্রগুপ্তের হস্তে রাজলক্ষ্মীকে অর্পণ করিয়াছিলেন।" এই গল্পে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠা কৌটিল্য বা চাণক্যের পরিবর্তে "শকটাল" নামক এক ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। মগধরাজ নন্দের মহামন্ত্রী "শকটাল" অথবা "শকটার" সম্বন্ধে দেশে অনেক প্রাচীন গল্প আছে। কথা সরিৎ-সাগরে আবার বৈয়াকরণ পাণিনি, বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ও কবি গুণাঢ্যকে (যিনি কলাপ ব্যাকরণের এবং কথা সরিৎ সাগরের মূল, পৈচাশী ভাষায় রচিত—বৃহৎকথার কর্ত্তা) একত্র এক সময়ে বিগুমান এবং পরস্পরের পরিচিত এবং বন্ধু বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই পুস্তকের কোন গল্পকেই "ইতিহাস" বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাতে কত যে আষাঢ়ে এবং আজগুবি গল্প আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভূত প্রেতের সহিত মানুষের নিত্য সাক্ষাৎকার পরস্পর কথোপকথন এবং এক মানুষের অন্য মানুষের শবদেহে প্রবেশ ইত্যাকার গল্প খুব গম্ভীর ভাবে ইহাতে বলা হইয়াছে। উপরে লিখিত শ্লোকে বলা হইতেছে যে 'শকটালের কৌশলে (নন্দ নহেন কিন্তু) সপুত্র হিরণ্যগুপ্ত নিহত এবং চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলনে,—এবং এই চন্দ্রগুপ্ত কোন পূর্ব্ব নন্দের পুত্র'। এই পূর্ব্ব নন্দ যে কে,—তাহা এই পুস্তকে নাই, অথচ এই গল্প হইতেই চন্দ্রগুপ্ত মহারাজকে নন্দরাজের (ঔরস অথবা উপপত্নীর গর্ভজ) পুত্র বলিয়া আমাদের দেশের টীকাকার ও গল্প লেখকগণ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ অসাবধান-ভাবে 'গল্পকে' প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করার ফলেই নানাপ্রকার অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহাই হউক, "কথাসরিৎ সাগরে" আমরা মুরাকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে কবি বিশাখদেব প্রণীত "মুদ্রারাক্ষস নাটকে" (১৬) চন্দ্রগুপ্ত মহারাজের মাতা মুরার নাম আছে। আমরা বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়াও ঐ নাটকে "মুরার" কোন সংবাদ পাই নাই ঐ নাটকে মৌর্য্য, শব্দের ভূরি প্রয়োগ আছে (১৭), কিন্তু কোনও স্থানেও মৌর্য্যের মাতা যে 'মুরা' তাহা লিখিত হয় নাই।

'মুরার পুত্র বলিয়া যদি চন্দ্রগুপ্ত দেবকে 'মৌর্য' বলা মুদ্রা রাক্ষসের কবি বিশাখ দত্তের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি উক্ত রাজাকে "মৌর্যেন্দু" (অর্থাৎ মৌর্য কুলের চন্দ্র স্বরূপ) (১৮) এবং "মৌর্য পুত্র" (১৯) (মৌর্যের অথবা মৌর্য কুলের পুত্র), এবং তাঁহার রাজ্যশ্রীকে "মৌর্য কুলের

(১৬) একজন সংস্কৃতজ্ঞ মাননীয় বন্ধু প্রথমে আমাকে এই সংবাদ দিয়াছিলেন। পরে দেখি শ্রীমান্ বিমল চন্দ্র লাহা (এম, এ, ইত্যাদি) প্রণীত "Kshatriya Clans in Buddhist India" নামক নব প্রকাশিত গ্রন্থেও লিখিত আছে (২০৫ পৃষ্ঠা) যে কবি বিশাখদত্ত লিখিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত দেব নন্দরাজের উপপত্নী শূদ্রা মুরার গর্ভজ পুত্র (an illegitimate son of the last Nanda King by a Sudra woman named Mura)। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মূল নাটকে মুরার নাম পাই নাই। তবে টীকাকার (শ্রীধর স্বামী-প্রমুখ পণ্ডিতের পদানুসরন করত) মৌর্য্য শব্দে মুরার পুত্র লিখিয়াছেন। টীকাকারের উপর নির্ভর করিয়া কবি বিশাখদেবের নাম গ্রহণ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

(১৭) মৌর্যেন্দু (১ম অঙ্ক, ৭ম শ্লোক), মৌর্যে (১।১৩) মৌর্যকুলস্য (২।২) মৌর্যপুত্রে (২।৬) মৌর্যং (২।৭) মৌর্য (২।৯) মৌর্যস্য (২।১২।১৬ মৌর্যং (২।২১) মৌর্যে (২।২৩) মৌর্য-বৃষলম্, মৌর্যেন্দু (৩।১১,১৩) নন্দ মৌর্যনৃপয়ো (৩।১৭) মৌর্য (৩।৩১, ৫।৫, ৫।১৮, ৫।২২) ইত্যাদি। এই অঙ্কগুলির প্রথম গুলি অঙ্কের এবং শেষের গুলি শ্লোকের সংখ্যা।

(১৮) মৌর্যেন্দু (১ম অঙ্ক ৭ম এবং তৃতীয় অঙ্কের ১১শ ও ১৩শ শ্লোক)।

(১৯) মৌর্যপুত্র (২য় অঙ্কের ৬ষ্ঠ শ্লোক

রাজলক্ষ্মী" (২০) বলিয়া কখনই পরিচিত করিতেন না। সকলেই অবগত আছেন যে মুরার পুত্রকে 'মৌর্য' বলা গেলেও তাঁহাকে "মৌর্যের পুত্র" "মৌর্যকুলের" এবং "মৌর্যকুলের শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি উপাধি দ্বারা পরিচিত করা যাইতে পারে না। ইহা হইতে আমাদের মনে হয় যে কবি বিশাখদেব চন্দ্রগুপ্ত দেবকে মৌর্যকুলের সন্তান বলিয়াই জানিতেন এবং তজ্জন্যই তাঁহাকে উক্তরূপ বিশেষণ দ্বারায় ভূষিত করিয়াছেন।

"বৃহৎ কথা" অথবা তাহার সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ "কথা সরিৎ সাগর" গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে যেরূপ কোন পূর্ব্ব নন্দ রাজার পুত্র বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে, মুদ্রা রাক্ষসের কবিও তাহা করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ রাজের 'প্রতি-পালিত' (২১) এবং 'নন্দ রাজের পুত্র' (২২) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঐতিহ্যও তিনি সম্ভবতঃ উক্ত কথা সরিৎসাগর হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কবি বিশাখ দেব মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য-কুলের সন্তান রূপে পরিচিত করিয়াও তাঁহাকে আবার নন্দ-রাজের প্রতিপালিত এবং পুত্র বলিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় মৌর্য চন্দ্রগুপ্তদেবের রাজ্যা-ভিষেকের শত শত বৎসর পরে কবি বিশাখদেব বৃহৎকথা-প্রসিদ্ধ এবং দেশ প্রচলিত ঐতিহ্য অবলম্বন করতঃ এই নাটক প্রনয়ণ করিয়াছিলেন; তিনি শুনিয়া ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-কুলের সন্তান ছিলেন অথচ তিনি নন্দরাজান্তঃপুরে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; তাই তিনি উক্তরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে "মুরার পুত্র মৌর্য" এইরূপ কোন নিরুক্তি অথবা প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি তাহার উল্লেখ করিতেন। আমাদের বাঙ্গালী কবিবর ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিক প্রবাদকে সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় চন্দ্রগুপ্ত নাটকে কাল্পনিক মুরাকে রক্ত-মাংসের দেহে উপস্থিত করিয়া দেশের লোকের মনে এক ভ্রান্ত সংস্কার স্থাপনের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের অনেক পাঠকেই "ঐতিহাসিক শ্রেণীর উপন্যাস (!) এবং নাটকে" লিখিত পাত্র-পাত্রীকে একেবারে পারমার্থিক ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিবার অভ্যাস থাকায় স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা সাধারণ ভ্রমকে আরও দৃঢ় করিয়া দিয়াছে। আমাদের মনে হয় যে যশস্বী কবি দ্বিজেন্দ্রলালও মুরার উপকথাকে প্রকৃত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কবি বিশাখ দেবকে আরও একটি বিষয়ের জন্য দাবী করা হইয়া থাকে। এই কবি তাঁহার নাটকের নায়ক চন্দ্রগুপ্তকে মহামন্ত্রী চাণক্য মুখে পুনঃ পুনঃ "বৃষল" বলিয়াছেন। অমর কোষ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার অভিধানে "বৃষল" শব্দের অর্থ "শূদ্র" করা হইয়াছে দেখিয়া অনেক পাঠক (২৩) অবধারণ করিয়াছেন যে ঐ কবি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে "শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই অর্থগ্রহ-সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। মনুসংহিতা এবং পরাশর-স্মৃতি গ্রন্থে এই "বৃষল" শব্দের পরিভাষা প্রদত্ত হইয়াছে (২৪)। তথায় বলা হইয়াছে

(২০) মৌর্যকুলের স্ত্রী (২য় অঙ্কের ২য় শ্লোক, ষষ্ঠ অঙ্কে ১৪শ শ্লোকের পর রাক্ষসোক্তি, এবং ৭ম অঙ্কের ৫ম শ্লোকের পর প্রথম চণ্ডাল বাক্যে প্রাকৃতাংশ ".মৌলিঅ কুল পদিট্ঠাবিদধম্ম সঞ্চঅস"—মৌর্যকুল প্রতিষ্ঠাপিতধর্ম্মসঞ্চয়স্য—)

(২১) শার্দ্দূলপোতমিব পরিপুষ্য নষ্টঃ (২য় অঙ্কের ৮ম শ্লোক) অর্থাৎ নন্দরাজ ব্যাঘ্রশিশু তুল্য চন্দ্রগুপ্তকে পরিপালন করিয়া বিনষ্ট হইলেন।

(২২) তৃতীয় অঙ্কের ৩য় শ্লোকে ইঙ্গিত মাত্র আছে, কিন্তু ৫ম অঙ্কের ১৯শ শ্লোকে চন্দ্রগুপ্তকে স্পষ্ট ভাষায় রাক্ষসের স্বামিপুত্র এবং সপ্তম অঙ্কের ১১শ শ্লোকের পর চাণক্য-বাক্যে রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের "পৈতৃক অমাত্যমুখ্য" বলা হইয়াছে।

(২৩) সুপণ্ডিত শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র লাহা তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় এই "বৃষল" কথার উল্লেখ করতঃ চন্দ্রগুপ্তের নীচত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(২৪) "বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতেহ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দ্দেবা স্তস্মাদধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥১৬॥
মনুসংহিতা, ৮ম অধ্যায়। এবং "অগ্নিকার্য্যাৎ পরি-
ভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ।
১২শ-অধ্যায়। বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ
স্মৃতাঃ ॥২৭॥ পরাশর স্মৃতি।

"ভগবান্ ধর্ম্মই 'বৃষ'; তাঁহাকে যিনি আজ্ঞা করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'বৃষল' বলিয়া থাকেন; সুতরাং ধর্ম্মলোপ করা কখনই উচিত নহে।" এই পরিভাষা গ্রহণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মৃতি-শাসিত বৈদিক-ধর্ম্মের অবমাননা কারীকেই "বৃষল" শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে কিন্তু চতুর্থবর্ণ শূদ্রকে লক্ষ্য করা হয় নাই। জৈন-সাহিত্যের আলোচনা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে চন্দ্রগুপ্তমৌর্য্য জৈন-সাধু শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে প্রব্রজ্যাও গ্রহণ করিয়া একজন পবিত্র জৈন যতির মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মাবলম্বী মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তকে বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা (চাণক্য এবং কবি বিশাখদেব) যে "বৃষল" বলিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ইতঃপূর্ব্বে আমরা "মহাপরিনিব্বাণ সুত্তের" প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে মগধের মহারাজ অজাতশত্রু এবং পিপ্পলীবনের "মোরিয়গণ" (অন্যান্য কতিপয় ক্ষত্রিয় জাতির সহিত) ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের দেহান্তরের পর ভক্তির সহিত তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সমাধি এবং তদুপরি চৈত্যমন্দির অথবা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রু মগধরাজ শেষ নাগের (অথবা শিশুনাগের) বংশজাত অধস্তন রাজা ছিলেন; তাঁহার বংশেই উত্তর কালে মহানন্দী, মহাপদ্মপতীনন্দ এবং নবনন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেইজন্য, চন্দ্রগুপ্ত পিপ্পলীবনের মৌর্য্যকুলের সন্তানই হউন অথবা নন্দরাজ বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকুন, তাঁহার পিতৃকুলের বুদ্ধ-ভক্তি সুপ্রসিদ্ধ ছিল, সন্দেহ নাই; সুতরাং ব্রাহ্মণেরা যে তাঁহাকে "বৃষল" (বৈদিকধর্ম ত্যাগী অথবা বৈদিক ধর্ম্মে অনাস্থাবান্) বলিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কেবল নাগবংশ নন্দবংশ অথবা মৌর্য্যবংশ নহে, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্বে হইতেই প্রাচ্যভারতের অনেক রাজন্য বংশেই বৈদিকধর্ম্মে আস্থা হারাইতে ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবেই পার্শ্বনাথ প্রচারিত জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোতম বুদ্ধের কিঞ্চিৎ অগ্রগামী মহাবীরের এবং পরে গোতম বুদ্ধের নিজের চেষ্টায় এই দুই অবৈদিক জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রীষ্মের দাবানলের ন্যায় প্রাচ্যভারতে ত্বরিতগতিতে প্রসারিত হওয়ায় এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের রাজন্য এবং বণিগ্‌বর্গ এই ধর্ম্মকে সাদরে আলিঙ্গন করায় পুরাণ গ্রন্থে ব্রাহ্মণেরা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে মগধরাজ মহানন্দীর পর দেশে আর ক্ষত্রিয়বর্ণের অস্তিত্ব থাকিবে না এবং রাজগণ ইতঃপর শূদ্রবর্ণের হইবেন (২৫)। এই সকল কারণেই সম্ভবতঃ মুদ্রারাক্ষসের কবি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যকে পুনঃ পুনঃ "বৃষল" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন,— তাঁহাকে হীন বা জঘন্য "শূদ্র" বলিয়া অভিহিত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিনা।

কেন যে 'মনে করিতে পারিব না' তাহার কৈফিয়ত দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য বটে এবং আমরা সেই কৈফিয়ত দিতেছি। কবি বিশাখদেব তাঁহার দৃশ্যকাব্যের প্রস্তাবনা মুখে সূত্রধার-বাক্যে বলিয়াছেন যে মহাসামন্ত-উপাধিধারী পৃথুর পুত্র বিশাখদেবের প্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস' নামক **নাটক** অভিনয় করিতে হইবে (২৬)। সংস্কৃত-ভাষায় দশবিধ দৃশ্যকাব্যের (ইংরাজীতে সাধারণভাবে Drama বলা হয়) মধ্যে "নাটকের" মান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অলঙ্কার শাস্ত্রে নাটকের লক্ষণে লিখিত হইয়াছে যে "যে দৃশ্যকাব্যের বস্তু ইতিহাস বিখ্যাত হইবে, যাহাতে পাঁচটি সন্ধি আছে, যাহার

(২৫) মহানন্দিনস্ততঃ.........মহাপদ্মনামানন্দঃ...... ভবিষ্যতি ।২০। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি ।২১। "বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ ২৪শ অধ্যায়। ভাগবতে ভবিষ্য-রাজগণকে স্পষ্ট "শূদ্র" বলা হয় নাই, "শূদ্র প্রায় অধার্ম্মিক হইবেন" বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ, ১২শ স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়, ৮ম হইতে ১০ম শ্লোক।

(২৬) "পৃথুসূনোঃ কবে র্বিশাখদেবস্য কৃতিমুদ্রারাক্ষসং নাম নাটকং নাটয়িতব্যমিতি।" প্রথম অঙ্ক, প্রস্তাবনা, সূত্রধরবাক্য।

নায়ক বিখ্যাত বংশ-সম্ভূত রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত, প্রতাপবান্ (তিনি দেব, দেববংশীয় অথবা পৃথবীরই হউন) এবং গুণবান্ হইবেন, এবং যাহার অঙ্গী (প্রধান) রস বীররস অথবা আদিরস হইবে,—তাহাকেই নাটক কহে (২৭)। মগধের বিখ্যাত নন্দবংশের ধ্বংশ এবং মৌর্য্যবংশের তথায় প্রতিষ্ঠারূপ বিখ্যাত ঐতিহাসিক তথ্য এই নাটকের বস্তু, মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ইহার নায়ক (Hero) এবং ইহার অঙ্গী বীররস—অবলম্বনে কবি ইহাকে নাটকরূপ দৃশ্যকাব্যরূপে প্রণীত করিয়াছেন। যদি নায়ক চন্দ্রগুপ্তকে কবি জঘন্যশূদ্র বলিয়াই পরিচিত করিবার অভিলাষ করিতেন, তাহা হইলে তিনি কথনই তাঁহাকে এই নাটকের নায়করূপে সুরসিক এবং সুবিজ্ঞ সভাজনের নিকটে (কাব্য-বিশেষ বেদিন্যাং পারিষদি) উপস্থিত করিতেন না। আধুনিক কবি-কৈশর অথবা কবি-জার দিগের মত সে কালের সংস্কৃত ভাষার কবিগণ অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মরূপ নিগড় ভাঙ্গিতে চাহিতেন না,—পারিতেন ও না। নিয়মভঙ্গকারী কবিকে সে কালের সুবিজ্ঞ সামাজিকগণ কথনই প্রশ্রয় দিতেন না। কবি বিশাখদেব চন্দ্রগুপ্তকে নিজ-নাটকের নায়করূপে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাকে যে "প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি" বা ক্ষত্রিয়রাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে অধিকারী।

এই নাটকে "মৌর্য্য", "মৌর্য্যেন্দু" ও "মৌর্য্যাকুল" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বহুবার যে নায়ক চন্দ্রগুপ্তকে অভিহিত করা হইয়াছে তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি। যদি "মুরা নাম্নী শূদ্র জাতীয়া উপপত্নীর জারজ পুত্র" ঐ মৌর্য্য-শব্দের প্রকৃত অর্থ হইত, তাহা হইলে এরূপ অভিধান কেবল আক্রোশ প্রকাশের জন্য—অর্থাৎ গালাগালি দেওয়ার জন্যই,—ব্যবহৃত হইত। পরন্তু এই নাটকে ব্যবহৃত উক্ত শব্দগুলি গালাগালির জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, কিংতু প্রশংসার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। মহামন্ত্রী চাণক্যের মুখে চন্দ্রগুপ্ত বারংবার "বৃষল" শব্দে সম্বোধিত হইয়াছেন। রাজসভায়, প্রকৃতি পুঞ্জের সম্মুখে, এই সম্বোধন প্রযুক্ত হওয়ায় উহা ঘৃণা ব্যঞ্জক "হীন, জঘন্য অথবা ছোট-লোক" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না। উহা কেবল "জৈন" অথবা "বৌদ্ধ" শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কোন কবিই রাজ নায়ককে মন্ত্রীর মুখ দিয়া গালাগালি দিয়া যশোলাভের আশা করেন না। যদি এই দৃশ্য কাব্যখানি নাটকের পরিবর্ত্তে 'প্রহসন', 'ডিম' 'ভান' অথবা অন্যরূপ হীন শ্রেণীর (Farcical) রচনা হইত, তাহা হইলে বরঞ্চ ঐরূপ অযোগ্য, হীন অথবা সম্বোধন প্রযুক্ত হইতে পারিত; অথবা যদি ইহা সামাজিক নাটক (প্রকরণ) হইত, এবং চন্দ্রগুপ্ত নায়ক না হইয়া কোন হীন পাত্র হইতেন, তাহা হইলে অপর কোন হীন পাত্রের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে (তাহার মাতার কুচরিত্রের ঘোষণা ব্যঞ্জক) এরূপ সম্বোধন শোভা পাইতে পারিত (২৮)। দৃশ্য কাব্য মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর রচনা নাটকে মহামন্ত্রীর মত অতি উচ্চ পাত্রের মুখ দিয়া তাঁহারই প্রভুস্থানীয় নায়কের (যিনি সম্রাট্) প্রতি কোনও প্রকার হীনতা ব্যঞ্জক সম্বোধন সংস্কৃত ভাষার কোন গ্রন্থেই নাই, মুদ্রারাক্ষসেও তাহা নাই। তবে কবি অন্যতম মহামন্ত্রী রাক্ষসের মুখে তাঁহার প্রভু নন্দের সহিত তুলনায় মৌর্য্যকে অকুলীন বলিয়া যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমুচিত হইয়াছে। তাহার দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের বংশের অথবা জন্মের কোন কলঙ্ক প্রকাশ পায় নাই; পুনশ্চ কাব্যশেষে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ মহামন্ত্রী রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করায় তিনিও তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন বলিতে হয়। সেকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারও যে রাজ সিংহা-

(২৭) তথাচ সাহিত্যদর্পণে—

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি-সমন্বিতম্।
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্॥
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ।
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা॥"

(২৮) যেমন "মৃচ্ছকটিক" প্রকরণে "শকার" পাত্রের প্রতি "কাণেলী মাতঃ" প্রভৃতি সম্বোধন প্রযুক্ত দেখা যায়।

সেন অভিষিক্ত হওয়ার অধিকার ছিল না (২৯) তাহা মহামন্ত্রী রাক্ষসের (এবং কবিরও) নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না।

এতাবতা আমরা যতদূর দেখিলাম তাহাতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত যে নন্দ রাজের শূদ্র জাতীয়া উপপত্নী মুরানাম্নী নারীর গর্ভজ পুত্র ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনই প্রমাণ নাই। মৌর্যবংশের এই কীর্তি অপবাদ দূর করা প্রত্যেক সুশিক্ষিত ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। আমরা সবিনয়ে তাঁহাদিগের সানুগ্রহ দৃষ্টি এ বিষয়ে আমন্ত্রণ করত আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীঅমলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

——(•)——

ন্যায় বৈশেষিক তত্ত্ব

ন্যায় দর্শন প্রণেতা মুনি গৌতম ও বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মুনি কনাদ, ইহারা উভয়েই পদার্থ সম্বন্ধে প্রায় সম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, লিঙ্গপুরাণের ২৪অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

জাতুকর্ণো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোম বর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ॥
অক্ষপাদ কুমারশ্চ উলূকো বৎস এব চ।
তত্রাপি মমতে শিষ্যা ভবিষ্যন্তি তপোধনঃ॥

উদ্ধৃত শ্লোক দুইটী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় শিবাবতার সোমবর্ম্মাই গৌতম ও উলুক বা কনাদের গুরু ছিলেন, অক্ষপাদ গৌতমেরই নামান্তর, উলুক বা কনাদ একই ব্যক্তি। অক্ষপাদই যে গৌতম তাহা আমি ন্যায় দর্শন শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, ফলকথা কনাদ ও গৌতম সমসাময়িক ও এক গুরুর শিষ্য,—এসম্বন্ধে কোনরূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না, দুই চারিটী পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও উহারা উভয়েই যে আরম্ভবাদ বা পরমাণুবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহা তাহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ন্যায় দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থ ফলতঃ বৈশেষিক দর্শনোক্ত সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভূক্ত হইলেও উভয়ের উদ্দেশ্য ক্রমে বিভিন্ন, পরন্তু নব্য ন্যায় অর্থাত্ যাহার গঙ্গেশোপাধ্যায় মূল রচনা করিয়াছেন, রঘুনাথ শিরোমণি ও মথুরানাথ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, জগদীশ, গদাধর যাহার ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়া জগতে অক্ষুন্ন কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, সেই নব্যন্যায়ে প্রায়শঃ বৈশেষিক দর্শনোক্ত পদার্থা-বলির বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা আমার মনে হয় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন একত্রিত হইয়াই নব্যন্যায় সৃষ্ট হইয়াছে, ন্যায় ও বৈশেষিক মিলিত হইয়া যে শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে তাহারই নাম নব্যন্যায় বা তর্কশাস্ত্র, বিশেষ নামক একটী পদার্থ স্বীকার করিয়া কনাদ দর্শন বা ঔনক্য দর্শন বৈশিষিক দর্শন নামে পরিচিত হইয়াছে, এই বিশেষ পদার্থ ন্যায়দর্শনকার স্বীকার করেন না, পরন্তু নব্যন্যায়ে বিশেষ পদার্থের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শন অধ্যয়ন করিয়া নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সকলই যেন নূতন বলিয়া মনে হইয়া থাকে, পরন্তু বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়নের পর নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিলে, সেরূপ বোধ হয় না। বৈশেষিক দর্শনোক্ত সপ্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াই যে নব্যন্যায় প্রণীত হইয়াছে, ইহা অভ্রান্ত সত্য, অন্যথা বৈশেষিক দর্শনোক্ত সপ্তপদার্থ, চতুর্ব্বিংশতি গুণ, পঞ্চবিধ কর্ম্ম ও বিশেষ পদার্থাদির কথনই বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকিত না, গৌতম প্রণীত ন্যায়-দর্শনে কেবল মাত্র মোক্ষোপযোগী আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সহায়ক পদার্থ-বলির উল্লেখ হইয়াছে, সাধারণ ভাবে বৈশেষিক দর্শনোক্ত পদার্থ সকল ন্যায় মত বিরুদ্ধ নহে, ইহাই মুক্তাবলীকার বলিয়াছেন. "এতেপদার্থাঃ নৌয়ায়িকানা মপ্যবিরুদ্ধাঃ" ন্যায় মতের অবিরুদ্ধ বৈশেষিক মত সিদ্ধ পদার্থ স্বীকার করিয়া নৈয়ায়িকগণ নব্যন্যায় প্রণয়ন করিয়াছেন. নব্যন্যায়েরই অপর নাম তর্কশাস্ত্র।

(২৯) যথা মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়ে—রাজধর্ম্মে—
ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথা বিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্ ॥২॥

নব্যন্যায়ে ও বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ প্রথমতঃ দ্রব্য গুণ-কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাব ভেদে সাত প্রকার, তন্মধ্যে দ্রব্যাদি ছয়টী ভাব পদার্থ, সপ্তমটী অভাব পদার্থ।

পদার্থ বিভাগ

ন্যায় দর্শনে মুনি গৌতম প্রমাণাদি ষোড়ষ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন সত্য পরন্তু ঐ ষোড়ষ পদার্থ উক্ত সপ্ত পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত (১)। বৈশেষিক দর্শণ সূত্রে প্রথমতঃ ষট্পদার্থের (২) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বৈশেষিক দর্শণ, ষট্পদার্থ বাদী, বাস্তবিক তাহা নহে, বৈশেষিক দর্শণ সূত্রে মুনি কনাদ স্পষ্টতঃ অভাব পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, বৈশেষিক দর্শণের নবম অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিক দেখিলেই সকল বিবাদ মিটিয়া যাইবে, জগতে ভাব ও অভাব দুইটিমাত্রই পদার্থ, ইহাদের মধ্যে একের উপলব্ধি না হইলে অন্যেরও অপলব্ধি হইতে পারেনা, দুঃখ না থাকিলে সুখের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ অভাব না থাকিলে ভাবও অনুভূত হয় না।

দ্রব্য বিভাগ

উল্লিখিত সপ্ত পদার্থের মধ্যে দ্রব্য পদার্থ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী, মন, ভেদে নয় প্রকারে বিভক্ত,, দ্রব্য কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতে হইলে, এক কথায় বলা যাইতে পারে, যাহা যাহা সমবায়িকারণ (৩) তাহা তাহা দ্রব্য, দ্রব্য পদার্থ ব্যতীত কেহই সমবায়িকারণ হইতে পারে না, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতে কারণ পদার্থ সমবায়ি অসমবায়ি ও নিমিত্ত ভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত। ঘট একটী কার্য্য দ্রব্য, ঘটের অবয়ব কপালই ঘটের সমবায়িকারণ, কপাল কপালিকার সংযোগ অসমবায়ী কারণ দণ্ডচক্রসলিল সূত্র প্রভৃতি সকলই নিমিত্ত কারণ, এখন দেখা যাইতেছে যেহেতু কপাল বা ঘটের সমবায়ি কারণ হইয়াছে, সুতরাং কপালটি দ্রব্য ব্যতীত আর কিছু নহে। এইরূপ যাহা ২ অসমবায়ি কারণ তাহা তাহা গুণ। যথা কপাল কপালিকার সংযোগ গুণ পদার্থ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ্য, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, সংস্কার, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, (অদৃষ্ট) ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, স্নেহ ভেদে চতুর্বিংশতি প্রকার;

গুণ বিভাগ

কর্ম্ম বিভাগ

যাহা যাহা গুণ ভিন্ন হইয়া অসমবায়ি কারণ হইবে তাহাকেই কর্ম্ম বলিয়া জানিবেন, যথা ঘট কার্য্যের প্রতি, দণ্ডজন্য ভ্রমী প্রভৃতি। উত্ক্ষেপন অধক্ষেপন আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন ভেদে কর্ম্ম পদার্থ পাঁচ ভাগে বিভক্ত, তির্য্যগ্গমন প্রভৃতি অন্যবিধ সকল কর্ম্মই গমন মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

কেহ ২ অন্ধকারকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া থাকেন, নৈয়ায়িকমতে অন্ধকার অতিরিক্ত পদার্থ নহে, আলোকের অভাবই অন্ধকার, আলোক পদার্থ তেজ হইতে ভিন্ন নহে, মিমাংসা দ্রব্য দর্শণকার মতে শক্তি ও সাদৃশ্য নামক আরও দুইটি অতিরিক্ত দ্রব্য পদার্থ আছে, নৈয়ায়িকগণ তাহাও খণ্ডন করিয়াছেন, সুতরাং পদার্থ সাত প্রকার ও দ্রব্য নয় প্রকার, ইহাই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শণকারের প্রকৃত সিদ্ধান্ত।

(সামান্য)

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শণকারগণ সামান্য নামক একটী পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। সামান্যের অপর নাম জাতি, জাতি পদার্থ ভালরূপ জানিতে হইলে পূর্ব্বে নিত্য কাহাকে বলে তাহা উত্তমরূপে জানা দরকার, নিত্য পদার্থ এক কথায় বুঝাইতে হইলে, যাহার কোন দিন নাশ হয় না, উৎপত্তিও হয় না তাহাকেই নিত্য বলিয়া থাকে। নিত্য পদার্থ চিরস্থায়ী অজর ও অমর, যথা আকাশ, আত্মা, কাল, দিক, পরমাণু প্রভৃতি। এখন জাতি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হই

---

(১) এতে পদার্থা বৈশেষিক প্রসিদ্ধাঃ নৈয়ায়িকানা মপ্যবিরুদ্ধাঃ (মুক্তাবলী টিকা)।

(২) ধর্ম্মবিশেষ প্রসূতাত্ দ্রব্যগুণ, কর্ম্ম, সামান্য বিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সম্ (বৈশেষিক দর্শণ সূত্র)।

(৩) সমবায়ি কারণত্বং দ্রব্যশৈবেতি (বিজ্ঞেয়ং) (ভাষাপরিচ্ছেদ)
গুণকর্ম্ম মাত্র বৃত্তি জ্ঞেয় মথাপ্য সমবায়ি হেতুত্বং।

হইবে না। যাহা নিত্য অথচ অনেক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান তাহাকে জাতি বলিয়া থাকে, যথা দ্রব্যত্ব ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি। দ্রব্যত্ব, অনেক দ্রব্যের সমবায় সম্বন্ধে রহিয়াছে নিজেও নিত্য পদার্থ, দ্রব্যের নাশ হইলেও দ্রব্যের ধর্ম্ম দ্রব্যত্ব নষ্ট হয় না, উৎপন্নও নহে, সুতরাং জাতি হইতে পারিল, সমবায়ের কথা পশ্চাৎ বলিব, গগণত্ব কালত্ব প্রভৃতি কতকগুলি ভেদক ধর্ম্মকে আপাতত জাতির ন্যায় বোধ হইলেও উহারা প্রকৃত পক্ষে জাতি নহে, উহাদিগকে উপাধি বলিয়া থাকে। ঐ সকল ভেদক ধর্ম্মে জাতির লক্ষণও যায় না। যেহেতু উহারা অনেক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, গগন কাল প্রভৃতি অনেক নহে, উহারা এক, বহু নহে। গগণত্ব প্রভৃতি গগণ প্রভৃতি দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। উহাদের নিয়ামক সম্বন্ধ স্বরূপ। কাজেই উহারা ভেদক ধর্ম্ম, উপাধি মাত্র, জাতি নহে। জাতি পদার্থটী আবার ব্যাপ্য, ব্যাপক ও ব্যাপ্য ব্যাপক ভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, যে জাতি অধিক পদার্থে থাকে তাহাকে ব্যাপক জাতি বলিয়া থাকে, যথা সত্তা জাতি, সত্তাজাতিটী দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, সুতরাং নয় প্রকার দ্রব্যে চতুর্ব্বিংশত প্রকার গুণে, পাঁচ প্রকার কর্ম্মে রহিয়াছে বলিয়া ব্যাপক জাতি হইল, ব্যাপ্য জাতি অর্থাৎ অল্পদেশ বৃত্তি জাতি, যথা ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি জাতি। ঘটত্ব জাতিটী কেবল ঘটরূপ দ্রব্যে রহিয়াছে, অন্য দ্রব্যে অথবা গুণ কিম্বা কর্ম্মে নাই সুতরাং অল্পদেশ বৃত্তি জাতি হইতে পারিল। আপেক্ষিক ন্যূনাধিক দেশ বৃত্তি জাতিকে ব্যাপ্য ব্যাপক জাতি বলিয়া থাকে, দ্রব্যত্ব গুণত্ব প্রভৃতি জাতিকেই ব্যাপ্য ব্যাপক জাতি বলিয়া থাকে, যেহেতু দ্রব্যত্ব জাতিটী সত্তাজাতি অপেক্ষা অল্পদেশ বৃত্ত ও ঘটত্ব প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা অধিক দেশ বৃত্তি হইয়াছে, সুতরাং ব্যাপ্য ব্যাপক জাতি হইতে পারিল, জাতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে কিন্তু অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থ বৃত্ত জাতির প্রত্যক্ষ হয় না।

(বিশেষ)

যাহা নিত্য ও নিত্য দ্রব্যে থাকে তাহাই বিশেষ পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিশেষ পদার্থ অনেক ও নিত্য দ্রব্য পরমাণু আকাশ প্রভৃতিতে থাকে, বিশেষ পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। প্রলয়কালে পরমাণুগুলিকে বিশেষ করিয়া অর্থাৎ একটী পার্থিব পরমাণু এইটী জলীয় ইত্যাদিরূপে পৃথক করিয়া বাছিয়া লইবার জন্য, এই বিশেষ পদার্থটী বৈশেষিক দর্শনকারগণ স্বীকার করিয়া থাকেন, নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন না, নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন, পরমাণুগুলিকে প্রলয় কালে বিশেষ করিয়া চিনিয়া লইবার জন্যই যদি বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে তাহা-হইলে ঐ বিশেষ পদার্থকে বিশেষ করিয়া চিনিয়া লইবার জন্য ও তদুপরি আবার একটী বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা অপ্রত্যক্ষীভূত বিশেষ পদার্থকে কে পরিচয় করাইয়া দিবে? এইরূপে অনন্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকার যুক্তি সহ হইতে পারেনা, যদি বল বিশেষ পদার্থ স্বতো ব্যাবর্ত্তক, অর্থাৎ নিজ হইতে নিজেই ভিন্ন হইয়া পরে, এক অন্যের পরিচয় করাইয়া দেয়, তাহাহইলে পরমাণুকেই স্বতোব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ নিজের ভেদক, বলিলে চলিতে পারে, বিশেষ স্বীকারের প্রয়োজন কি? সুতরাং বিশেষ পদার্থ হইয়া নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

(সমবায়)

যে সম্বন্ধ নিত্য সেই সম্বন্ধকেই সমবায় বলিয়া থাকে, সমবায় সম্বন্ধে, অবয়বে অবয়বী, দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্ম, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতি, পরমাণু ও নিত্য দ্রব্যে বিশেষ প্রভৃতি পদার্থ নিত্য সম্বন্ধীরূপে বিদ্যমান থাকে। সমবায় এক ও নিত্য, কেহ ২ সমবায়কে বহু ও বলিয়া থাকে।

(অভাব)

অভাব প্রথমতঃ দুইপ্রকার, সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব, ধ্বংস প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাব ভেদে সংসর্গাভাব তিন ভাগে বিভক্ত, যে অভাবের বিনাশ নাই ও উৎপত্তি আছে তাহাকে ধ্বংসাভাব বলিয়া থাকে, ঘটো নষ্ট ইত্যাদি রূপে ধ্বংসের প্রতীতি হইয়া থাকে, যে অভাবের বিনাশ আছে উৎপত্তি নাই, তাহাকেই প্রাগভাব বলিয়া থাকে, ঘটো ভবিষ্যতি

প্রতীতিই প্রাগভাবের প্রতারক, যে অভাবের নাশ কিম্বা উৎপত্তি নাই অর্থাৎ নিত্য তাহাকে অত্যন্তাভাব বলিয়া থাকে, ঘটো নাস্তি ইহাই অত্যন্তাভাবের আকার, যে অভাব নিত্য এবং অভাবের প্রতিযোগিটী কেবলমাত্র তাদাত্ম সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইবে তাহাকে অন্যোন্যাভাব বা ভেদাভাব বলিয়া থাকে, ঘটোন পটোন ইহাই অন্যোন্যাভাবের আকার বা পরিচায়ক।

অভাব গুলিকে পণ্ডিতগণ আরও অনেক রূপে বিভক্ত করিয়া থাকেন সামান্যাভাব, বিশেষাভাব, উভয়াভাব, অন্যতরাভাব, অন্যতমাভাব, ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, ও ব্যধিকরণ সম্বন্ধবচ্ছিন্নাভাব প্রভৃতিই বিভক্ত অভাব গুলির প্রায়, ঘট নাই বলিলে বুঝিতে হইবে ইহা, সামান্যাভাব, এক ঘট নাই বলিলে বুঝিতে হইবে ইহা বিশেষাভাব, ঘট ও পট উভয় নাই বলিলে ইহা উভয়াভাবের দৃষ্টান্ত স্থান হইবে এই উভয়াভাবটী সেস্থলে কেবলমাত্র ঘট বা পট বিদ্যমান থাকিবে, সে স্থানেও থাকিতে পারিবে, কেবলমাত্র ঘট ও পট উভয় যেখানে থাকিবে সেই স্থানেই থাকিবে না। অন্যতর বলিলে বুঝিতে হইবে দুইটীর মধ্যে কোনও একটী, এবং অন্যতরা ভাব বলিলেও বুঝিতে হইবে দুইটীর মধ্যে কোনও একটীর অভাব পরন্তু যেখানে অন্যতরের মধ্যে একটীও থাকিবে, সেখানে আর অন্যতরা ভাব থাকিবে না, অন্যতম বলিলেও বহু বস্তুর মধ্যে একটীকে বুঝিতে হইবে, বহু বস্তুর মধ্যে একটী অভাব বুঝাইলেই বুঝিতে হইবে এইটী অন্যতমাভাব, বিশেষনাক্রান্ত অভাবকেও বিশিষ্ট ভাব বলিয়া থাকে, বৃক্ষ বৃত্তির বিশিষ্ট আম্র ভাব বলিলে কেবলমাত্র বৃক্ষে যে আম্র ফলিয়াছে তাহারই অভাব প্রতীত হইবে, ইহাকেই বিশিষ্টাভাব বলিয়া থাকে।

সোন্দর নামক কোনও নব্য নৈয়ায়িক ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্না ভাব স্বীকার করিয়া থাকেন, যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে বস্তু কোথাও থাকেনা, সেই ধর্ম্মকে সেই বস্তুর ব্যধিকরণ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, এই ব্যধিকরণ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যে অভাব প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাকে ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব বলিয়া থাকে। ঘটত্ব, ঘট ভিন্ন পটে থাকে না, এই ঘটত্ব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পটের অভাব গ্রহণ করিলে, তাহাকে ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্না ভাবের দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। এইরূপ গোত্বেন অশ্বো নাস্তি, পশুত্বের মনষ্য নাস্তি। ইহাই ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের দৃষ্টান্ত স্থল। এইরূপ সে সম্বন্ধে যে পদার্থ কোনদিন কোন স্থানেই থাকে না সেই সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া অভাব গ্রহণ করিলে, তাহাকে ব্যধিকরণ সম্বন্ধাবচ্ছিন্না ভাব বলিয়া থাকে। যথা সংযোগেন গুণো নাস্তি, সংযোগ সম্বন্ধে গুণ পদার্থ কুত্রাপি থাকিতে পারে না, ঐ সংযোগ সম্বন্ধ গুনের ব্যধিকরণ সম্বন্ধ বলিয়া, সংযোগ সম্বন্ধে গুণের অভাবও ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব হইতে পারিল। দ্রব্য,পদার্থ,পৃথিবী, জল, তেজ,বায়ু, আকাশ,কাল,দিক্,আত্মা, মন ভেদে নয় প্রকারে বিভক্ত, পৃথিবীতে, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, ও সংস্কার, এই চতুর্দ্দশটী গুন আছে, জলেও উক্ত চতুর্দ্দশটী গুন আছে, কিন্তু গন্ধ নাই, স্নেহ আছে, অর্থাত্ উক্ত চতুর্দ্দশটীর মধ্যে গন্ধকে বাদ দিয়া স্নেহ যোগ করিলে যে চতুর্দ্দশটী গুন হইবে, উহাই জলের গুণ, তেজে রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ পরত্ব, অপরত্ব এবং সংস্কার এই একাদশটী গুন আছে, বায়ুতে স্পর্শ, সংখ্যা পরিমান, পৃথকত্ব, সংযোগ বিভাগ পরত্ব, অপরত্ব, এবং সংস্কার এই নয়টী গুণ আছে। আকাশে শব্দ, সংখ্যা পরিমিতি পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ এই ছয়টী গুন আছে, কালে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব সংযোগ বিভাগ এই পাঁচটী গুণ আছে। দিকেও এই পাঁচটী গুন আছে, আত্মার অর্থাত্ জীবাত্মার, সংখ্যা পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ও সংস্কার এই চতুর্দ্দশটী গুণ আছে। মনে, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার এই আটটী গুণ আছে। ঈশ্বরের বা পরমাত্মার, জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব সংযোগ ও বিভাগ এই আটটী গুণ আছে। উক্ত নয়টী দ্রব্যকে

এককথায় লক্ষণ দ্বারা বুঝাইতে হইলে প্রত্যেকের এক একটী করিয়া অসাধারণ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যেরূপ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম্ম গন্ধ সুতরাং গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ হইবে, যাহাতে গন্ধ আছে তাহা পৃথিবী বলিয়া জানিবেন। এইরূপ জলের অসাধারণ ধর্ম্ম স্নেহ, সুতরাং স্নেহবত্ত্ব জলে লক্ষণ হইতে পারিল, যেখানে স্নেহ আছে তাহাই জল, ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। উষ্ণস্পর্শ তেজের ধর্ম্ম, উষ্ণস্পর্শবত্ত্বই তেজের লক্ষণ, অপাকজ (অর্থাত্ যাহা কোন দিন অগ্নি সংযোগে অন্যথা হয় না)। অনুষ্ণ ও অশীত স্পর্শ যাহাতে আছে তাহাকে বায়ু বলা যায়, অপাক জানুষ্ণাশীত স্পর্শবত্ত্বই বায়ুর অসাধারণ ধর্ম্ম বা লক্ষণ। শব্দবত্ত্ব আকাশের ধর্ম্ম বা লক্ষণ, যাহাতে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকেই আকাশ বলিয়া থাকি, শব্দ আকাশে উত্পন্ন হয় ও আকাশেই থাকে, ইহা প্রাচ্যদার্শনিকগণের মত, যুক্তিও বহু আছে। পরন্তু প্রতিচ্য দার্শনিকগণ শব্দকে বায়ুর গুণ বলিয়া থাকেন তাহা ঠিক নহে কারণ বায়ুর যত প্রকার গুণ আছে, সে গুলি সকলই আশ্রয় নাশাধীন নষ্ট হইয়া থাকে, পরন্তু শব্দ বায়ু নাশ হইলে নষ্ট হয় না, সুতরাং বায়ু হইতে পৃথক্ কোনও একটী দ্রব্যকে শব্দের আশ্রয় বলিতে হইবে, সেই দ্রব্যটী আকাশ অন্য কেহ নহে। একটী মাত্র যুক্তি প্রদত্ত হইল, সকল যুক্তিগুলি লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, কালিক পরত্ব ও অপরত্বের (অর্থাত্ জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের) অসাধারণ কারণই কাল ও দৈশিক পরত্ব অপরত্বের (অর্থাত্ দূরত্ব অন্তিকত্বের) অসাধারণ কারণকেই দিক্ বলিয়া থাকে, যেখানে দৈশিক পরত্ব অপরত্ব থাকিবে তাহাই দিক্ ও কালিক। পরত্বা পরত্বে আশ্রয়কে কাল বলিয়া জানিবে।

রঘুনাথ শিরোমণি কাল ও দিক্ পৃথক ভাবে স্বীকার করেন না। তাহার মতে ঈশ্বর বা পরমাত্মাই কাল ও দিক্পদ বাচ্য, মনও বায়বীয় পরমাণু ব্যতিত অন্য কিছু নহে, বায়বীয় পরমাণুই তাহার মনঃ পদার্থ। সুখ ও দুঃখাদির আশ্রয়কে জীবাত্মা বলিয়া থাকে, পরমাত্মার বা ঈশ্বরে সুখ দুঃখ নাই, কেবল মাত্র নিত্য জ্ঞান ইচ্ছা কৃতি প্রভৃতির আশ্রয়কে পরমাত্মা বলিয়া থাকে। এই পরমাত্মা বা ঈশ্বরই জগতের নিয়ন্তা ও আদিকারণ। ইহার সন্ধান পাইবার জন্যই দর্শন শাস্ত্র, জীবাত্মা বন্ধ মোক্ষের কারণ প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর তাহা নহে, তিনি সকল বস্তুতে সমভাবে বিদ্যমান, ইনিই আমার মতে বেদান্ত বেদ্য ব্রহ্ম, সাংখ্যের পুরুষ, নৈয়ায়িক বৈশেষিকের ঈশ্বর বা পরমাত্মা, বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, খৃষ্টের যিশু, মুসলমানের আত্মা। ইহাকেই দার্শনিকগণ স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে আমাদের সম্মুখে ভিন্ন ২ রূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন, অবান্তর বিষয় বলিয়া আর কালক্ষেপ করিব না।

পূর্ব্বকথিত নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি জল তেজ ও বায়ু দুই প্রকারে বিভক্ত। পরমাণু স্বরূপ ও দ্ব্যণুক বা সাবয়ব স্বরূপ, আকাশ কাল দিক ও আত্মা বিভু, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী মনটী ক্ষুদ্র অণুস্বরূপ, সাবয়ব গুলিকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, শরীর, ইন্দ্রিয়, ও বিষয়।

মানুষ বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী প্রভৃতির পার্থিব শরীর, জলীয় শরীর বরুণ লোকে বর্ত্তমান, তৈজসিক শরীর সূর্য্য লোকে ও বায়বীয় শরীর বায়ু লোকে আছে, আকাশাদির শরীর নাই, তাহারা সাবয়বত্ত্ব নহে, পার্থিব ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ, জলীয় রসনা, তৈজস চক্ষু, বায়বীয় ত্বক, আকাশ নিরবয়ব তথাপি তাহার ইন্দ্রিয় আছে, আকাশের ইন্দ্রিয় শব্দ গ্রাহী কর্ণ, বা শ্রোত্র, ইহারা সকলেই ভৌতিক ইন্দ্রিয়ও পঞ্চ বিধ, অন্তরিন্দ্রিয় একটী তাহার নাম মন্ উক্ত পাঁচটীকে বহিরিন্দ্রিয়ও বলিয়া থাকে, পার্থিব বিষয় দ্ব্যণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত, জলীয় বিষয় সাগর হইতে করকাদি পর্য্যন্ত, তৈজস বিষয় বহ্নি হইতে সুবর্ণাদি ধাতু দ্রব্য সমূহ, বায়বীয় বিষয় প্রাণাদি হইতে মহা বায়ু পর্য্যন্ত, দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, আর কতকগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, যে বস্তুতে মহত্ত্ব ও উদ্ভূতরূপ (অর্থাৎ, অগ্নি সংযোগে অন্যথা প্রাপ্ত রূপ) আছে তাহার প্রত্যক্ষ হয়, ত্রসরেণু হইতে ঘট পট প্রভৃতি সকলই প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত বস্তু, আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, আকাশ কাল দিক্ ও আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না যেহেতু আকাশ কাল ও

দিকে উদ্ভূত রূপ নাই, মন পরমাণু ও দ্ব্যণুকেরও প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু ঐঐ দ্রব্যে মহত্ব নাই।

পূর্ব্ব কথিত দ্রব্যগুলির উত্পত্তির কথা জানিতে হইলে প্রথমতঃ কার্য্য কারণ জানিতে হইবে, যাহার উত্পত্তি হয় বা কারণ আছে তাহাকে কার্য্য কহে, যেরূপ ঘট পট প্রভৃতির উত্পত্তি হয় ও কারণ আছে, সুতরাং তাহারা কার্য্য দ্রব্য, আত্মা কাল প্রভৃতির কারণ নাই, উত্পত্তি হয় না, তাহারা কার্য্য নয়।

নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতে কারণ তিন প্রকার, সমবায়ি কারণ অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ, যাহা ব্যতীত কোন বস্তু উত্পত্তি হয়না ও কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বেই নিয়ত থাকে তাহাকে কারন বলিয়া থাকে, যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যটী উত্পন্ন হয় বা থাকে তাহাকে সমবায়ি কারণ বলিয়া থাকে, ঘট পটাদি দ্রব্য তাহার অবয়বে সমবায় সমবায় সম্বন্ধ থাকে, সুতরাং ঘটের কপাল ও পটের সূত্রাত্মক অবয়ব ঘট ও পটের যথাক্রমে সমবায়ি কারণ হইতে পারিল।

যে বস্তু সমবায়ি সুতরাং অসমবায়ি কারণ হইতে পারিল, কারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্য জন্মাইতে সমর্থ হয় তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলিয়া থাকে, যথা কপাল ও কপালিকার সংযোগ, ঘট কার্য্যের উক্ত সংযোগ ঘটাবয়ব কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কারণ হইয়াছে, সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ হইতে ভিন্ন কারণকে নিমিত্ত কারণ বলিয়া থাক, যথা ঘটকার্য্যের প্রতি মৃত্তিকা জল প্রভৃতি। সকল পদার্থই কারণ হইতে পারে, কারণত্ব সকল পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য, কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ, কাহারও কারণ নহে, দ্ব্যণুক পরিমাণের প্রতি পরমাণুগত দ্বিত্ব সংখ্যাই কারণ ইহাই ন্যায় ও বৈশেষিক সিদ্ধান্ত, কার্য্য মাত্রের প্রতি ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, কাল, প্রাগভাব ও অদৃষ্ট কারণ, জগতের উত্পত্তিক্রম দেখাইবার জন্য আরম্ভ বাদী গৌতম ও কনা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছা হইলে পরমাণুতে কর্ম্ম উপস্থিত হয়, ঐ কর্ম্মজন্য দুইটী পরমাণু মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশ তিনটী দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া কতগুলি এসরেণু উত্পন্ন হয়, কতকগুলি এসরেণু মিলিত হইয়া কতগুলি অবয়ব সৃষ্টি হইয়া পড়ে, কতগুলি অবয়ব মিলিয়া একটী অবয়বটী উত্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপে জগতের সকল দ্রব্যই উত্পন্ন হইয়াছে, নিত্য বস্তুর উত্পত্তি হয় না, তাহাদের সুক্ষ্মাবস্থা বা স্থুলাবস্থা নাই, সকল সময়েই তাহারা এক রকম। দ্রব্যগুলি জানিবার জন্য কোন স্থানে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্য লইতে হয়, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যকে অনুমান প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। প্রমাণ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক একটু ভিন্নমত অবলম্বন করিয়াছেন, ন্যায় মতে, প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান শব্দভেদে প্রমাণ চারিপ্রকার, বৈশেষিক মতে প্রমাণগুলি অনুমান প্রত্যক্ষ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। উপমান ও শব্দ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত, এ সম্বন্ধে বহু যুক্তি তর্ক অবলম্বন করিয়া দুই পক্ষই স্বস্ব মত রক্ষা করিয়াছেন, কঠিনতর বিচার, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়া কাহারই ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটাইতে ইচ্ছা করিনা, সুতরাং ঐ সকল বিষয় বাদ দিয়া কেবল মাত্র পদার্থ বোধের জন্য যাহা ২ আবশ্যক তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

প্রমাকরণকে (অর্থাত্ প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণকে) প্রমাণ বলিয়া থাকে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রমা নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দুই প্রকারে বিভক্ত। যে জ্ঞানের প্রকারতা বিশেষ্যতা নাই তাহার নাম নির্ব্বিবাচক জ্ঞান ও যাহার প্রকারতা বিশেষ্যতা আছে, তাহাকে সবিকল্পক জ্ঞান বলে, অয়ং ঘটঃ অয়ং পটঃ প্রভৃতিই সবিকল্পক জ্ঞানের উদাহরণ স্থল। ঘট ঘটত্বে পট পটত্বে প্রভৃতি জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের উদাহরণ স্থল। বিশেষণ জ্ঞানব্যতীত বিশেষ্য জ্ঞান হইতে পারে না, বিশেষণ জ্ঞান সংগ্রহের জন্য নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান চাক্ষুষ, স্পার্শণ রাসন ঘ্রানজ শ্রোত্রজ ও মানসভেদে ছয় প্রকারে বিভক্ত। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতীত হইতে পারেনা, ঐ ইন্দ্রিয়

সম্বন্ধকে সন্নিকর্ষ বলিয়া থাকে। এই সন্নিকর্ষ বা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ, লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ, লৌকিক সন্নিকর্ষ ও সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় ও বিশেষণতা বা স্বরূপ ভেদে ছয় প্রকার, ইহাদের মধ্যে সংযোগ, (ইন্দ্রিয় সংযোগ) দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সংযুক্ত সমবায় দ্বারা শব্দ ভিন্ন গুণ, কর্ম্ম ও দ্রব্যবৃত্তি জাতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সংযুক্ত সমবেত সমবায় দ্বারা শব্দত্ব জাতি ভিন্ন, গুণবৃত্তি জাতি ও কর্ম্মবৃত্তি জাতি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সমবায় দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, সমবেত সমবায় দ্বারা শব্দত্বের প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষণতা দ্বারা সমবায় ও অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অলৌকিক সন্নিকর্ষ ও সামান্যলক্ষণা, জ্ঞান লক্ষণা ও যোগজ লক্ষণা ভেদে ত্রিবিধ। সামান্য লক্ষণা দ্বারা, ঘটত্বরূপে সকল ঘটের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জ্ঞান লক্ষণা দ্বারা সুরভি চন্দন ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হয় ও যোগজ ধর্ম্ম দ্বারা, যোগিগণের সর্ব্ববিষয়ক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

অনুমান প্রমাণ।

অনুমিতির করণকে অনুমান কহে। এখানে অনুমান বলিতে হেতুর জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিতেছে, সাধ্য ব্যাপ্য হেতু বিশিষ্ট জ্ঞানকে পরামর্শ বলিয়া থাকে। এই পরামর্শই অনুমিতির ব্যাপার নামে বিখ্যাত, ব্যাপ্তিজ্ঞান বা হেতুজ্ঞানের নাম, অনুমিতির করণ. ধূম দ্বারা বহ্নির অনুমিতি করিতে হইলে প্রথমে চুলা বা রন্ধনশালায় বহ্নি ও ধূমের সামানাধিকরণ্য (একত্র স্থিতি) দেখিয়া ধূমবহ্নির ব্যাপ্য অর্থাত্ যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নিও থাকে, এইরূপ একটী জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নিও অবশ্য আছে, এই জ্ঞানটাই পর্ব্বতে ধূম আছে, সুতরাং বহ্নি আছে এতাদৃশ পর্ব্বতীয় বহ্নি ধূমের ব্যাপ্তি স্মৃতির কারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যদি রন্ধনশালায় বহ্নি ধূমের একত্রাবস্থিতি দেখিয়া, যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নিও থাকে, এইরূপ একটী ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়, তৎপর পর্ব্বতের যে কোন স্থানে, ধূম দেখিলেই যে বহ্নি আছে, এইরূপ একটী জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যাপ্তিজ্ঞান বলিয়া থাকে। "যত্র ধূম স্তত্র বহ্নিঃ" ইত্যাকার ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর বহ্নির ব্যাপ্য ধূম পর্ব্বতে আছে এতাদৃশ জ্ঞানের নাম পরামর্শ, পরামর্শের পরই অনুমিতি হইয়া থাকে। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ইহাকেই অনুমিতির আকার বা স্বরূপ বলিয়া থাকে। এইরূপে সর্ব্বত্র অনুমিতি স্থলে ব্যাপ্তি পরামর্শ প্রভৃতির সঙ্কলন করিতে হয়। অনুমিতির পক্ষতা নামক আর একটী কারণ আছে, সংশয় পক্ষতা ইচ্ছা পক্ষতা সিদ্ধাভাব ভেদে পক্ষতা অনেক প্রকার। পর্ব্বতোবহ্নিমান বা পর্ব্বতে বহ্নি আছে কি না, এই সংশয়কে সংশয় পক্ষতা বলিয়া থাকে, "পর্ব্বতে বহ্নি জ্ঞানং জায়তাং" পর্ব্বতে বহ্নি জ্ঞান হউক এইরূপ পক্ষতাকে ইচ্ছা পক্ষতা বলিয়া থাকে। সিষাধয়িষা বিরহ বিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাব সাধনের ইচ্ছার অভাববিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবকে সিদ্ধ্যভাব রূপ পক্ষতা বলিয়া থাকে। পর্ব্বতে বহ্নি আছে এইরূপ নিশ্চয় থাকিলেও কোন স্থলে ইচ্ছা বশতঃ পরকে বুঝাইবার জন্য আত্মার মনন বারংবার করিবার জন্য নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ পক্ষতাকে অনুমিতি কারণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। যে কোন প্রকারে সিদ্ধ বস্তুরও অনুমান করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মাকারে শ্রোতব্যো ইত্যাদি শ্রুতির উপদেশ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। মুক্তি কামী মুক্তি লাভের জন্য সিদ্ধ পদার্থ আত্মার শব্দ জন্য জ্ঞান থাকিলেও পুনঃ ২ অনুমান করা আবশ্যক। মনে করিয়া থাকেন সিদ্ধ বস্তুর অনুমান করিতে হইলে পক্ষতাকে অনুমিতির কারণ বলিতেই হইবে, এ বিষয়ে আরও মতভেদ আছে, অবসর পাইলে বিশদরূপে বলিবার চেষ্টা করিব। ন্যায় বৈশেষিক প্রসিদ্ধ পদার্থগুলির উদ্দেশ ক্রম দেখাইবার জন্যই এই প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছি, প্রসঙ্গ বশতঃ দুই একটী লক্ষণও সংক্ষেপে বলিয়াছি। ঐ ঐ লক্ষণই চরম সিদ্ধান্ত নহে।

এই অনুমিতি স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দুইভাগে বিভক্ত, পরার্থানুমিতিতে পাঁচটী অবয়ব-বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন এই পাচঁটীকেই অবয়ব বলিয়া থাকে। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ অর্থাৎ

পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এইটী প্রতিজ্ঞা বাক্যের আকার। ধূমাৎ, অর্থাৎ যেহেতু ধূম আছে, এইটী হেতু বাক্যের, যো যো ধূমাবান্ স বহ্নিমান্, যথা মহানসং অর্থাৎ যাহা যাহা ধূম বিশিষ্ট সেই বহ্নি বিশিষ্ট, যে প্রকার মহানস্ এইটী উদাহরণ বাক্যের, 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান পর্ব্বতঃ' বহ্নিব্যাপ্য ধূমবানই পর্ব্বত। ইহা উপনয় বাক্যের, তস্মাৎ বহ্নিমান্ সুতরাং পর্ব্বত বহ্নিমান্ ইহা নিগমন বাক্যের যথাক্রমে আকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পরার্থ অর্থাৎ অন্যকে বুঝাইবার জন্য উক্ত বাক্য পঞ্চকের উপন্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক, স্বার্থ অর্থাৎ নিজের বুঝিবার জন্য যে অনুমান করা হইয়া থাকে, তাহাতে অবয়ব বাক্যের প্রয়োজন হয় না, কেবল মাত্র ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারাই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই প্রতিজ্ঞাদি বাক্য পাঁচটীকে ন্যায় বলিয়া থাকে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্য পঞ্চক, সমুদায়ত্বং এইটী ন্যায়ের লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিজ্ঞাদ্যন্যতমত্বং এইটীকে অবয়বের লক্ষণ বলিয়া থাকে। অনুমান আবার কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী, অন্বয় ব্যতিরেকী ভেদে তিনপ্রকার। যে স্থলে সাধ্যেরত্ব ভাব অপ্রসিদ্ধ তাহাকেই কেবলান্বয়ী কহে, যথা ইদং প্রমেয়ং জ্ঞেয়ত্বাদিত্যাদি স্থলে প্রমেয়ত্ব সর্ব্বত্র আছে বলিয়া সাধ্যের অভাব প্রসিদ্ধ হইল না, সুতরাং উক্ত স্থলটী কেবলান্বয়ী হইতে পারিল,—আর সেস্থলে সাধ্যটী পক্ষের অতিরিক্ত স্থলে থাকে না সেই স্থানটীকে কেবল ব্যতিরেকী বলিয়া থাকে। যেরূপ পৃথিবী ইতরভিন্না পৃথিবী ত্বাদিত্যাদি স্থলে ইতর ভিন্নত্বরূপ সাধ্যটী পৃথিবী ব্যতিরিক্ত অন্যত্র নাই বলিয়া উক্ত স্থলটী কেবল ব্যতিরেকার উদাহরণ স্থল হইতে পারিল, এবং যে স্থলে সাধ্য ও সাধ্যাভাব দুইই অন্যত্র প্রসিদ্ধ হয় তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী বলা হইয়া থাকে। বহ্নিমান ধূমাৎ প্রভৃতি স্থলে সাধ্য বহ্নি ও বহ্ন্যাভাব অন্যত্র প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া অন্বয়ব্যতিরেকী হইতে পারিল। পঞ্চরূপোপন্ন লিঙ্গ প্রতিপাদকং বাক্যং ন্যায়ঃ এই ন্যায় লক্ষণের মধ্যে যে পঞ্চরূপ শব্দটী আছে উহা দ্বারা আমরা পক্ষসত্ব, সপক্ষ সত্ব, বিপক্ষ ব্যাবৃত্তত্ব, অবাধিতত্ব, অসৎপ্রতি পক্ষিত্ব এই পাঁচটী ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া থাকি, এই পাঁচটাকেই পঞ্চরূপ বলিয়া থাকে। সন্দেহ বিষয়ীভূত সাধ্য বিশিষ্ট পক্ষে হেতুর বিদ্যমানতাকে পক্ষবৃত্তি হেতু বলিয়া থাকে। এই সপক্ষ বৃত্তিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম পঞ্চক হেতুর উপরে থাকে। নিশ্চিত সাধ্য বিশিষ্ট পক্ষে হেতুর বিদ্যমানতাকেই সপক্ষ বৃত্তি হেতু বলিয়া থাকে। নিশ্চিত সাধ্যাভাব বিশিষ্ট পক্ষে হেতুর অবিদ্যমানতাকে বিপক্ষাবৃত্তি হেতু বলিয়া থাকে। সাধ্যাভাব বিশিষ্ট পক্ষে হেতুর অবিদ্যমানতাকে অবাধিত হেতু বলিয়া থাকে। সাধ্যের অভাব সাধক হেতু বিশিষ্ট পক্ষে হেতুর অবিদ্যমানতাই অসৎ প্রতি পক্ষিত্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উক্তরূপ পঞ্চক যে হেতুতে থাকিবে সেই হেতুকেই সদ্ধেতু বলিয়া থাকে। কিন্তু কেবলান্বয়ী স্থলে বিপক্ষ ব্যাবৃত্তত্ব ও কেবল ব্যতিরেকী স্থলে সপক্ষ সত্ব থাকে না বলিয়া তাহাদের সদ্ধেতুতার ব্যাঘাত হয় না। কেবলান্বয়ী ও কেবল ব্যতিরেকী স্থলে তাদৃশরূপ চতুষ্টয়কেই অপেক্ষা করিয়া থাকে। পঞ্চরূপের অপেক্ষা করে না। কিন্তু উপাধিযুক্ত হেতু স্থলে কোন একটীর ভঙ্গ হইবেই, দুষ্ট হেতু বা অসদ্ধেতুকে সোপাধি হেতু বলিয়া থাকে।

হেতুর অব্যাপক হইয়া যিনি সাধ্যের ব্যাপক হইয়া থাকে, তাহাকে উপাধি বলিয়া থাকে। উপাধি অনেক প্রকার আছে। অয়ং ধূমবান্ বহ্নেঃ প্রভৃতি অসদ্ধেতু স্থলে আদ্রেন্ধন প্রভব বহ্নিমত্বটী সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এইরূপ হেত্বাভাস দোষদুষ্ট হেতুকেই অসদ্ধেতু বলিয়া থাকে। হেত্বাভাস বলিলে হেতুর ন্যায় আভাস যুক্ত বটে কিন্তু প্রকৃত হেতু নয়। এতাদৃশ দুষ্ট হেতু বৃত্তি ধর্ম্ম বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। অনুমিতি কারনীভূতা ভাব প্রতি যোগিত্বং হেত্বা ভাব সত্বং ইহাই হেত্বা ভাসের লক্ষণ। প্রতিবন্ধকা ভাবের প্রতিযোগিকে হেত্বাভাস বলা যায়। বাধ প্রভৃতি অনুমিতি প্রতি বন্ধক হইয়া থাকে। এই বাধা ভাবের প্রতিযোগি অবশ্য বাধই হইল সুতরাং বাধই হেত্বা ভাস হইতে পারিল। এইরূপ সর্ব্বত্র লক্ষণ নেওয়া অত্যন্ত সহজ হইবে। উক্ত হেত্বাভাস পাচপ্রকার; ব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, বাধিত,

ও সৎপ্রতিপক্ষ ভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত; সব্যভিচার আবার সাধারণ, অসাধারণ, অনুপসংহারী ভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত। সাধ্যাভাব বদ বৃত্তিত্বকে অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতু থাকাকে সাধারণ বলিয়া থাকে, ধূমবান বহ্নে প্রভৃতি স্থলে ধূম সাধ্য, তাহার অভাবের অধিকরণ অয়োগোলক, এই অয়োগোলকে বহ্নি রহিয়াছে, বলিয়া উক্ত স্থলে সাধারণাত্মক সব্যভিচার দোষটী স্থান পাইয়াছে, সুতরাং বহ্নিরূপ হেতুটী হেত্বাভাস দোষ দোষিত হইয়াছে। ধূমবান বহ্নে প্রভৃতি স্থলেই সাধারণের উদাহরণ স্থল বলা যায়, সকল সপক্ষ ব্যাবৃত্তত্বকে অর্থাৎ সমুদয় নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষে হেতুর অবিদ্যমানতাকেই অসাধারণ বলা যায়, পর্ব্বতো বহ্নিমান্ পর্ব্বত্বাদিত্যাদি স্থলই অসাধারণের উদাহরণ স্থল হইবে, যে হেতু সকল নিশ্চিত বহ্নিরূপ সাধ্য বিশিষ্ট চত্বর মহানস প্রভৃতি পক্ষে পর্ব্বত্বরূপ হেতুটী আবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং উক্ত স্থলে অসাধারণাত্মক সব্যভিচার দোষটী হইতে পারিল, কেবলান্বয়ী পক্ষকত্বকে অর্থাৎ সকল পদার্থই যদি পক্ষ হয়, তাহাকে অনুপসংহারী বলিয়া থাকে, সর্ব্বং প্রমেয়ং প্রভৃতি স্থল অনুপসংহারীর দৃষ্টান্ত স্থল হইবে। যেহেতু উক্ত স্থলে সকলেই পক্ষ হইয়াছে। সাধ্যাভাব ব্যাপ্ত হেতুকে অর্থাৎ হেতুটীতে যদি সাধ্যের অভাব দ্বারা ব্যাপ্ত হয় তাহাকে বিরুদ্ধ বলে, গোত্ববান্ অশ্বত্বাভাব প্রভৃতি স্থল বিরুদ্ধের উদাহরণ স্থলে গোত্বা ভাব রূপ সাধ্য ভাব দ্বারা অশ্বত্ব রূপ হেতুটী ব্যাপ্ত হইয়াছে। অসিদ্ধটী আশ্রয়াসিদ্ধ স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বা সিদ্ধ ভেদে তিন প্রকার।

আশ্রয়াসিদ্ধাদ্যন্যত মত্বং অসিদ্ধত্বং এইটাই অসিদ্ধের লক্ষণ, পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকা ভাব। আশ্রয়াসিদ্ধিঃ কাঞ্চনময়ঃ পর্ব্বতো বহ্নিমান্ প্রভৃতি স্থলে পর্ব্বতে কাঞ্চনময়ত্ব নাই বলিয়া কাঞ্চনময়ত্বা ভাববিশিষ্ট পর্ব্বত ইত্যাকার জ্ঞানটী পরামর্শের প্রতিবন্ধক হইয়াছে বলিয়া আশ্রয়া সিদ্ধিরূপ দোষের দৃষ্টান্ত হইতে পারিল, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত হেতুর অভাব থাকিলে পক্ষা বৃত্তি হেতুকে স্বরূপা সিদ্ধি বলিয়া থাকে।

পর্ব্বতো বহ্নিমান জলাৎ প্রভৃতি স্থলে পর্ব্বতে জল নাই বলিয়া উক্ত স্থলটী স্বরূপা সিদ্ধির দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারিল। এই স্বরূপা সিদ্ধি ভাবা সিদ্ধি, বিশেষ্য সিদ্ধি, প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার। সাধ্যা ভাববান্ পক্ষঃ অর্থাৎ সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট পক্ষকে বাধ কহে। হ্রদো বহ্নিমান্ প্রভৃতি স্থলে হ্রদরূপ পক্ষে বহ্নিরূপ সাধ্যের অভাব আছে বলিয়া উক্ত স্থানটী বাধের দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারিল। স্ব সাধ্য বিরুদ্ধসাধ্যাভাব-ব্যাপ্যবত্ত্ব পরামর্শ কালীন সাধ্য ব্যাপ্যবত্বা পরামর্শ বিষয় অর্থাৎ যেখানেএকটী পরামর্শ কালীন সাধ্যের অভাব ব্যাপক হেতু পাওয়া যায় তখন উভয় হেতুই সৎপ্রতি পক্ষিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধুমাৎ এইরূপ হেতুপ্রয়োগ কালে যদি বলা যায় যে পর্ব্বতো বহ্ন্যাভাববান্ জলাৎ তাহা হইলে উভয় হেতুই সৎপ্রতিপক্ষিত হইয়া পরিবে।

দৃষ্টান্ত স্থলও ঐ। পূর্ব্বে গুণ পদার্থের কেবল মাত্র লক্ষণ ও নাম মাত্র বলা হইয়াছে। তাহাও স্পষ্ট ভাবে বলা হয় নাই, তজ্জন্য আবার গুণ পদার্থের কথা বিশেষ রূপে এখানে বলিব। কর্ম্ম ভিন্ন যাহা ২ অসমবায়ি কারণ তাহা তাহাই গুণ পদার্থ, এই গুণ পদার্থ রূপ, রস, প্রভৃতি ভেদে চব্বিশ প্রকার, গুণত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, রূপত্ব রসত্ব প্রভৃতিও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জাতি পদার্থ, রূপ কেবলমাত্র পৃথিবী জল ও তেজ পদার্থে থাকে, বায়ুর রূপ নাই প্রত্যক্ষও হয় না স্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা অনুমান করিতে হয়। যাহার রূপ নাই তাহার বহিরিন্দ্রি জন্য অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং কালাদিরও প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে। পৃথিবীতে সকল প্রকার রূপই থাকে, কিন্তু জলে কেবল মাত্র শুক্ল ও তেজে কেবল মাত্র ভাস্বর শুক্ল রূপ থাকে। যদিও কৃষ্ণ প্রভৃতি অন্য কোন রূপ কনিন্দ্রি প্রভৃতি জলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঠিক নহে, পরন্তু পৃথিবী বৃত্তি রূপটাই জলে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এইরূপে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে, আধারের রূপ অনেক স্থলে আধেয়ে পরিক্ষিত হইয়া থাকে, একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়, আমাদের দর্শনকারগণ বলিয়াছেন পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী ভূত পদার্থ, ইহাতে ভূতত্ব আছে। ভূত

বলিতে দার্শনিকগণ আত্মা ভিন্ন বিশেষ গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

বিশেষ গুণ বলিতে বুদ্ধি,সুখ,দুঃখ,ইচ্ছা,দ্বেষ, যত্ন, রূপ রস, স্পর্শ স্নেহ, সাংসিদ্ধি, দ্রবত্ব, অদৃষ্ট, ভাবনা ও শব্দকে বুঝাইয়া থাকে। ভূত বলিতে কেহ যেন প্রেত যোনিকে না বুঝিয়া বসেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন ভূত পাঁচটী নয়, জলের পৃথক অস্তিত্ব নাই, জল পদার্থ অক্সিজন্ ও নাইট্রজন্ নামক দুইটী গ্যাস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং জল ভূত নহে, এইরূপ বহু স্থানে তাহারা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া হাবু ডুবু খাইতেছেন,উক্ত অক্সিজন ও নাইট্রজন যে কি পদার্থ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকেন উহারা গ্যাস !! যদি জিজ্ঞাসা করা যায় মহাশয় ! গ্যাস কি ? তাহার উত্তরে কেহ ২ বলেন অবশ্য সকলে নহে, অনেকে চুপ করিয়াই থাকেন, উহারা বাষ্প। আবার যদি জিজ্ঞাসা করা যায় বাষ্প কিসের ? রাগ করিয়া উত্তর করিয়া থাকেন জলের আর কিসের। * জল ভিন্ন কি আর অন্য কিছুর বাষ্প হইয়া থাকে ? তবে এখন দেখা যাইতেছে জলের সুক্ষ্ম অবস্থা হইতেই তাহাদের মতেও জল জন্মাইয়া থাকে। মূলীভূত জল না থাকিলে কখনও গ্যাস হইতে পারে না। জলও জন্মাইতে পারিত না, সুতরাং পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে যে তিনটী ভূত তাহা ঠিক নহে। রূপ সম্বন্ধেও উহারা অনেক কথা বলিয়া থাকেন, পরন্তু তাহাও বিচার সহ নহে, সকল কথা তুলিয়া বিচার করিতে গেলে প্রকৃত কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত হইবে

* জলের রাসায়নিক সংগঠন (Chemical Composition) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তটাকে লিখক মহাশয় যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। ভূয়োদর্শন-লব্ধজ্ঞান বা প্রমাণকে অস্বীকার করার চেষ্টা সত্যের অবমাননা মাত্র। বৈজ্ঞানিকগণের মতে জল একটী যৌগিক পদার্থ Compound), এবং অম্লজান (Oxygen) ও উদ্‌জান (Hydrogen) নামক দুইটী মৌলিক পদার্থের (Element) রাসায়নিক সংযোগে গঠিত।

প্রতিভা সম্পাদক।

মনে করিয়া আর অবান্তর বিষয় বেশী আলোচনা করিব না। রস নামক গুণ পদার্থটী কেবল মাত্র পৃথিবী ও জলে থাকে, পৃথিবীতে সকল প্রকার রসই আছে, জলে মাত্র মধুর রসই থাকে। গন্ধ পৃথিবী ব্যতীত অন্যত্র থাকে না, গন্ধ সুরভি ও অসুরভি ভেদে দুই প্রকার বলিয়াছেন, স্পর্শটী মাত্র পৃথিবী জল, তেজ ও বায়ুতে থাকে, স্পর্শও আবার শীত,উষ্ণ। অনুষ্ণা শীত ভেদে তিন প্রকার, শীত স্পর্শ জলে, উষ্ণ স্পর্শ তেজে, ও অনুষ্ণা শীত স্পর্শটী পৃথিবীতে থাকে, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ বিভাগ ইহারা নয়টী দ্রব্যেই থাকে। সংখ্যা একত্বদিত্বাদি ভেদে অনেক, পরিমাণ ও হ্রস্ব, দীর্ঘ অনু ও মহভেদে বহুবিধ, সংযোগ ও এক কর্ম্ম জন্য উভয় কর্ম্ম জন্য, সংযোগ জন্য, সংযোগাদি ভেদে অনন্ত, বিভাগ সংযোগের ন্যায় অনন্ত, পরত্ব ও অপরত্ব এই গুণদ্বয় পৃথিবী। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, ও মনে থাকে বুদ্ধি। সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কেবল মাত্র জীবাত্মাতেই থাকে, গুরুত্ব পৃথিবীও জলে থাকে, গুরুত্ব অদৃষ্ট ও ভাবনা এই গুণত্রয় অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। দ্রব্যত্ব পৃথিবী জল ও তেজে থাকে। দ্রবত্ব আবার নৈমিত্তি ও সাংসিদ্ধিক ভেদে দ্বিবিধ। নৈমিত্তিক দ্রব্যত্ব পৃথিবীও তেজে থাকে, সাংসিদ্ধিক দ্রব্যত্ব কেবল মাত্র জলে থাকে, যেহেতু জল স্বভাবতঃই দ্রব অর্থাৎ তরল, পৃথিবী ও তেজ, বহ্নি প্রভৃতির সংযোগে তরল হইয়া থাকে, স্নেহ কেবল মাত্র জলেই থাকে, সংস্কার পৃথিবী জল তেজ, বায়ু. আত্মা ও মনে থাকে। উক্ত সংস্কার বেগাখ্য ভাবনাখ্য ও স্থিতি স্থাপনাখ্য ভেদে তিন প্রকার, বেগাখ্য সংস্কার পৃথিবী জল তেজ বায়ু এবং মনে থাকে। ভাবনাখ্য সংস্কার কেবল মাত্র আত্মাতে থাকে এবং স্থিতি স্থাপনাখ্য সংস্কারটী পৃথিবী তেজ জল ও বায়ুতে থাকে। শব্দ আকাশেই থাকে, কেহ কেহ শব্দটীকে বায়ুর গুণ বলিয়া থাকে তাহা সত্য নহে। শব্দও বর্ণাত্মক ধন্যাত্মক ভেদে দুই প্রকার, বর্ণাত্মক শব্দ অ আ প্রভৃতি স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ, ধন্যাত্মক শব্দ মৃদঙ্গাদিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুণের প্রত্যক্ষের প্রতি অধিকরণের বা আশ্রয়ের মহত্ব ও উদ্ভূতত্ব সাধারণ কারণ।

আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ ও গুণ প্রত্যক্ষে কারণ, সেই জন্যই দ্ব্যণুকস্থ পরমাণু বৃত্তি গুণাদির প্রত্যক্ষ হয় না। উহারা অতীন্দ্রিয়, অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য বৃত্তি গুণেরও প্রত্যক্ষ হয় না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতে দ্রব্যে গুণোৎপত্তি লইয়া কতকটা মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট ঘটে অগ্নি সংযোগ করিলে শ্যামরূপ নষ্ট হইয়া উক্ত ঘটে রক্ত রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে পরন্তু বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন, অবয়বিতে পাক সম্ভবত হয়না। পরমাণুতেই পাক হইয়া থাকে। রূপান্তরের উৎপত্তি পরমাণুতেই হইয়া থাকে। অবয়বে বা অবয়বিতে পাক হয় না। দ্রব্যে অগ্নি সংযোগ করিলে পরমাণুতে পাক হইয়া অর্থাৎ অন্যরূপ উৎপত্তি হইয়া, পরে ঘটে কারণ গুণানুসারে রূপ জন্মিয়া থাকে। এ বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মত দ্বয়ে নিরপেক্ষ চিন্তা করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায়, নৈয়ায়িক মতে অগ্নি সংযোগ বশতঃ ঘটের নাশ ও পুনরায় উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া নৈয়ায়িক মতই সাধু। বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিষয় পূর্ব্বে যাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই তাহাই এখানে কিঞ্চিৎ বলিব। বুদ্ধি আর জ্ঞান একই, ঐ জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত, স্মরণ ও অনুভব, যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে, স্মরণও আবার দুইভাগে বিভক্ত, তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ জ্ঞানং প্রমা ইহাই প্রমার লক্ষণ, ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘটে ঘটত্ব প্রকারক জ্ঞানকেই প্রমাজ্ঞান বলিয়া থাকে।

আর তদভাব বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং অপ্রমা, ইহাই অপ্রমা বা অযথার্থের লক্ষণ অর্থাৎ ঘটত্বের অভাব বিশিষ্ট পটে যদি ঘটত্ব প্রকারক জ্ঞান হয় তাহাকেই অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান বলিয়া থাকে। পূর্ব্বানুভূত সংস্কারই স্মরণের কারণ, অনুভব আবার প্রত্যক্ষ, অনুমতি, উপমিতি, ভেদে চারি প্রকার, ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ পদ জন্য যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে শব্দ ও সাদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা যে জ্ঞান সম্পাদন হইয়া থাকে তাহাকে উপমিতি বলিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়া আছে, শাব্দ জ্ঞান উপমিতি বৈশেষিক দর্শনকারগণ স্বীকার করেন না, অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান ও সংশয় বিপর্য্যয় ভেদে দুই প্রকার। যে পদার্থের সংশয় হইয়া থাকে ঐ পদার্থের বৈশেষিক দর্শন অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞান গোচর না হইলে ভাব ও অভাব রূপ কোটীদ্বয়ের স্মরণ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে সংশয় বলিয়া থাকে, অয়ং পুরুষো নবা অর্থাৎ এই জিনিষটী পুরুষ না স্থাণু এইরূপ যে জ্ঞান হইয়া থাকে ইহাই সংশয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। জ্ঞাতব্য পদার্থে বিশেষ জ্ঞান না থাকিয়া কেবল মাত্র এক কোটী স্মরণ হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাকে বিপর্য্যয় জ্ঞান বলিয়া থাকে। ইহা রঙ্গিন যে রজত এইরূপে প্রকৃত যে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ঐ জ্ঞানই বিপর্য্যয়ের অন্তর্ভুক্ত, পৃথক কিছু নহে। ব্যাপ্তি জ্ঞানের ব্যভিচার শঙ্কা নিবারক, তর্ক নামক একটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা যদি এই প্রকার হয় তবে এই প্রকার হউক, এইরূপ থাপত্য ভাব দ্বারা আপদকের অভাব নির্ণয়কে তর্ক বলিয়া থাকে, তর্কটী এক প্রকার আপত্তি স্বরূপ যে প্রকার পর্ব্বতে যদি বহ্নি না থাকে তবে ধুমও না থাকুক এইরূপ আপত্তিই তর্কের দৃষ্টান্ত হইবে। তর্ক পদার্থটীও নৈয়ায়িক মতে বিপর্য্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য দার্শনিকগণ অর্থাপত্তি ঐতিহ্য সম্ভব ও অভাবরূপ আরও চারটী প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন, পরন্তু নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনকার কেহই উক্ত প্রমাণ চতুষ্টয় স্বীকার করেন না, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনকার বলিয়া থাকেন উক্ত প্রমাণগুলি অনুমানের মধ্যে ও ঐতিহ্যটী নৈয়ায়িক মতে শব্দের মধ্যে পরিগণিত। বলিতে পারা যায়, অর্থাপত্তি প্রমাণের অনুপপত্তি জ্ঞানই কারণ, পীন দেবদত্ত দিনে খায় না বলিলে, রাত্রিতে দেবদত্ত ভোজন করে, তাহা অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা পাওয়া যায়, যেহেতু ভোজন না করিলে লোক কখনও স্থূল বা পীন হইতে পারে না সুতরাং পীনত্বের অনুপপত্তি জ্ঞানটীই রাত্রিভোজনশীলতার কারণ হইয়া পরিতেছে, উক্ত অর্থাপত্তি প্রমাণ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয় মতেই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ব্যপ্তি দুই প্রকার অন্বয়-ব্যাপ্তি' ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি, অৎসম্বে

তৎসত্বা অন্বয় ব্যাপ্তির লক্ষণ অর্থাৎ পর্ব্বতে ধূম আছে সুতরাং বহ্নিও আছে ইহাকেই অন্বয়ব্যাপ্তি বলিয়া থাকে, আর তদসত্বে তদসত্বা ইহাকেই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলিয়া থাকে, অর্থাপত্তি স্থলেও দেখা যাইতেছে, যেখানে ভোজনাভাব আছে সেখানে পীনত্বও নাই, বহ্নি নাই সুতরাং ধূমও নাই, ইহাকেই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলিয়া থাকে, অর্থাপত্তি স্থলেও দেখা যাইতেছে যেখানে ভোজনাভাব আছে সেখানে পীনত্বও নাই, সুতরাং ভোজনের অসত্বা নিবন্ধন পীনত্বের অসত্বাও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি ব্যতীতআর কিছুই নয়। এতাদৃশ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি রূপ অনুমান দ্বারাই যদি অর্থাপত্তি প্রমাণের কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে আর অতিরিক্ত স্বীকারের প্রয়োজন কি? মীমাংসকগণ অর্থাপত্তি প্রমাণটীকে বিশেষরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্যান্য অভাবাদি প্রমাণ গুলিতে এইরূপে অনুমানের অন্তর্গত হইতে পারিবে সুতরাং অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইতরব্যাবর্ত্তক লক্ষণ গুলিতে দোষ দেখাইবার জন্য দার্শনিকগণ অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব নামক তিনটী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যত্‌কিঞ্চিল্লক্ষ্যে লক্ষণস্য অগমনং অব্যাপ্তি অর্থাত যাহার লক্ষণ করা হইবে তাহার মধ্যে একটী স্থানে লক্ষণটী সঙ্গত না হইলেও ঐ লক্ষণটী অব্যাপ্তিগ্রস্ত হইবে, যদি বলা যায় যে কপিলত্বং গোত্বং, অর্থাত্‌ যাহা কপিল তাহাই গরু, তাহা হইলে লক্ষণটী লক্ষ্যস্থলের একদেশ বৃত্তি হওয়ায়, অব্যাপ্তি গ্রস্থ হইয়া পরিবে, যেহেতু শুক্ল গরুতে কপিলত্ব নাই। আর যদি বলা যায় শৃঙ্গীত্বং গোত্বং অর্থাৎ যাহার শৃঙ্গ আছে তাহাই গরু, ইহাও প্রকৃত লক্ষণ হইবে না, কারণ শৃঙ্গি মহিষেও রহিয়াছে। সুতরাং মহিষে লক্ষণটী অতি ব্যাপ্তিগ্রস্থ হইয়া পরিল, যে লক্ষণ লক্ষ্য বৃত্তি হইয়া অলক্ষ্যেও সঙ্গত হইয়া থাকে তাহাকে অতিব্যাপ্তি বলিয়া থাকে, লক্ষ্য স্থল মাত্রেই যে লক্ষণ সঙ্গত না হয় তাহাকে অসম্ভব বলিয়া থাকে, একশফত্বং গোত্বং এইরূপ গরুর লক্ষণ করিলে কোন গরুতেই একশফত্ব নাই বলিয়া ঐ লক্ষণটী অসম্ভব গ্রস্ত হইয়া পরিবে, লক্ষণ প্রবিষ্ট লক্ষণত্ব দ্বারা স্বরূপকে বুঝাইয়া থাকে।

দার্শনিকগণের মতে পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য নামক দুই পারিভাষিক শব্দ আছে। যে ধর্ম্মটী যে যে পদার্থের উপর থাকে সেই ধর্ম্মটীকে সেই সেই পদার্থে সাধর্ম্ম্য বলিয়া থাকে। এবং যে ধর্ম্মটী যে যে পদার্থের উপর না থাকে সেই ধর্ম্মটী সেই পদার্থের বৈধর্ম্ম্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, প্রথমতঃ সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্যের কথাই বলিতেছি, জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, ও অভিধেয়ত্ব নামক চারিটী ধর্ম্ম সপ্ত পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য হইয়া থাকে, জ্ঞানের বিষয়ত্বকে জ্ঞেয়ত্ব, ঈশ্বরেচ্ছা বিষয়ত্বকে বাচ্যত্ব, প্রমাজ্ঞানের বিষয়ত্বকে প্রমেয়ত্ব ও শব্দ শক্যত্বকে অভিধেয়ত্ব বলিয়া থাকে, উক্ত চারিটী ধর্ম্ম জাগতিক সকল পদার্থের উপরই আছে, ভাবত্ব নামক ধর্ম্মটী দ্রব্য, গুণ, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায়ের উপরে আছে, সন্ অর্থাৎ আছে এই জ্ঞানের বিষয়কেই ভাব বলিয়া থাকে। সেই ভাবের ধর্ম্মই ভাবত্ব অনেকত্ব বা বহুত্ব নামক ধর্ম্মটী দ্রব্য গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, ও অভাবের উপরেই থাকে এবং উক্ত পদার্থের অনেকত্ব ও সাধর্ম্ম্য হইয়া থাকে, সমবায় সম্বন্ধ প্রতিযোগিত্ব নামক ধর্ম্মটী বা সমবায়িত্বটী দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য ও বিশেষ এই কয়েকটী পদার্থের সাধর্ম্ম্য হইয়া থাকে। সত্বা নামক ধর্ম্মটী কেবল মাত্র দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মেরই সাধর্ম্ম্য, নির্গুণত্বটী দ্রব্য বাদে সকল পদার্থেরই সাধর্ম্ম, নিষ্ক্রিয়ত্বও ঐরূপ, গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্ম, কারণত্ব সপ্ত পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য হইয়া থাকে, সমবায়ি কারণত্ব কেবল মাত্র দ্রব্যের ধর্ম্ম, অসমবায়ি কারণত্ব গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য, আশ্রিতত্ব সপ্ত পদার্থেই থাকে, গুণাশ্রয়ত্ব ও কর্ম্মাশ্রয়ত্বটী কেবল দ্রব্যেই থাকে, এইরূপে যে ধর্ম্মটী যে যে পদার্থের সাধর্ম্ম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেই কর্ম্মটী তৎতৎ ভিন্নদর্থের বৈধর্ম্ম্য বলিয়া জানিবেন।

সম্প্রতি ক্ষিত্যাদি নয় পদার্থের সাধর্ম্মের কথা বলিতেছি। পরত্ব ও অপরত্ব ধর্ম্ম দুইটী ক্ষিত্যাদি দ্রব্য চতুষ্টয়ের সাধর্ম্ম্য বলিয়া জানিবেন, মূর্ত্তত্ব নামক ধর্ম্মটীও ক্ষিতি জল তেজঃ বায়ু এই চারিটী দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য হইয়া থাকে, পরিমেয় বর্ত্তকেই মূর্ত্ত বলিয়া থাকে। ক্রিয়াশ্রয়ত্ব ও বেগাশ্রয়ত্ব নামক ধর্ম্ম-

দ্রব্যও উক্ত চারিটী দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য, পরম মহত্ত্ব ও বিভুত্ব অর্থাৎ সর্ব্বত্র বর্ত্তমানত্ব ও পরম মহৎ পরিমাণত্ব নামক ধর্ম্ম দুইটী ব্যোম্ দিক, কাল, ও আত্মা, এই চারিটী দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য হইয়া থাকে, ভূতত্ব ক্ষিত্যাদি পাঁচটী দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য স্পর্শাশ্রয়ত্ব ও দ্রব্যোরম্ভকত্ব, ক্ষিত্যাদি চারিটী দ্রব্যের ধর্ম্ম অব্যাপ্য বৃত্তি বিশেষ গুণবত্ব ও ক্ষণিক বিশেষ গুণবত্ব রূপ ধর্ম্মদ্বয় কেবল মাত্র আকাশও আত্মার ধর্ম্ম, রূপবত্ব দ্রবত্ব বত্ব ও প্রত্যক্ষ বিশষত্বরূপ ধর্ম্ম ত্রয় কেবল মাত্র ক্ষিতি অপ ও তেজের সাধর্ম্ম্য, গুরুত্ব রসবত্বরূপধর্ম্ম দ্বয় ক্ষিতি ও অপের সাধর্ম্ম্য, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব ক্ষিতি ও তেজের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। বিশেষ গুণ বত্বটী ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ব্যোম ও আত্মার ধর্ম্ম, দ্রব্যত্ব ও গুণবত্বটী সকল দ্রব্যেই আছে, উহা সকল দ্রব্যেরই সাধর্ম্ম্য হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতে উৎপত্তি কাল ব্যতীত নির্গুণ দ্রব্য নাই। উৎপত্তি কালে কোন দ্রব্যেই ক্ষণ, কাল, গুণ বা কর্ম্ম থাকে না॥ আজ এই স্থানে প্রবন্ধ শেষ করিলাম। বক্তব্য আরও বহু আছে, অবসর মত বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি।

শ্রীভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

বাংলা বানান সমস্যা।

(প্রতিবাদ)

কয়েকদিন পূর্ব্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের লিখিত "বাঙ্গালা বানান সমস্যা" শীর্ষক একটী সুন্দর ও মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষাভাষী তথা বাংলা ভাষার উন্নতিকামী সমগ্র বাংগালী ও অবাংগালীর সম্বন্ধে একটী গুরুতর সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সমস্যাটী অবশ্য বাংলা দেশে একেবারে নূতন নয়। অনেক দিন হইতে অনেকেই যে বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলায় হাড়ে হাড়ে চটিয়া আছেন, তাহা প্রচলিত কোন কোন শব্দের বানানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিদ্রোহ ঘোষণা দেখিয়াই সহজে উপলব্ধি করা যায়। তবে অধ্যাপক সাহেবের মত বিষয়টাকে পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ ব্যবহারিক আকার দিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই। সহজ কথায় অধ্যাপক সাহেবের সমস্যাটী এই যে তিনি বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় বর্ণের কিঞ্চিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া তৎসঙ্গে বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দগুলির বানান সংস্কার করিতে চাহেন। যে হেতু বর্ত্তমান বাংলা বানান ব্যাপারে পুরাদস্তর অনিয়মের একচেটিয়া রাজত্ব চলিতেছে। প্রচলিত শব্দগুলির অধিকাংশই বানান বিষয়ে কোন ধরা বাঁধা বা ন্যায়সঙ্গত নিয়মের অনুবর্ত্তী নয়। কোন শব্দের বানান খাঁটি সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালা। আবার কোন শব্দ প্রাদেশিকতার ছাঁচে গড়া। কোন শব্দ আধা সংস্কৃত, আধা প্রাকৃত বা আধা খামখেয়ালীতে খিঁচুড়ীর নমুনায় গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার কোন শব্দ উচ্চারণ মাফিক হইতে যাইয়া, খামখেয়ালীর হাত হইতে একদম নিষ্কৃতি না পাইয়া দো-টানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ঠিক একই জাতীয় দুইটী "তদ্ভব" "তৎসম", "দেশজ" বা অন্য জাতীয় শব্দের একটীতে হয়ত সংস্কৃতের বানান চালান হইতেছে ও ণত্ব ষত্বের নিয়মগুলি হুবহু মানিয়া চলা হইতেছে। কিন্তু অন্যটীতে ইহার কিছুই করা হইতেছে না। এমত অবস্থায় মন স্বতঃই এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিগড়াইয়া উঠে। কেবল ইহাই নয়, আমরা অনেক সময় যাহা ভাষায় লিখি, তাহা পড়ি না এবং যাহা লিখি তাহা কথায় বলি না। সুতরাং মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের আরোপিত কলঙ্কে কলঙ্কী বাঙ্গালী জাতির "দুর্জ্জয় সাহসে" লেখার ও বলার এবং পড়ার ও লেখার এই গরমিল উঠাইয়া দিয়া নিজেদের কথার ও কাজের ঐক্য প্রদর্শন করিতে বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত। অধিকন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বাংলা শব্দের বানান নির্ভুল ভাবে আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। অতএব প্রচলিত পদ্ধতি বাতিল করিয়া ঠিক "উচ্চারণ মত" বানান শিখিতে গেলে "যে এখন পাঁচ বছর বানান শিখিয়াও ভুল করিয়া ফেলে, সে

জ এক মাসে বানান শিখিতে পারিবে। ইহা আমাদের মত মূর্খের দেশে বড় কম একটা লাভ নয়”।

বেশ ভাল কথা। ভাষার উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রের ত ইহাতে সহানুভূতি থাকিবেই; অধিক জাতীয় কলঙ্কমোচনের জন্যও ইহাতে আপামর সকলের একটা বিশেষ প্রাণের টান থাকিবে—অন্ততঃ থাকা উচিত।

সমস্ত বাংলা শব্দের বানান “সংস্কৃতের হুবহু নকল” কোন দিন ছিল না; এখনও নয় এবং ভবিষ্যতেও কখন হইবে না। বাংলা শব্দকোষে খাঁটি সংস্কৃত, বিকৃত সংস্কৃত বা তদ্ভব, তৎসম, দেশজ, খাঁটি যাবনিক, বিকৃত যাবনিক প্রভৃতি নানা জাতীয় শব্দ আছে। এই সকল শব্দের বানানে কোন সাধারণ নিয়ম নাই এবং সেজন্য বাংলা বানান আয়ত্ত করা দুরূহ। অতএব ইহার সংস্কার সাধিত হওয়া দরকার।

কিন্তু কথা হইতেছে কি উপায়ে এবং কি প্রণালীতে সংস্কার করা হইবে? বাংলার অধিকাংশ শব্দই যখন অনাথ আশ্রমে প্রাপ্ত বালকবালিকার মত এবং বিশেষতঃ বাংলা ভাষা যখন সোজাসুজি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নয়, তখন বাংলা বানানে সংস্কৃতের বিধি আমদানী করার জবরদস্তি ছাড়া অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। অন্য কোন ভাষার বিধিও এখানে প্রবর্ত্তন করা চলে না। কেননা, তাহাদের প্রভাব বাংলা ভাষার উপর ততটা ব্যাপক নহে। সুতরাং কোন বিশেষ ভাষার বিধি বাংলায় না চালাইয়া, এমন একটা বিধি যদি প্রবর্ত্তন করা যায়, যাহাতে সেই বিধিটা সকল শব্দের উপরই সমান ভাবে আরোপ করা যাইতে পারে এবং তাহা শব্দের বানানের মূল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে, তবেই তাহা সার্ব্বজনীনরূপে গ্রাহ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এইরূপ একটা প্রণালী স্থাপন করিবার জন্যই অধ্যাপক সাহেব “উচ্চারণ মত” বানান সংস্কার করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটী প্রথম দৃষ্টিতে উত্তম বলিয়াই মনে হয়। সরলতাই ভাষার চরম উন্নতি। এক সময় ছিল যখন লেখক কলম হাতে নিয়া বসিলেই আপনাকে প্রেরণা প্রাপ্ত বা তজ্জাতীয় কিছু একটা মনে করিতেন এবং তাঁহার কল্পনায় যাহা আসিত এরূপ সম্ভব অসম্ভব দুর্ব্বোধ ও অবোধ্য শব্দের পর শব্দ কলমের মুখ দিয়া ছুটাইয়া বাহবা আদায় করিতেন। সে যুগ আর আজ নাই। এখন লেখক অভিধানের দুর্ব্বোধ জটিল শব্দে চিন্তা করেন না; আর সহজ সরল নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দে ভাবিয়া অভিধান খুঁজিয়া অপ্রচলিত দুর্ব্বোধ শব্দ দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে যান না। অর্থাৎ তাঁহারা মেঘের কথা ভাবিয়া “মেঘই” লিখেন, “ইরম্মদ” লিখেন না। আমাদের ভাষায় যদি এইরূপ সরলতা আদর্শ হইতে পারে, তবে আমাদের বানানে কেন সে আদর্শ চলিতে পারিবে না? চিন্তার অনুরূপ লেখা যদি ভাষায় চলিতে পারে এবং তাহা ভাষার উন্নতির পরিচায়ক হয়, তবে উচ্চারণের অনুরূপ বানান কেন চলিবে না এবং কেনই বা তাহা বানানের উন্নতিকর বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না?

মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহা কতগুলি উচ্চারিত শব্দের সমষ্টি মাত্র। এই উচ্চারিত শব্দগুলিকে যথাযথ প্রকাশ করাই বর্ণ বা অক্ষরের কার্য্য। সুতরাং মানুষের ভাষা প্রকাশক শব্দের উচ্চারণের সম্যক্ পরিচয়ের জন্য যে অক্ষরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছে, সে অক্ষর যদি একত্র সন্নিবেশিত হইয়া কোন শব্দের যথাযথ উচ্চারণের পরিচয় দিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহার সার্থকতা কি? বানান যে গোড়ায় সঙ্গীতের স্বরলিপির নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক চিহ্নের মত অবিকল উচ্চারণ অনুযায়ী (Phouetic) ছিল এবং এখনও আছে, তাহা কোন সন্দেহ নাই। তবে কথা এই যে, অনেক স্থানেই বানানের সেই উচ্চারণগত বা Phonetic উদ্দেশ্যটা কতকটা আমরা বিজ্ঞতার ভানে বা অজ্ঞতার চাপে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেই। আর কতকটা স্থান কালের দূরত্ব ও মানুষের জীবন যাপন প্রণালীর বিভিন্নতা হেতু ক্রমশঃ বদলাইয়া যায়। এইরূপ বদলাইয়া যায় বলিয়াই সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টির সম্ভব হইয়াছে এবং আমরা আজ বাংলা বানানের সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতে বসিয়াছি।

বাংলা ভাষাই যে বানানের মূল উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণে গোল পাকাইয়া একেবারে একলাটি মাঠে মারা যাইতে বসিয়াছে, তাহা নয়। এ সম্পর্কে অন্যান্য ভাষার অবস্থাও ইহা হইতে বিশেষ পৃথক নয়। বাংলা ভাষার বর্ত্তমান"কাল" ও "কাল"চোখ এই দুই স্থানে "কাল" শব্দটীর উচ্চারণে অনেক তফাৎ বটে। দ্বার্থ বোধক ও বিশেষ্য বিশেষণ বাচক পদের মধ্যে এরূপ তফাৎ অন্য ভাষায়ও স্থাহাৎ কম নয়। ধরুন আমাদের রাজকীয় ভাষার কথা। ইংরেজীর দোহাই দিলে নিশ্চয়ই আর কোন আপত্তি থাকিবে না। ইহা সাপের মাথায় ধূলা পড়ার সামিল। ইংরেজীর "ওয়ান্ মিনিট" (one minute) এবং "মাইনিউট ডিটেইল্স্" (minute details) এই দুই জায়গায় এক minute শব্দটীর দুই রকম উচ্চারণ ও অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। "অনেক" আর "এক" এই দুই স্থানের "এ"-কারের দুই রকম উচ্চারণ। ইংরেজীতে "বাট্" (But) ও "পুট্" (put) এই দুই শব্দে "ইউ"র (u) উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক এবং "her", "here", "set" প্রভৃতি শব্দে এক "e"-র উচ্চারণ বহু প্রকার। স্বরের অল্পতা হেতু এক একটা স্বরকে অনেক সময় অনেক প্রকার উচ্চারণের কাজ চালাইতে হয় বলিয়াই এই বিভ্রাট। যদি বিভিন্ন উচ্চারণের জন্য বিভিন্ন স্বরের সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকিত, তবে এইরূপ হইত না।

তারপরে আমরা যাহা লিখি তাহা স্থান বিশেষে পড়ি না বা যাহা কথায় বলি তাহা লিখি না। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে "লক্ষ্মী" শব্দটী। বর্ণবিন্যাস করিলে দেখা যায় ইহাতে ল্+অ+ক্+ষ্+ম্+ঈ মোট এই ছয়টী বর্ণ আছে। কিন্তু উচ্চারণের সময় আমরা ইহার ষ্ ও ম্ এর আদৌ উচ্চারণ করি না। ইংরেজীতেও এরূপ অনুচ্চারিত বর্ণ বিশিষ্ট শব্দের অপ্রাচুর্য্য নয়। alms, Psychology, depot, Phthisis প্রভৃতি বহু শব্দ এই সঙ্গে তুলনীয়। Colonel শব্দটীর উচ্চারণ "কর্ণেল"। এখানে কেবল অনুচ্চারিত বর্ণ নয়, ভিন্ন ব্যঞ্জনের পর্য্যন্ত আমদানি হইয়াছে। (Cf. Lieutenant, aide-de-camp প্রভৃতি শব্দ)। যাক্ আর দৃষ্টান্ত দেওয়া বৃথা। রাজার ভাষায় আছে বলিয়া আমাদের ভাষায় ও যে থাকিতে হইবে, বা না থাকিলে নূতন আমদানি করিয়া লইতে হইবে, রাজদ্রোহের ভয় থাকিলেও, আমি একথা বলিতেছি না। তবে এ গণ্ডগোলের হাত হইতে মুক্তির কোন পথ আছে বলিয়া বিশ্বাস নয়। দুই চারিটী শব্দের বানানের সংস্কার ব্যঞ্জনবর্ণ অল্প বিস্তর বদলাইয়া করা যাইতে পারে; কিন্তু স্বরের উচ্চারণের বিশুদ্ধ সংস্কার ঠিক ততদিন অসাধ্য থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত একই স্বরকে বিভিন্ন উচ্চারণের symbol হইতে হইবে, অর্থাৎ কোনদিনই স্বরের উচ্চারণ মত পরিবর্ত্তন সাধ্য হইবে না।

রাজভক্ত বলিয়াই হউক আর অন্য যে কোন কারণেই হউক ইংরেজ জাতির সংরক্ষণশীলতা গুণটী নিতান্ত দূষণীয় ভাবেই আমাদের মজ্জাগত। জাতি হিসাবে আমরা নিতান্ত বৈজ্ঞানিক নই, ইহাও সর্ব্ববাদি সম্মত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক হইয়াও যে বানান শোধনের চেষ্টা ইংরেজের সংরক্ষণশীল গোড়ামির নিকট বেশী আমল পায় নাই, তাহা যে অবৈজ্ঞানিক আমাদের সংরক্ষণশীলতার সংস্কারের ব্যূহ সহজে ভেদ করিতে পারিবে, এমন বিশ্বাস নয়। তবুও একথা বলা যাইতে পারে যে বানান সংস্কার কার্য্যে নৈতিক সাহস দেখাইতে পারেন এমন লোকের দেশে একেবারে অভাব হইবে না—যদি সংস্কার কার্য্যটী বিজ্ঞান ও যুক্তি সম্মত হয় এবং তাহাতে ব্যবহারিক লোকসান না থাকে।

যাহা হউক উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হইলে প্রথমেই একটা বড় লাভ দেখা যায়, যে ইহাতে অনেক লেঠা চুকিয়া যাইবে ও সাধারণের পক্ষে তাহা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে। যাহা এখন পাঁচ বছরেও আয়ত্ত করা যায় না, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক কম সময়ে আয়ত্ত করা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ এরূপ বানান সহজ হইবে—বর্ত্তমানের মত যথা তথা "অঙ্গ" লিখিতে কলমের দন্ত ভঙ্গ হইবার তত ভয় থাকিবে না। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বেশ সুখের কথা। সময়ের অল্পতা একটা কম লাভ নয়; সরলতার কথাটা বরং বাদই

দিলাম। কিন্তু এই দুইটী বিশেষ সুবিধা থাকা সত্বেও "উচ্চারণ মত" বানানের বিরুদ্ধে যে একটী ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহা স্বয়ং প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ই তুলিয়াছেন ও নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন। বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উচ্চারণ প্রচলিত, সুতরাং কোন্ উচ্চারণকে আদর্শ ধরিয়া বানান সংস্কার করা হইবে? লেখক মহাশয় ইহার উত্তরে বলিতেছেন "যাহা স্কুল কলেজে শিখান হয় ও পাঁচ জায়গার ভদ্রলোক এক জায়গায় হইলে কথা বার্ত্তায় ও বক্তৃতায় ব্যবহার করা হয়" এইরূপ "শিষ্ট উচ্চারণ" সম্মত একটা সাধারণ ভাষাকেই আদর্শ (standard) করিয়া তদনুরূপ সমগ্র লেখ্যভাষাকে পরিচালিত করিতে হইবে। কিন্তু যত গণ্ডগোল সব এইখানে। বর্ত্তমান বাংলা ভাষার গতি কোন্‌দিকে চলিয়াছে বা বাংলা লেখ্যভাষাকে বড় বড় সাহিত্যিক পুঙ্গবেরা জোর করিয়া কোন্‌দিকে টানিয়া নিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রবন্ধ লেখকের অজ্ঞাত নাই। বর্ত্তমানে বাংলা ভাষার যদি গতি বা আদর্শ কিছু থাকে তবে সত্যের মাথা না খাইয়া বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, যে তাহা কলিকাতার প্রাদেশিকতা। স্কুল, কলেজে যাহা শিখান হয়, তাহার আদর্শ থাকা দুরের কথা, মাথা মুণ্ডেরই সন্ধান মিলা দুষ্কর। ইহা আমা অপেক্ষা অধ্যাপক সাহেবই বেশী জানেন; সুতরাং সেটাকে আদর্শ করার আশা কল্পনা মাত্র। তারপর সভাসমিতিতে একত্র মিলিত হইলে ত বক্তাদের মুখে কলিকাতার ভাষার তুব্‌ড়ি ছোটে! "পাঁচ জায়গার ভদ্র লোক একজায়গায় হইলে" ত আমরা সকলেই একেবারে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক সাজিয়া বসি। আমাদের বাড়ী সুদুর শ্রীহট্টেই হউক আর সুন্দরবনের ধারেই হউক, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেই হউক আর দার্জ্জিলিংই হউক কথাবার্ত্তায় ও বক্তৃতায় ত আমরা সকলেই হুবহু "কেল্‌-কেশিয়ান"! যদিও আমাদের ধার করা বাকা পুচ্ছের ফাঁকে ফাঁকে স্বরের ও শব্দের প্রাদেশিকতা স্বপ্রকাশ পাইয়া নিতান্ত করুণ ও হাস্য রসোদ্রেকের কারণ হয় মাত্র! কলিকাতা অঞ্চলের প্রাদেশিকতাটা আমাদের ধাতের সঙ্গে কিরূপ মিশিয়া গিয়াছে এবং আমরা সেটাকে আদর্শরূপে চালাইতে কিরূপ ব্যগ্র তাহার সাক্ষ্য স্বয়ং প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ই নিজের নিতান্ত অজ্ঞাতসারে দিয়া ফেলিয়াছেন। (আমরাও যে সময় সময় না দেই, তা নয়।) স্বরবর্ণগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন "যত, তত প্রভৃতি শব্দের শেষের "হ্রস্ব ওকার" দেখাইবার জন্য অক্ষরের নীচে কষি দিলেই চলিতে পারে, যেমন য‌ত্, ত‌ত্, অ‌তি, ছো‌ট্ ইত্যাদি"। কোন বিধান অনুসারে তিনি যত, তত, প্রভৃতির উচ্চারণে "হ্রস্ব ওকারের" ব্যবস্থা দিতেছেন? পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন লেখক নিজেদের প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুযায়ী যতো, ততো ইত্যাদি লিখেন বলিয়াই কি তিনি তাহা আদর্শ বাংলায় চালাইতে চাহেন? না, অন্য কোন যুক্তি আছে? এরূপ "হ্রস্ব ওকার" যুক্ত উচ্চারণ এইসকল শব্দে পূর্ব্ববঙ্গের কোথায়ও নাই। বিশেষতঃ অ-কারের স্থানে ও-কারের উচ্চারণ ব্যাকরণ, প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত বা অন্য যা কিছুর দোহাই দেওয়া হউক, কোন প্রকারেই যুক্তি সঙ্গত নহে। তবে এ ব্যবস্থা কেন? শুধু কি কলিকাতার প্রাদেশিকতা চালাইবার উদ্দেশ্য? যে জাতির কথায় বার্ত্তায়, লেখায় ও বক্তৃতায় সর্ব্বত্রই একটা ক্ষুদ্র সহরের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের প্রাদেশিক ভাষাকেই আদর্শ করিতে পারিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে, তাহাদের নিকট কোন সার্ব্বজনীন আদর্শের আশা করা বাতুলতা মাত্র। আর তাহাদের ভাষার বানান সংস্কারের চেষ্টাও অনর্থক বলিয়া মনে হয়। কেননা এরূপ একটা ক্ষুদ্র "সহুরে" ভাষার আয়ুষ্কাল ও ভাবী উন্নতি কতদূর সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা ততটা শক্ত নয়।

যাহা হউক বাংলা বানান সংস্কারে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও মতের ঐক্য থাকিলেও একথা বলিতে বাধ্য হইলাম যে যতদিন বাংলা ভাষা এই দুষ্ট "একদেশী" প্রাদেশিকতার প্রভাব মুক্ত না হইবে, ততদিন বাংলা বানানের সংস্কার তথা বাংলা ভাষার উন্নতি কোনটাই হইবে না। কাগজে কাগজে ও মুখে মুখে লেখালেখি ও আলোচনা যথেষ্ট হইতে পারিবে

কিন্তু ফল ফলিবে অষ্টরম্ভা। যে ভাষা একটা ক্ষুদ্র সহরকে গণ্ডী করিয়া গড়িয়া উঠে তাহার পুষ্টি ও পরিণতি তদনুযায়ী হয়। শ্রীযুক্ত বিজয় মজুমদার মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে "বঙ্গবাণীতে" এ সম্বন্ধে একটু সাবধানতার সুর তুলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সুর অরণ্যে রোদনেই পর্য্যবসিত হইবে। কেননা এ পথে বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত বাধা মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে হইলে আবার একজন অগস্ত্যের প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রধান সাহিত্যিকদের অধিকাংশেরই বাস খাস কলিকাতায় বা তাহার আশে পাশে। বিশেষতঃ স্বয়ং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—যিনি বাংলা ভাষাকে একটা নূতন ভাব, নূতন গরিমা, নূতন আদর্শ দিয়াছেন বলা হয়, তিনি কলিকাতার আজন্ম বাসেন্দা। তিনি যখন নিজেদের প্রাদেশিকতাটাকে সারা বাংলার ভাষার আসনে বসাইয়া "খাচ্ছি," "যাচ্ছি," "আসুন," "দুটো মুলোর শাঁক" ইত্যাদি লিখেন তখন কোন্ লেখকের এতখানি সাহস আছে জানি না, যিনি "খাচ্ছির" স্থানে নোয়াখালীর "খাইয়ের", "যাচ্ছি" স্থানে "যাইয়ের" "আসুনের" স্থানে "আইয়েন" এবং "দুটো মুলোর শাকের" স্থানে কুমিল্লার "দুগা মোলার হাগ" লিখিতে পারেন? যদি ও এ সকল শব্দই মূলতঃ এক—কেবল মধ্যে প্রাদেশিক উচ্চারণ গত একটু তফাৎ মাত্র। যুক্তি খুঁজিলেও তাহা দুর্ঘট নহে। যে যুক্তির জোরে কলিকাতার রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার প্রাদেশিকতা ভাষায় চালাইতে পারেন, ঠিক সেই যুক্তি বলে ঢাকা বা ময়মনসিংহের, চট্টগ্রাম বা ছিলেটের লোক তাঁহার প্রাদেশিকতা চালাইতে পারিবেন না কেন? যাঁহারা কোন প্রাদেশিক ভাষা নিয়া একটু নাড়াচাড়া করেন; তাঁহারা জানেন, যে প্রাদেশিক ভাষার (Provincial dialect) মধ্যে হাজার গলৎ থাকিলেও অনেক মূল্যবান্ রত্ন নিহিত আছে, যাহাকে খুঁজিয়া ও বাছাই করিয়া উপযুক্ত জহুরীর হাতে দিতে পারিলে ভাষা জননীর অঙ্গের গৌরবময় অলঙ্কারে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু সে আশা অলীক! অন্যে পরে কা কথা! স্বয়ং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্ মহাশয়ও নাকি তাঁহার পূর্ব্বে "আদর্শ বাংলায়" লিখিত বইগুলিকে বর্ত্তমানে কলিকাতার প্রাদেশিকতার ছাঁচে গড়িয়া লইতেছেন! আর কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ! যিনি সারা বিশ্বে "বিশ্বপ্রেম" বিলাইয়া ফিরিতেছেন ও নিজ দেশে বিশ্ব ভারতী গড়িয়া তুলিতেছেন, কেন যে ভাষা ব্যাপারে তাঁহার বিশ্বপ্রেম খণ্ডতা প্রাপ্ত হইল এবং তাঁহার বিশ্ব ভারতী কেন যে বিশ্বের বেলা পূর্ণতা রক্ষা করিয়া বাংলার বেলা প্রাদেশিকতার গণ্ডী রচনা করিয়া বসিল তাহা মদ্বিধ ক্ষুদ্র লোকের বুঝিবার সাধ্য হইল না। যাক্ ধান ভানিতে শিবের বিয়ের গীত গাইয়া বেশী লাভ নাই। শুধু বানানের সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষা ও উচ্চারণ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া এত কথা লিখিলাম।

উচ্চারণ গত বানান সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে একটা সাধারণ ভাষা (Standard Language) প্রচলন করা যদি সম্ভবপর হয়, তবুও তাহাতে আমাদের লেখার ও পড়ার এবং বলার ও লেখার গরমিল উঠিয়া গিয়া বাংলা বানান সহজীকৃত হইবে এরূপ আশা করা যায় না। কারণ তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের লোককে বানান ছাড়িয়া উচ্চারণ সংস্কার ও শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। ইহা আরও কষ্ট সাধ্য। সুতরাং ইংরেজীতে যাহাকে বলে "Out of the frying pan into the fire" আমাদের হইবে ঠিক সেই অবস্থা। আজকাল যেমন "লক্ষ্মী" শব্দটাকে আমরা যেমন উচ্চারণ করি ঠিক তেমন লিখি না বলিয়া ইহার বানান আয়ত্ত করা একটু শক্ত, তেমনই আদর্শ ভাষায় যে শব্দটা গৃহীত হইবে তাহার উচ্চারণ বাংলা দেশের সকল অংশে কখনই একরকম হইবে এই আশা করা যায় না। সুতরাং আদর্শ ভাষায় প্রচলিত বানানের অনুযায়ী উচ্চারণ আয়ত্ত করিতে আবার শিক্ষার্থীকে বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী বেগ পাইতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন "মূলা" শব্দটা। ইহার বানান বোধ হয় সর্ব্বত্রই একরূপ। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ইহার উচ্চারণ "মূলো" আর

পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ কোন স্থানে "মোলা"। আদর্শ ভাষায় যদি ইহাকে "মুলা" রাখা হয় তবে সকল অঞ্চলের লোককেই উচ্চারণ শোধরাইতে হইবে। তারপর ধরুন "বেগুণ" শব্দটা আদর্শ ভাষায় গৃহীত হইল। ইহার উচ্চারণ এখন "বেগুণ" "বাইগুণ" "বাগুন" "বাইকুণ" "বাইয়ুণ" "বাইগণ" প্রভৃতি বিভিন্ন জিলায় বিভিন্ন রূপ প্রচলিত। কেবল উচ্চারণ বৈষম্য নয়, চট্টগ্রাম বিভাগের কোন কোন স্থানে লিখিবার কালেও ঐরূপ বানান লেখা হয়। সুতরাং তত্তৎ অঞ্চলের লোকদের কেবল বানান সংস্কার করিলেই চলিবে না। তদপেক্ষা কঠিনতর কাজ হইবে ইহাদের উচ্চারণ সংস্কার করা। নচেৎ লেখার ও বলার মূল গড়মিল থাকিয়াই যাইবে। "বেগুণ" লিখিয়া "বাইয়ুণ" বলিতে হইবে অর্থাৎ "বার বুড়ি যেই, তিন পণও সেই" হইবে।

ইহা হইতে আরও বুঝা যাইতেছে যে "শিষ্ট উচ্চারণ মত" লিখিতে যে "আদর্শ ভাষার" কথা হইতেছে তাহাও দেশের "একমুঠা লোকের" জন্য। কারণ সেই বানান "দেশের আপামর সাধারণ" এখনও মানে না এবং পরেও মানিবে না— যদি সঙ্গে সঙ্গে আপামর সাধারণের বানানের সঙ্গে উচ্চারণ শোধরান না হয়। কিন্তু ইহা কি সম্ভব?

যাহা হউক "উচ্চারণ মত" বানান সংস্কার করিতে অধ্যাপক মহাশয় বানান কি রকম করিতে চাহেন এবং বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চাহেন, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

প্রথমেই প্রবন্ধ লেখক বর্ত্তমানে ১২টী স্বরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইতেছেন যে বাংলায় "একট" (monophthong) হ্রস্ব স্বরের সংখ্যা ৯টী এবং "জোড়" (Diphthong) হ্রস্ব স্বরের সংখ্যা ১৯টী, মোট ২৮টী হ্রস্ব স্বর ও ইহাদের দীর্ঘ ২৮টী দীর্ঘ-স্বর। একুনে বাংলায় ৫৬টী স্বরবর্ণ আছে। তিনি এই স্বরের সৈনাদলকে কমাইয়া মাত্র অ, আ, ই, উ, এ, ও এই ৬টী একটা হ্রস্বস্বর এবং অ', আ', এ' এই ৩টী জোড় হ্রস্ব স্বর—মোট এই ৯টী স্বরে পরিণত করিতে চাহেন। তুলনচ্ছলে তিনি দেখাইতেছেন যে পালি ও প্রাকৃতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও এই ৮টী মাত্র স্বর ছিল। পালি প্রাকৃতের বানান উচ্চারণ অনুযায়ী ছিল এবং পূর্ব্বোক্ত ৮টী স্বরেই কাজ চলিত। আমাদেরও যখন উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে, তখন পালি প্রাকৃতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বরের সংখ্যা কমাইয়া ৯টীতে আনিলে চলিবে না কেন? দ্বিতীয়তঃ বাংলায় কোন দীর্ঘ স্বর থাকিবে না। (বলা বাহুল্য পূর্ব্বের ৯টী স্বরই হ্রস্ব) এবং দীর্ঘ স্বরের জন্য কোন আলাদা হরফেরও দরকার নাই। কেন না "যখন বাংলা উচ্চারণের নিয়মেই হ্রস্ব দীর্ঘ ধরা পড়ে" তখন আর পোয়্যের সংখ্যা বাড়াইয়া লাভ কি? কিন্তু যুক্তিটা এখানে ঠিক উল্টা হইল না কি? যেই উচ্চারণের সম্যক্ পরিচয় দেওয়ার জন্যই বানান সংস্কারের সমস্যা উপস্থিত করা হইয়াছে, ঠিক সেই জন্যই দীর্ঘ স্বর রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ বানান যদি উচ্চারণ মত করা হয়, তবে দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য দীর্ঘ স্বর জ্ঞাপক চিহ্ন অবশ্য রাখিতে হইবে। নচেৎ যেই গড়মিল সেই গড়মিল থাকিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ লেখকের হিসাব মত ১৯টী জোড় স্বরকে তিনি মাত্র ৩টীতে আনিয়া ফেলিতে চাহেন এবং এ কয়টীর শেষে মাত্রার উপরিভাগে একটী কমা' চিহ্ন বা apostrophe দিয়া অ', আ', এ' লিখিয়া কাজ চালাইতে চাহেন।

মোটের উপর স্বরবর্ণের আলোচনায় লেখক মহাশয় অনেকটা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি জোড় স্বর, একট স্বর, হ্রস্ব স্বর, দীর্ঘ স্বর ইত্যাদি নিয়া অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন। কিন্তু লিখিতে যাইয়া এমন হিজিবিজি করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাঁহার বক্তব্যটা পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ে না, অন্ততঃ আমার কাছে পড়ে নাই। ৯টী একট স্বরের কোন্ ৩টী বর্ত্তমান অক্ষর দ্বারা দেখান যাইতে পারে বুঝা গেল না। বাংলায় ঋ ৯ ৯ ব্যবহার নাই সত্য। কিন্তু ঋ ফলাতে, যেমন, নৃপতি, দৃঢ়, কৃপা প্রভৃতি শব্দে ঋ কারের খাঁটি উচ্চারণ আছে মনে হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে যে ঢ়, ঢ়, র-এর মহাপ্রাণ aspirate rha, rhi উচ্চারিত হয়। কিন্তু ঋ-কার সকল ব্যঞ্জনবর্ণে ঋ-ফলা রূপে

ক্ত হইলে যে ঠিক র-এর মহাপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয় এ সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় আছে। পূর্ব্ব বাংলায় অন্ততঃ হয় না। সুতরাং ঋ কিরূপে বাদ দেওয়া যায় বুঝা গেল না। স্বরবর্ণে না থাকুক, ব্যঞ্জনবর্ণে ঋ-ফলাতে ইহার না থাকার কারণ কি? হ্রস্ব স্বরের হরফের সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাবটী মন্দ নয়, যদি ইহাতে কাজ চলে। অল্পে ও সহজে কাজ করিতে পারিলে সৈন্যদলের মত একদল স্বরের প্রয়োজনীয়তা কি? কিন্তু যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা হইয়াছে "জোড় স্বর" লইয়া। দীর্ঘ স্বরের ঈ ঊ ঋ ঌ উঠিয়া গেলে ১২টী স্বরের মাত্র ৮টী বাকী থাকে। এই ৮টীতে সন্তুষ্ট না হইয়া লেখক মহাশয় ঐ এবং ঔ এর বদলে অ' আ' এ' এই ৩টী নূতন হরফের আমদানি করিয়া স্বরের সংখ্যা মোট ৯টী করিতে চাহেন। এই নূতন আমদানির যৌক্তিকতা বুঝিলাম না। যেই ১৭টী হ্রস্ব ও বিকৃত জোড়স্বর নিয়া তিনি এত মারামারি করিয়াছেন তাহাতে ত জোড়স্বরের সংখ্যা নিঃশেষিত হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলে বাংলায় আরও অনেক জোড় স্বরের বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইবে। যেমন, অই-সই, লই ইত্যাদি; ই-আ—নিয়া, দিয়া ইত্যাদি; ই-ও—আমিও, তুমিও ইত্যাদি; আ-ই-আ—যাইয়া, খাইয়া ইত্যাদি; অ-ই-আ—লইয়া ইত্যাদি; আ-ও-আ-ই-আ—খাওয়াইয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি বহু শব্দে দুই তিন বা বহু স্বরের একত্র সমাবেশ আছে। ইহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা? ইহারা কি পূর্ব্ববৎ থাকিবে, না অন্যরূপ হইবে? Apostrophe দেওয়ার ব্যবস্থা কি শুধু বিকৃত "আ" এবং বিকৃত "ও" র জন্য? না সমস্ত জোড় স্বরের জন্য? এ সব বিষয় যাহা লিখা হইয়াছে, তাহার কিছুই স্পষ্ট নয়। যাহাদের জন্যই Apostrophe দিয়া কাজ চালাইবার ব্যবস্থা হইয়া থাকুক, ইহাতে অর্থের গোল মাল হইবে নাকি? পূর্ব্বের সহিত অন্বয় রাখিলে স্থান বিশেষে অর্থের গোলমাল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্ব্বত্র পাওয়া সম্ভব হইবে কি? জোড় স্বরের উচ্চারণ কিরূপ দেখান হইবে স্পষ্টরূপে লেখা হয় নাই। "জোড় হ্রস্ব স্বরের জন্য বাংলা স্বর বর্ণের ঐ ঔ বাদ দিয়া ১৭টী হরফের দরকার। এই সতরটী হরফ না গড়িয়া বরং আমরা ঐ ঔ কে বাংলা বর্ণমালা হইতে বাদ দিতে পারি" এই কথাগুলির অর্থ কি? ভাবে বুঝা যাইতেছে ঐ ঔ বাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে আরও ১৭টী জোড় হ্রস্ব স্বর বাংলা হইতে উঠিয়া যাইবে। ইহা কিরূপ? কেবল ঔ ঐ-র জন্যই কি বাংলায় ১৭টী জোড় হ্রস্ব স্বরের আমদানি হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে আটকা পড়িয়া গিয়াছে? এসব কিছুই ঠিক বুঝা যায় না। লেখকের অস্পষ্ট লেখা হইতে আমি যাহা কিছু বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহারই আলোচনা করিলাম। এ সম্বন্ধে আরও আলোচনার বিষয় ছিল। যদি বারান্তরে সব বিষয় স্পষ্ট লিখা হয় এবং আলোচিত অংশে আমার কোন ভুল হইয়া থাকে, তবে সে সকল বিষয় পুনরালোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

শেষ দফায় ব্যঞ্জন বর্ণের কথা। ব্যঞ্জন বর্ণ সম্বন্ধেও অধ্যাপক সাহেবের লেখা অসম্পূর্ণ ও কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট। কতগুলি "বে দরকারী" অক্ষর যে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে ইহা সর্ব্বৈব সত্য। ঙ, ঞ, ণ, য, ষ, ক্ষ, ঃ, ব এই কয়টীকে উঠাইয়া দিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না, যে হেতু ইহাতে উচ্চারণের ব্যাঘাত হয় না। আর এই দুর্ভিক্ষের ও দুর্ম্মূল্যতার দিনে পেটে অন্ন জোটানই দায়, শুধু শুধু ব্যঞ্জনের সংখ্যা বাড়াইয়া গঞ্জনার ভাগী হইয়া কি লাভ? বাংলায় শ ও স এর পৃথক উচ্চারণ যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায় আছে। সুতরাং উভয়ের থাকা দরকার। আর যদি উঠাইতেই হয় তবে শ না উঠাইয়া স কেন? শ লিখা স লিখা অপেক্ষা কষ্ট সাধ্য ও বিরক্তিকর। এদিকেও ত একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্তঃস্থ "ব" কেন রাখা হইবে বুঝা গেল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রকারান্তরে এক "ব"এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার "ওয়া" উচ্চারণ খাওয়া, যাওয়া প্রভৃতি শব্দে আছে বলিয়াই আসামীর ন্যায় ইহাকে থাকিতে হইবে কেন? "ওয়া" উচ্চারণ ত স্বরবর্ণের সাহায্যেই বেশ স্পষ্ট দেখান যায়। যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে কি কি পরিবর্ত্তন হইবে এবং কোন্ কোন্টী থাকিবে বা যাইবে ইহা কিছুই লেখা হয়

নাই; পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃতের তুলনমূলক কয়েকটী যুক্তাক্ষরের প্রতিরূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। তবে কি উক্ত তিন ভাষায় যে গুলি common, শুধু সেগুলি বাংলায় থাকিবে, আর সবগুলি একদম উঠিয়া যাইবে? যদি তাহাই হয়, তবে পালি বা প্রাকৃত কোন্‌টীর অনুকরণে বাংলা যুক্তাক্ষর পুনর্গঠিত হইবে? বাংলায় য-ফলা ও ব-ফলার কোন সার্থকতা নাই ঠিক "তবে 'য' ফলায় আগের 'অ' 'ও' রূপে" উচ্চারিত হয়, ইহা কি ঠিক? সভ্য, গব্য প্রভৃতি শব্দ কেহই সোভ্য, গোব্য উচ্চারণ করেনা—অন্ততঃ পূর্ব্ববাংলায় করে না। বরং ইহাদের উচ্চারণে 'অ' কারের পরে একটা অস্পষ্ট 'ই' র আগম হয়, যেমন সইভ্ভ। এইরূপ উচ্চারণ কিরূপে সহজে দেখান যাইতে পারে? য-ফলা উঠাইয়া দিয়া ব-ফলা যুক্ত শব্দ লেখা বর্ত্তমান নিয়মে আরও কঠিন এবং ইহাতে স্থান ও কাল উভয়ই বেশী খরচ হয়। ণ-ফলা, ল-ফলা, জ্ঞ প্রভৃতি যুক্তাক্ষরের বেলাও ঐ যুক্তি প্রযোজ্য। স্থান ও কালের অপব্যয় বাঁচান এবং সঙ্গে সঙ্গে সহজ ও সরল পন্থা আবিষ্কারই বিজ্ঞানের উপকারিতা। কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলি যদি সফল না হয় তবে কেবল পরিবর্ত্তনের জন্য পরিবর্ত্তন কেহ গ্রহণ করিতে রাজি হইবেন কিনা জানি না। আরও একটা কথা এই যে উচ্চারণ মত যুক্তাক্ষরগুলি লেখা হইলে শব্দের মূল চিরদিনের তরে চাপা পড়িয়া যাইবে। যেমন সহ্য শব্দটী যে সহ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন ইহা বর্ত্তমান বানানে বেশ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা উচ্চারণ মত সইজ্জ, সোজ্জ বা এরূপ যাহাই লিখা হউক তাহাতে মূল ধাতুটী জানা যাইবে না। হ্ন-ফলাকে "হ্‌হ" দ্বারা কিরূপ লেখা হইবে তাহার একটা আদর্শ বানান আশা করি অধ্যাপক মহাশয় দিয়া দিবেন।

এই ব্যঞ্জন বর্ণ সম্পর্কে চন্দ্রবিন্দুর স্থান কোথায় হইবে এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়া আমি উপসংহার করিতে চাই। তাঁহার, ইঁহার প্রভৃতি শব্দে প্রবাসীর লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় তাহাঁর, ইহাঁর লিখিয়া চন্দ্রবিন্দু হ-এর উপরে বসান। উচ্চারণের সময় আমরা চন্দ্রবিন্দুটাকে ত-কার বা ই-কারের পরে উচ্চারণ করি এবং বর্ণ বিন্যাসের সময় ত-রে চন্দ্রবিন্দু, তাতে আকার ইত্যাদি বলিয়া ত-র পরে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করি। সুতরাং যাঁহারা পরের বর্ণে চন্দ্রবিন্দু বসান তাঁহাদের কার্য্য এইদিক হইতে সমর্থন যোগ্য। কিন্তু এঁ্যা, হ্যাঁ ইত্যাদি এক বর্ণ যুক্ত শব্দের বেলায় তাঁহারা কোথায় চন্দ্রবিন্দু বসাইবেন? আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে "তাহার" শব্দে যদি চন্দ্রবিন্দু হ-র উপর বসাই, তবে ইহা ত-র পরে যে আ-কার আছে, তাহার ও পরে বসে। কিন্তু উচ্চারণের সময় আমরা কি চন্দ্রবিন্দুকে আ-কারের পরে উচ্চারণ করি? আশাকরি বিজ্ঞ অধ্যাপক সাহেব বাংলা বানান সমস্যার সঙ্গে এই বিষয়টাও একটু মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখিবেন। ইতি

শ্রীখিতিভূষণ ঘোষ।

শয়ানে (সান্ত্বনা)।
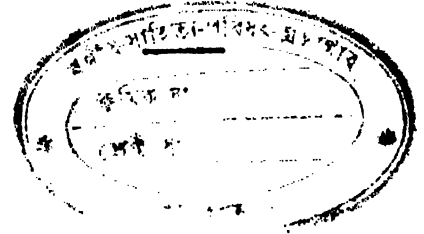
ভাবিস্ না রে শয্যাশায়ি!
সুস্থিরভাব শুয়ে' থাক্
পুঞ্জীভূত ময়লা রাশি
চোখের জলে ধুয়ে যাক্!
তোমার প্রাণে যে সব ব্যথা
ফুটছে, শোনে জগন্মাতা
মুক্তি পাবি দুখ্ ওরে
খানিক হেন শুয়ে থাক!

শুন্‌বি পুনঃ অভয় বাণী
কোমল ঘন সুমধুর
মেল্‌বি আঁখি নবীন প্রাতে
মুক্ত হবি বেকসুর !
কমল ফিরে মুদ্‌বে না সে
ভুল ভাবনা ঘুম্ পিয়াসে,
বসন্ত সে চিরন্তনী।
ডুব্‌বে সদা রে আতুর !

—•—

দেখ্‌বি ওরে অবাক প্রাণে
আকাশ ভরা শান্ত নীল
স্তব্ধ অনিল আপন ভোলা
বিরাট্ খোলা অনাবিল !
স্বচ্ছ শুধু চেতন জাগে
তায় না সুখ বেদন লাগে,
নিত্য-রূপ নিরঞ্জন
মগ্ন তাহে এ নিখিল !

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—•—

বিবিধ।

পর্য্যটন।

এক সময়ে লোকে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লইয়া পর্য্যটনে বিন্দুমাত্র ভীত হইত না ! মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অবলীলা ক্রমে পর্য্যটন করিয়াছেন। সেরূপ অনেক মহাপুরুষই তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে সমস্ত ভারত পদব্রজে পর্য্যটন করিয়াছেন । বর্ত্তমানে ২।১ মাইল পথ চলিতেই আমাদের যান বাহনের প্রয়োজন হয় । ইহা দ্বারাই মনে হয় আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছি। অথবা বিজ্ঞানের সহায়তায় পরিশ্রম লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই বিজ্ঞান উদ্ভাবিত যানের মধ্যে রেল, জাহাজ, মোটর ইত্যাদিতেও আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না। ইহা অপেক্ষাও দ্রুতগামী যান হইলে আমাদের ভাল হয়। এইরূপ দ্রুতগমন ভবিষ্যতে প্রকৃতির সাহায্যেই সম্ভব হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেছেন। বায়ু মণ্ডলের নিম্ন স্তরে যেরূপ বাণিজ্য বাতাস প্রবাহিত হয় সেইরূপ ঊর্দ্ধ স্তরেও প্রবল প্রবহমান বায়ু স্রোত বর্ত্তমান আছে। এই বায়ু স্রোতে এরোপ্লেন ছাড়িয়া দিতে পারিলে হয়ত ঘণ্টায় ৩০০ মাইলের উপরে চলা সম্ভব হইবে। বিমানচারিগণ আজ পর্য্যন্ত যত ঊর্দ্ধে এরোপ্লেনে উঠিয়াছেন তাহা হইতেও ঊর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন। অল্প দিন হয় একজন বিমানচারী অত্যধিক ঊর্দ্ধে উঠিয়া এরূপ এক বায়ু স্রোতে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করেন উহার গতি মিনিটে ৩০০ মাইল। যদিও তাঁহার নির্দ্ধারণে ভুল হওয়া সম্ভব তথাপি উহার বেগ যে অত্যন্ত অধিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিছুদিন হয় এক নাবিকহীন বেলুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সহ ৬ মাইল ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছে ঊর্দ্ধ স্তরে যে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হয় তাহার বেগ ভূমির নিকটে প্রবলতম হারিকেণেরও দ্বিগুণ। ঊর্দ্ধস্তরে যে প্রবল বায়ুবর্ত্ত বর্ত্তমান আছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং বিভিন্ন স্থান হইতে তাহার পরীক্ষা চলিতেছে।

ভূপৃষ্ঠ হইতে কখন ২ বেলুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সহ ২০ মাইল ঊর্দ্ধেও উঠান হইয়াছে।

বর্ত্তমানে যে সময়ে ১০০ মাইল যাওয়া যায় ঊর্দ্ধ স্তরের প্রবল বাতাসের সাহায্যে সে সময়ে ১০০০ মাইল যাওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

কোন ২ বিশেষজ্ঞ বিবেচনা করেন আমাদের উচ্চতম পর্ব্বতের বহু ঊর্দ্ধে উত্তর আমেরিকা হইতে ইয়োরোপের দিকে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যে প্রবল বায়ু প্রবাহ বর্ত্তমান আছে তাহার বেগ অতি দ্রুতগামী রেলের গতির বহু গুণ। সেরূপ ইউরোপ হইতে আমেরিকা যাওয়ারও বায়ুবর্ত্ত ঊর্দ্ধে বর্ত্তমান আছে।

—

প্রাকৃতিক মালগাড়ী।

আমরা ভূপৃষ্ঠে রেল জাহাজ প্রভৃতিতে আমাদের মালামাল স্থানান্তরিত করিয়া থাকি ; কিন্তু প্রকৃতি সেই কার্য্য বায়ু জল প্রবাহ ইত্যাদি দ্বারা করিয়া থাকে। ইহা হইতে আশ্চর্য্য জনক এক ঘটনা সমুদ্র গর্ভে হইয়া থাকে। কোন ২ স্থলে জলদেশে বরফের স্তর প্রস্তুত হয়। সে সময়ে প্রস্তর খণ্ড, ভগ্ন জাহাজের অংশ প্রভৃতি নানারূপ বস্তু ঐ জমাট বরফের চাপে পড়িয়া যায়। সময়ে ঐ বরফ সমুদ্রের উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন উহা বাতাস কিম্বা জল স্রোতের দ্বারা বহুদূরে চালিত হয় এবং উপরের উত্তাপে বরফ গলিয়া যাওয়াতে বরফের সঙ্গে প্রবাহিত প্রস্তরাদিও সেই দূর দেশে সমুদ্রতলে পুনরায় পতিত হইয়া থাকে। নির্মজ্জিত জাহাজের অংশ বিশেষ যে এরূপে বহু মাইল দূরে নীত হইয়াছে তাহা ডুবরিগণ প্রমাণ করিয়াছে। কোপেন হেগেণের নিকটে ৪০০ টন ওজনের একখানা গ্রেনাইট পাথর এইরূপে বহু মাইল দূরে নীত হইয়াছিল। সেখানে সমুদ্রধারে প্রবল ঝড়ে বহু বরফ খণ্ড তীরের উপরে আনিয়া ফেলে। যখন উহা গলিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে সমুদ্রের তলের বহু প্রস্তর, নিমগ্ন জাহাজের ভগ্নাংশ, ছিন্ন লৌহ শৃঙ্খল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বিলাসিতার উপকরণ।

বর্ত্তমানে আমাদের বিলাসিতা কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার একটু আভাস দেওয়ার জন্য বিলাতের এক হোটেলের দুই একটী আসবাবের তালিকা দিব। একটী নূতন হোটেলের মেজের উপরে পাতিবার জন্য ৩৭ মাইল কার্পেটের প্রয়োজন, উহার বিছানার জাজিমে ভরিবার জন্য প্রায় ৩১৫ মণ অশ্ব লোমের প্রয়োজন। উপাধানের জন্য প্রায় ৯০ মণ পাখীর পালকের দরকার হয়। এই পালক সংগ্রহ করিতে ৯০,০০০ হংসের প্রয়োজন, এই হংস যদি ৪টী করিয়া লাইন করিয়া দাঁড় করান যায় তাহাহইলে ঐ লাইনটী লম্বায় প্রায় ২ মাইল হইয়া থাকে। এই বিস্তৃত সৈন্য বাহিনীর একটী চিহ্ন ও স্থান পার হইতে, মরাল গমনে, ৩ ঘণ্টা ৪১ মিনিট সময় লাগে।

খোক।

আমাদের দেশে বর্ষাতবাড়ী, পতিতবাড়ী কিম্বা বৃক্ষ কোটরে একরূপ টিকটিকি জাতীয় জীব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শব্দ অনুসারেই বোধহয় ইহাদের নাম খোক হইয়াছে। আমাদের জীবতত্ত্ব অনেকটা অপরিজ্ঞাত বলিয়াই অনেকে ইহাদিগকে তক্ষক বলিয়া থাকেন। ইংরাজিতে ইহাদিগকে (Gecko) খোকা বলিয়া থাকে। আজ পর্য্যন্ত ২৮০ প্রকার খোক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়ার মত উষ্ণ প্রধান দেশেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ইহাদিগকে অত্যন্ত বিষধর বলিয়াই লোকের বিশ্বাস। সে জন্যই লোকে ইহাদিগকে তক্ষক বলিয়া থাকে। ইহাদের মস্তক অনেকটা ত্রিকোনাকার এবং চেপটা ; বর্ণ ধূসর। পায়ে পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি এবং উহাদের অগ্রভাগ চেপটা। ইহারা অধিকাংশই রাত্রিচর, ইহাদের শব্দ বোধহয় তালুর সহিত জিহ্বার সংযোগে উদ্ভূত হইয়া থাকে। গৃহে দীপ জ্বালার পরে টিকটিকি যেরূপ আহার অন্বেষণে বাহির হয় ইহারাও অনেকটা সেইরূপ। একজন জীবতত্ত্ববিদ্ সাহেব লিখিয়াছেন যে এক সময়ে তিনি সপরিবারে যে বাড়ীতে থাকিতেন তথায় একখানা ছবির পিছনে একটী খোক থাকিত। বাতি জ্বালার পরই সে রুটীর ছিলকা ইত্যাদি ভুক্তাবশিষ্ট যাহা পাইত তাহাই খাইতে আসিত। কখন খাদ্যের অভাব হইলে সে ডাকিতে আরম্ভ করিত। ইহাতে মনে হয় ইহাদিগকে অনেকটা গৃহপালিত জীবের মত পোষ মানান যায়।

ঢাকাতে রমণায় আমার কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে এরূপ একটী খোক দেখিয়াছি। সে যখন ডাকিত তখন আমার এক ক্ষুদ্র ভাগিনেয়ী মনে করিত তাহাকে খুকী বলিয়া কেহ সম্বোধন করিতেছে। সেও খোকটী ডাকামাত্র উত্তর করিত —"কি আসি"। আমার ভয় হইত কখন বা ঐ ক্ষুদ্র শিশু ঐ অজ্ঞাত ডাকের সন্ধানে দালান হইতে পড়িয়া যায়।

ইহা যে বিষাক্ত তক্ষক নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২৯।৭।৩০ তারিখ রাত্র ৭টায় মৃত্যু।)

উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এক কক্ষচ্যুত হোলো অকস্মাৎ!
চির-অন্ধকারে বুঝি আঁধারিল সাহিত্য-গগন!
খাঁটি হিন্দু-বিশিষ্টতা মনঃ প্রাণে করিতে রক্ষণ,
একা সে ফুৎকারি' শিঙা গেছে বলি'—এল সুপ্রভাত!
একান্ত স্বজাতি-প্রেমী দেশ-সেবা করি' দিনরাত,
গেল চলি, দীন দেশে ভারতীর সুস্নেহভাজন!
ভাষা তার দাসী ছিল, ইন্দ্রজাল করিত সৃজন!
সাময়িক সাহিত্যের মহাগুরু হইল নিপাত।

পথভ্রষ্ট 'বাবু'-পৃষ্ঠে কশাঘাত দানিয়া অধিক,
গেল রে ভাবুক বক্তা স্পষ্টবাদী নানা ভাষাবিৎ!
ইন্দ্র-চন্দ্র-অক্ষয়ের ভাব-পুষ্ট সাহিত্য-রসিক,
ব্রহ্ম বান্ধবের সাথী সহকর্ম্মী একান্ত সুহৃৎ,
নব্য হিন্দুসমাজের অগ্রদূত গেয়ে গেল গীত!
হে বাঙালী, কাঁদো কেন? অন্নাভাব ঘুচিয়াছে ঠিক!

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালা বানান সমস্যা।

(প্রতিবাদের উত্তর)

আমি মনে করিয়াছিলাম আমার সমস্যাটী মাঠেই মারা যাইবে। প্রতিবাদী মহাশয় যে প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার অশেষ ধন্যবাদার্হ। অধিকন্তু তিনি যে আমার সহিত বাংলা বানান সংস্কারে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও মতের ঐক্য স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রতিবাদী মহাশয় কিন্তু উচ্চারণ মত বানানের প্রধান অন্তরায় দেখিতেছেন বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন উচ্চারণ। সকলেই যদি নিজের নিজের উচ্চারণ মত বানান লিখেন, তবে বাঙ্গালা ভাষার দশম দশা উপস্থিত হয়। অথচ তিনিই বলিতেছেন আমাদের বাড়ী সুদূর শ্রীহট্টেই হউক আর সুন্দরবনের ধারেই হউক, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেই হউক আর দার্জ্জিলিংই হউক কথাবার্ত্তায় ও বক্তৃতায় ত আমরা সকলেই হুবহু "কেলকে-শিয়ান!" ইহাতে কিছুই নিন্দার বিষয় নাই। আমরা এই উচ্চারণকেই শিষ্ট উচ্চারণ করি। প্রতিবাদী মহাশয় কয়েক জায়গায় ইংরাজির নজীর আনিয়াছেন, আমিও এখানে পারি। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রাদেশিক উচ্চারণ প্রচলিত থাকিলেও যেমন একটী standard pronunciation আছে, যাহা অভিধানে দেখান হয়, স্কুল কলেজে শিখান হয়, সভ্য সমাজে ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালা ভাষারও সেই রকম একটা শিষ্ট উচ্চারণ আছে বলিয়াই আমি মনে করি। Local patriotismএর জন্য যদি কেহ নিজের বুলি বা টান না ছাড়েন, তবে আমি লাচার। শিষ্ট উচ্চারণ মতই বাঙ্গালার বানান হইবে। প্রতিবাদী মহাশয় কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবান্তর বিষয়। উচ্চারণ আমার আলোচ্য ভাষা নহে।

দুঃখের বিষয় প্রতিবাদী মহাশয় আমার জোড় স্বর সম্বন্ধে মন্তব্য বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। হয়ত আমি যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা খোলাসা করিয়া বলা হয় নাই। জোড় স্বর (diphthong), দুই স্বরের একত্র অবস্থিতি মাত্র নয়, দুই স্বর যদি একত্র অবস্থিত হইয়া একটী স্বরের ন্যায় ধ্বনিত হয়, তবেই জোড় স্বর। অতএব নিয়া, দিয়া ইত্যাদি স্থানে একত্র দুই স্বর আছে বটে, কিন্তু তাহার জোড় স্বর (diphthong) নহে। তবে অ-ই যেমন সই, দই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে এখানে অ—ও পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ সর্ব্ব স্থানেই। কাজেই অ—ই জোড় না মানিয়া আমি ওই জোড় স্বর স্বীকার করিয়াছি। আমি বলিয়াছি জোড় স্বরের জন্য ঐ ঔ উঠাইয়া দিতে। কারণ ১৯টীর মধ্যে ১৭টীর জন্য যখন আলাদা চিহ্ন নাই, তবে কেবল দুইটীর জন্য দুটী পৃথক হরফ রাখা কি দরকার? অর্থাৎ যদি দাই, ঝাউ ইত্যাদি লিখিতে আপত্তি না থাকে তবে

দৈব স্থানে দইব, গৌড় স্থানে গউড় লিখিতে আপত্তি কি ? প্রাকৃতে ত ঐ ঔ নাই। সেখানেও ঐরূপ বানান দেখা যায়। প্রতিবাদী মহাশয় অ' আ' এ' এই তিনটীকে জোড় স্বর মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। আমি ইহাদিগকে একট স্বরের মধ্যেই ধরিয়াছি। শব্দ শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে এগুলি umlauted স্বর। ঋ উঠাইয়া দিলে প্রতিবাদী মহাশয় বলেন নৃপতি, দৃঢ়, কৃপা প্রভৃতি শব্দ কিরূপে লেখা যাইবে ? কেন, ন্রিপতি, দ্রিঢ়, ক্রিপা ইত্যাদি রূপে। প্রতিবাদী মহাশয় কি ইহাতে উচ্চারণের কোন পার্থক্য দেখাইতে পারিবেন ? আমি বলিয়াছি ৯টী একটি হ্রস্ব স্বরের মধ্যে মোটে ৩টী বর্ত্তমান অক্ষর দ্বারা দেখান যাইতে পারে। এই তিনটী অ, ই, উ। বাকীগুলি কেন দেখান যায় না তাহা মূল প্রবন্ধে বলিয়াছি।

প্রতিবাদী মহাশয় বলেন ও য়া দ্বারা অন্তঃস্থ ব এর কাজ চলিবে। সত্যই কি তাহাই ? বাউ (bau) ও বায়ুতে যেরূপ উচ্চারণ গত তফাৎ, ব্‌ ও ওয়া-তেই অনেকটা সেই রূপ। বস্তুতঃ ও য়ার উচ্চারণ oyā, wā নয়।

চন্দ্রবিন্দুর স্থান কোথায় হইবে বলিয়া প্রতিবাদী মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন। এই প্রশ্নের সঙ্গতিই দেখিতেছি না। চন্দ্রবিন্দু একটী চিহ্ন মাত্র। কোন স্বর অণুনাসিক হইলে তাহার উপর এই চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে। কাজে কাজেই যে স্বর অণুনাসিক হইবে, তাহার উপরেই চন্দ্রবিন্দু বসিবে। পূর্ব্ববঙ্গে স্বরের অণুনাসিক উচ্চারণ নাই। কাজেই পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীর পক্ষে চন্দ্রবিন্দুতে কিছু গোলমাল ঠেকে বটে। কিন্তু এখানে শিষ্ট উচ্চারণ অনুসরণ করা ছাড়া আর উপায় কি ?

যুক্তাক্ষরগুলি সম্বন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে উচ্চারণ মত বানান করিতে যে যুক্তাক্ষর গুলি উচ্চারণ মত নয়, তাহাদেরই সংশোধন করা দরকার হইবে ; অন্যগুলি যেমন তেমনি থাকিবে। যেমন 'মত্ত' বানান উচ্চারণ অনুযায়ী ; কিন্তু 'পদ্ম' বানান নয়। 'পদ্ম' উচ্চারণ মত বানানে হইবে 'পদ্দঁ'।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। **শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন মালা**—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত।—হরিসভা ও দেবমন্দিরাদিতে ব্যবহার জন্য প্রাচীন ও আধুনিক কীর্ত্তন গান সংগ্রহ। সঙ্কলয়িতার উদ্দেশ্য এবং চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। অনেক স্থলে এইপ্রকার পুস্তকের অভাবে কীর্ত্তনেচ্ছু ব্যক্তিগণের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। ইহার অনেকগুলি গান এতদ্দেশের লোকের আবাল্য পরিচিত, সুতরাং তাহাদের সুরও সহজে ধরা যায়। আজকাল হাল্‌কা টপ্পা, নাটক, প্রহসনাদির গানের স্রোতে দেশ প্লাবিত, তদবস্থায় এইরূপ নামগানের বহুল প্রচার দ্বারা লোকের সুরুচি সদ্ভাব বর্দ্ধিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

২। **গঙ্গা, রুদ্রাক্ষ ও তুলসী মাহাত্ম্য**—কাশীধামের ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার প্রচারিত তিন খানি শাস্ত্রপ্রমাণ পুস্তিকা। এই গ্রন্থত্রয় শাস্ত্রবিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর পক্ষে উপাদেয় হইলেও অধুনাতন শিক্ষাবিকৃত, সংশয়াত্মা হিন্দু সন্তানের তেমন হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভাবিত নহে। কারণ ইঁহারা কেবলই চাহেন ন্যায় ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি প্রমাণ। ধর্ম্মরাজ্যে তদ্রূপ যুক্তিপ্রমাণ অপেক্ষা শুদ্ধ ভাব-বিশ্বাস ও আপ্তবাক্যের অধিকার যে বলবত্তর একথা ইঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। পুরাণাদি শাস্ত্রের উপাখ্যান, অর্থবাদ ও পল্লবিতাংশের অভ্যন্তরস্থ সারবান্, সুমধুর ফলাংশ লক্ষ্য করিতে অনভ্যস্ত হওয়ায় ইঁহারা গঙ্গোদক, তুলসী এবং রুদ্রাক্ষে সাধারণ জল, পত্র ও গুটিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। হিন্দুকে স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ রাখিবার জন্য এই বিপরীত দৃষ্টির প্রতিকারার্থে এবম্বিধ শাস্ত্রকথা প্রচারের সার্থকতা অবশ্য স্বীকার্য্য।

৩। **বস্ত্রহরণ**—শ্রীরাজকুমার বসু বি, এল্ প্রণীত। এই উপন্যাস-নাটকখানি 'আধুনিক সাধারণের রুচিবিগর্হিত বলিয়া পরিগণিত' হইবার আশঙ্কায় গ্রন্থকার প্রথমেই পাঠক-পাঠিকাকে সাবধান করিয়াছেন। তাঁহার এই আশা পূর্ণ করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য অবধানপর হইয়াও কৃতার্থ হই নাই। প্রাচীন নাট্য ও কাব্যসাহিত্যের (শ্রীমদ্ভাগবতের ?) প্রাকৃত বর্ণনরীতির সহিত আধুনিক গ্রাম্য বিসদৃশ ভাব-দৃশ্যের মিশ্রণে দর্শন শাস্ত্রোদ্ভূত প্রকৃতি পুরুষের লীলা বর্ণন প্রচেষ্টিত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পরাসক্তি ও মিলনজনিত দুঃখের উৎপত্তি ও বিচ্ছেদে মুক্তি, এই তত্ত্বটি যে জীবাত্মার ইতিহাস, ইহা দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বোধগম্য হইল না। সাধারণ পাঠকের নিকট উহা অলক্ষিত হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাতে উহাদের বসনোপাধির অপগম অতিশয় দুর্লক্ষ্য এবং সুদর্শন যুবক-যুবতীর বিবস্ত্রী-করণ ব্যাপার এতটা প্রকট বা উৎকট না হইলে পাঠক ও পাঠিকাগণের ততটা রোচক হইত কিনা সন্দেহ। একেইত আদিরসাশ্রিত গল্পসাহিত্যের বন্যায় দেশ রসাতলে যাওয়ার উপক্রম, তাতে আবার এই দুর্ম্মূল্যের দিনে এত বসন চুরির প্রাদুর্ভাব হইলে কি আর রক্ষা আছে? পুস্তকখানি স্বল্পা-কার হইলেও সোণার জলে নামাঙ্কিত, উত্তম বান্ধাই। মূল্য ১॥০ টাকা।

৪। **ফল্গু**—একখানি কবিতাপুস্তক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী এম, এ, বি, এল (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) বিরচিত আজকাল কবিতা শুনিলেই বিশেষতঃ স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে লালিত পালিতের অবসর বিনোদনের চেষ্টাপ্রসূত শব্দ ঝঙ্কার ও অর্থশূন্য ভাবশূন্য ছন্দোবদ্ধ বাক্যসম্ভারের কথাই মনে পড়ে এবং তাহাতে প্রাণে রস সঞ্চারের পরিবর্ত্তে বরং ভীতিরই সঞ্চার করে কিন্তু যোগেশ বাবুর কবিতাগুলি সে জাতীয় নহে। যোগেশ বাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত নন। মাঝে মাঝে তাঁর লেখা কবিতা এবং প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রতিভা পত্রিকায় "বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ" নামক তাঁহার যে একটী লেখা বাহির হইয়াছিল তাহার ভিতরে তাঁহার কবিত্বরসগ্রাহী হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার "প্রকাশকের" কথাতেই বলি তাঁহার যে কবিতাগুলি একদিন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বিভিন্ন সাময়িক মাসিক পত্রিকার বিস্তীর্ণ সৈকতে আত্মগোপন করিয়াছিল সেইগুলি তিনি এতদিনে ফল্গু নাম দিয়া পুস্তকাগারে প্রকাশিত করিলেন। এই কবিতাগুলিকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—গৃহলক্ষ্মী, দেশমাতৃকা এবং বিশ্বদেবতা। গৃহলক্ষ্মীর ভিতরে কয়েকটা সহজ সরল প্রেমের কবিতা আছে। কবিতাগুলি বেশ সরস এবং মিষ্ট। যোগেশ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য সন্তান এবং ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। চাকরীর নিষ্পেষণেও তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি শুকাইয়া যায় নাই। স্বদেশের মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ সজীব তাহার পরিচয় তাঁহার দেশমাতৃকার কবিতা কয়েকটী। লর্ড কার্জনের দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞের দুর্ভিক্ষ-মহামারী-পীড়িত দারিদ্র্য-অনশন-ক্লিষ্ট ভারতে এই মহাড়ম্বর ও আয়োজন—এই বিকট বিদ্রূপ তাঁহার প্রাণে যে আঘাত করিয়াছিল তাহারই মর্ম্মভেদী হাহাকার" তাঁহার কুরুক্ষেত্র কবিতার শেষ কয়টী চরণে অতি সংক্ষিপ্ত এবং প্রাণস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়া উচ্ছসিত আবেগে গাহিয়াছেন—

রাজ রক্ত, বীর রক্ত
নিঃশেষিয়া করিয়াছে পান—
শেষ রক্তবিন্দু বিনা—
বুঝি শান্ত হবে না পরাণ;
দিল্লীর মরুতে তাই
শতাব্দীর মহা আয়োজন—
ত্রিশ কোটী দরিদ্রের
সব [illegible] শোণিত-তর্পণ!

'বিশ্বদেবতা' কবিতাগুলির ভিতর তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি অতি সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার অনেকগুলি কবিতাই উচ্চ অঙ্গের। তাহার মধ্যে 'বিধাতৃ বিধান' এবং 'চন্দ্রিমুক্তরী বাহিয়া' কবিতা দুইটী আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। দুই এক জায়গায় সামান্য ছন্দ পতন থাকিলেও তাহাতে কবিতাগুলি বিশেষ শ্রুতিকটু হয় নাই। ভরসা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা সংশোধিত হইবে। মোটের উপর বইখানি কি ভাবে কি ভাবপ্রকাশে বড়ই সুন্দর হইয়াছে। বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের নিকট যে কিরূপ অশেষ ঋণী তাহা আমরা সকলেই জানি। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যোগেশ বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করুন।

আকবর বাদসাহের সন্তান-সন্ততি।

সম্রাট্ আকবর্ উদার-হৃদয় ও জনপ্রিয় ছিলেন। বিজিত হিন্দু ও জেতা মুসলমান্ উভয়কেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন ও সমান আদর, সমান যত্ন করিতেন। তাই সকলেই তাঁহাকে ভক্তিকরিত ও ভালবাসিত। আমরা যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার সম্বন্ধীয় খুঁটীনাটী সব কথা জানিবার জন্য আমাদের স্বতঃই একটা কৌতূহল হয়, লোককে জানাইবার জন্য মনে একটা আগ্রহ জন্মে। আমরা সেই আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া এ স্থলে জনপ্রিয় সম্রাট আকবর সাহের সন্তান-সন্ততির বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

১। ফাতেমাবানু বেগম নামক কন্যা আকবরের প্রথম সন্তান। আকবরের ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৫৬২ খৃঃ পুনগ্রাই (Pungrai) বেগমের গর্ভে বানু বেগমের জন্ম হয়। ইনি এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

২।৩। হোসেন, হাসেন নামক যমজ পুত্রদ্বয় আকবর পত্নী বিবি আরামবক্সের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হোসেন অষ্টাদশ দিবস ও হাসেন নবম দিবস বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

৪। জাহাঙ্গীর আকবরের তৃতীয় পুত্র। যোধপুর রাজকন্যা যোধবাইয়ের গর্ভে ১৫৬৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। সাধুপ্রবর সেলিমের অনুগ্রহে ইহঁাকে পাইয়াছিলেন বলিয়া আকবর ইহঁাকে সেলিম নামে অভিহিত করিতেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সেলিম দিল্লীর রাজতক্তে আধরোহণ করেন।

বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা শের আফগানকে নিহত করিয়া তাঁহার পত্নী জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী নূরজাহানকে জাহাঙ্গীর স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন। ইহঁার সময়ে হিন্দুকুলে গৌরব, পুরুষসিংহ প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ ও বঙ্গের শেষবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর অতি কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি যে আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, সহৃদয়তার ও সরলতার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ৬১ বৎসর বয়সে জাহাঙ্গীর মানবলীলা সংবরণ করেন।

৫। সাহাজাদী খানুমের মাতার নাম সেলিম বেগম। খানুম আকবরের দ্বিতীয় কন্যা। ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষিণী ও অনুরাগিনী ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি ভগবচ্চিন্তাতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

৬। সুলতান মুরাদ ফতেপুরের পাহাড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আকবর আদর করিয়া ইহঁাকে "পাহাড়ী" বলিয়া ডাকিতেন। মুরাদ আকবরের চতুর্থ পুত্র ও ষষ্ঠ সন্তান। ইনি স্বভাবে বিনয়ী ও তেজস্বী, মন্ত্রণায় স্থির বুদ্ধি ও যুদ্ধে অতীব সাহসী ছিলেন। ইহঁার স্বভাব ও কার্য্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া আকবর ইহঁাকে পূর্ত্ত বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে খালপুর নামক স্থানে মুরাদ জীবনলীলা সংবরণ করেন।

৭। মিঠি বেগম অষ্টম মাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি সম্রাট মহিষী মেহের সেন্নার কন্যা। হিন্দুস্থানী ভাষায় মিঠি অর্থে মিষ্ট বুঝায়।

৮। সাহাজাদা দানিয়েল ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর দানিয়েল পিতার আদেশে মুরাদের আবদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। তাঁহার কৃতকার্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ আকবর তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দানিয়েল বড়ই হস্তী প্রিয় ছিলেন। কাহারও একটি উন্নতকায় সুদৃশ্য হস্তী থাকিলে যেমন করিয়াই হউক তিনি তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। হিন্দুস্থানী গীতি বাদ্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। হিন্দুস্থানী কবিতা আবৃত্তি করিতেও তিনি আমোদ বোধ করিতেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে মহা সমারোহে বিজাপুর রাজকন্যার সহিত দানিয়েলের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইনি বড়ই সুরাভক্ত ছিলেন। অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া বিবাহের বৎসরে বুরহানপুর নগরে ইনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

৯। লালা বেগম আকবরের অন্যতমা কন্যা। ইঁহার মাতার নাম লাল বিবি। অষ্টাদশ মাস বয়ঃক্রমে ইহার মৃত্যু হয়।

১০। আরাম বানু বেগম আকবরের কনিষ্ঠা কন্যা ও সর্ব্বশেষ কন্যা। ইঁহার নাম বিবি দৌলৎসা; সন্তান সন্ততি-গণের মধ্যে ইনিই আকবরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন, মৃত্যু হইলে প্রিয়তমা কন্যা আরাম বানুর কি হইবে ইহা ভাবিয়া সম্রাটপুত্র জাহাঙ্গীরকে ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়া যান। সম্রাট জাহাঙ্গীরও সর্ব্বদা ইঁহাকে বিশেষ যত্নে ও আদরে পালন করিয়াছিলেন। আরামবানু কতদিন জীবিত ছিলেন, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহা জানিতে পারি নাই।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

মহাভারত সমালোচনা। (৩)

এইক্ষণে আমরা কুরু পাণ্ডবের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। এই সত্যবতীর গর্ভে শান্তনু মহারাজার ঔরষে বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। চিত্রাঙ্গদ অপুত্রক অবস্থায় অল্প বয়সে যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ দুহিতা অম্বা ও অম্বিকার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ উপলক্ষে ভীষ্মের অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ হয়। অলোকসামান্যরূপসম্পন্না কাশীরাজ দুহিতা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বয়ম্বরা হইবেন সম্বাদ পাইয়া মহাবীর ভীষ্ম একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া কাশীরাজার রাজধানীতে (বেনারস) সমুপস্থিত হইয়া সেই তিন কন্যাকে বলপূর্ব্বক রথে আরোপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই সময় স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত অন্যান্য রাজগণ যুদ্ধার্থে ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। ভীষ্ম অবলীলাক্রমে সেই রাজগণকে পরাজয় করিয়া হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন। অম্বা ভীষ্মকে কহিলেন "মহাত্মন্, আমি শাল্বপতিকে বরণ করিয়াছি"। আমাকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। ভীষ্ম তাঁহার মাতা ও পুরোহিত এবং মন্ত্রীগণের অনুমতক্রমে অম্বাকে গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। তৎপর অম্বা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিচিত্রবীর্য্য ৭ বৎসর পত্নী দ্বয়ের সহিত বিহার করিয়া যক্ষা রোগগ্রস্থ হইয়া নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। সত্যবতী বংশ রক্ষার্থ প্রথম ভীষ্মকে অনুরোধ করেন। তিনি অস্বীকার করেন। তৎপর বেদব্যাসকে আহ্বান করেন। বেদব্যাস মাতৃসম্পর্কে বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা। মাতৃ আজ্ঞায় ভ্রাতার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য মহিষী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ জন্য সত্যবতীর অনুরোধে বেদব্যাস বিচিত্রবীর্য্য মহিষী অম্বিকার গর্ভে আর একটী পুত্র উৎপাদন করিতে সম্মত হইলেন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় অম্বিকা ঋষির বিকট মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে দাসীকে প্রেরণ করেন। ঐ

দাসী গর্ভে দ্বৈপায়নাত্মজ বিদুরের জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ জন্য রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন নাই। পাণ্ডু সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজদুহিতা গান্ধারীকে এবং পাণ্ডু কুন্তী ভোজ রাজার পালিতা কন্যা (১) কুন্তীকে স্বয়ম্বরে এবং মদ্রদেশাধিপতি মাদ্রীকে শুল্ক প্রদানে বিবাহ করেন।

উদ্বাহ সম্পন্ন হওয়ার পর মহারাজ পাণ্ডু পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছা বিহারে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা পাণ্ডু মৃগয়ার্থ বন ভ্রমণ করিতেছিলেন এমত সময় এক মৃগ যুগপৎ মৃগীর সহিত তথায় ক্রীড়া রসে ব্যাপৃত রহিয়াছে এমন সময় তিনি ঐ মৃগ ও মৃগীকে প্রমত্ত দেখিয়া উপর্যুপরি বাণ নিক্ষেপ করিয়া বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মৃগ পাণ্ডুর শরাঘাতে ধরাতলে নিপতিত হইয়া কহিল "হে রাজন্? আমি ঋষিপুত্র। মৃগরূপ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম। তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অপবিত্র স্থানে বধ করিলে, আমিও শাপ দিতেছি তোমারও ঈদৃশ অপবিত্র সময় মৃত্যু হইবে।" মৃগ এই প্রকার শাপ প্রকাশ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ঊনবিংশত্যাধিক শততম অং, আদিপর্ব্ব।

এই অভিসম্পাতে পাণ্ডু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক কুন্তী ও মাদ্রী ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে পাণ্ডু মহারাজ বনবাসী হইলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুর প্রভৃতির পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পর ধৃতরাষ্ট্রর শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

ঐ বিবরণ মহাভারতে অতি অদ্ভুতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। একদা মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্নাতিশয় ক্ষুৎপিপাসায় শ্রমান্বিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলে, গান্ধারী পরম সমাদরে তাঁহার শুশ্রূষা করেন, মহর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে চাহিলে গান্ধারী শত পুত্রের বর প্রার্থনা করেন। কিয়দ্দিন পর ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গান্ধারী গর্ভবতী হইলেন ক্রমে দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি পুত্র প্রসব করিলেন না। কিন্তু যখন শুনিলেন কুন্তীর সন্তান জন্মিয়াছে তখন গর্ভপাত করিলেন। ঐ গর্ভে সংহতা লৌহষ্ঠীলার ন্যায় এক দ্বিবর্ষ সম্ভূতা মাংসপেশী জন্মিল। গান্ধারী তখন দুঃখিতা হইয়া সেই মাংশপেশী পরিত্যাগ করিতে উপক্রম করিতেছেন এমন সময় বেদব্যাস উপস্থিত হইয়া বলিলেন "সৌবলেয়ি! মাংসপেশী নষ্ট করিও না। আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। ইহা হইতে তোমার অবশ্যই একশত পুত্র হইবে। তুমি গুপ্ত প্রদেশে ঘৃতপূর্ণ শত সংখ্যক কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া এই মাংস পেশীর উপর জল সেচন কর।" গান্ধারী ব্যাসের বচন অনুসারে কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া মাংপেশীর উপর জল সেচন করিতে লাগিলেন। জল সেচনের পর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে মাংসপেশী একাধিক শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল, অনন্তর গান্ধারী সেই সকল খণ্ড পূর্ব্ব প্রস্তুত কুম্ভ সকলের মধ্যে গূঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব কহিলেন "হে সৌবলেয়ি? আর ২ বৎসরের পর এই সকল কুম্ভ উদ্‌ঘাটন করিও"

অনন্তর দুই বৎসর অতীত হইলে প্রথম দুর্য্যোধন জন্মিল। ঐ দিবসই ভীমসেনের জন্ম হয়। তৎপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের জন্মের কিয়দ্দিন পর ধৃতরাষ্ট্রের অপর ঊনশত পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। একমাস মধ্যেই ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও এক কন্যা সমুৎপন্ন হইল।

বেদব্যাস গান্ধারীর শত পুত্রের বর প্রদান করেন। তদতিরিক্ত এক কন্যা দুঃশলা কিরূপে জন্মিল, রাজা জনমেজয় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বৈশম্পায়ন মুনি কহিলেন কোন সময় গান্ধারী মনে ২ একটী কন্যা কামনা করিতেছেন এমত সময় বেদব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া

(১) কুন্তী সুরসেন রাজার কন্যা। কুন্তীভোজ রাজা কুন্তীকে পোষ্য গ্রহণ করেন।

তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া সেই ভাগ গণনা করিয়া দেখিলেন শতাপেক্ষা একভাগ অধিক হইয়াছে। তখন বেদব্যাস গান্ধারীকে কহিলেন অতিরিক্ত ভাগ হইতে তোমার একটী কন্যা হইবে এই বলিয়া ঐ অতিরিক্ত ভাগ অন্য একটী কুম্ভে রাখিলেন। ইহা হইতেই দুঃশীলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইল।

এই অতি অনৈসর্গিক অলৌকিক কৌরবগণের জন্ম বৃত্তান্তের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবণ অতি অসম্ভব। কখন ২ ভাবি যে পূর্ব্বকালের লোক সকল কি এতই নির্ব্বোধ যে এরূপ একখান আরব্যোপন্যাসের ন্যায় গ্রন্থ সমাদর করিয়া আসিতেছেন, যাহা কোনরূপই সম্ভব হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষা কি এতই জটিল যে বর্ত্তমান সময়ে তাহার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য করিতে না পারিয়া বিকৃত অর্থ করা হইয়াছে। তবে কি মহাভারতের বর্ণিত ধর্ম্ম তত্ত্বের প্রসব জ্যোতিবিকীর্ণ হইয়া উপাখ্যান ভাগের অদ্ভুত বর্ণনা দগ্ধীভূত হইয়াছে সেই জন্যই কি ঐ সকল অলৌকিক ঘটনার দোষ গুণ কেহই লক্ষ্য করেন নাই অথবা তপঃ প্রভাবপূর্ণ ঋষিগণের কি এরূপ অসাধারণ দৈবশক্তি ছিল যে সেই শক্তি প্রভাবে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। এই সকল ঘটনার মূল অনুসন্ধান করিয়া আমাদের প্রীতি করতত্ত্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন।

যে সময় ভারতবর্ষ জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় ছিল সেই সময় মহাভারত বিরচিত হইয়াছে এবং তদবধি হিন্দু সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। ঐ সকল ঘটনার মূল অনুসন্ধান করিলে তাহার কোন মীমাংসাই করিতে পারিব না। কালের তরঙ্গাঘাতে মহাভারত কত বিকৃতাঙ্গ ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কি বিষম দুরাবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। কত যুগ ধরিয়া ক্রমাগত আঘাত পাইতে ২ কোন ২ অঙ্গ সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। কেহ ২ সেই অঙ্গের চিকিৎসা করিয়া সংশোধনের ফলে তাহা বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। কোন ২ অঙ্গ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় কেহ ২ তাহা পূরণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা পূর্ব্বমত না হইয়া নূতন প্রণালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে জানে কোন্ অংশ বেদব্যাস বিরচিত ও কোন্ অংশ পরে সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং কিরূপে যে এই সকল ঘটনা মহাভারতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। অনেকে বেদতুল্য মহাভারত এই বুদ্ধিতে বিশ্বাস করিতে পারেন। ইহা যে উন্মত্ত প্রলাপ তাহা বলা যায় না। আমরা এই মাত্র বলি যে এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে। কোন ভাবে বেদব্যাস লিখিয়াছেন তাহা বুঝি না।

যৎকালে গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন তখন তিনি গর্ভ পরাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্লিশ্যমানা হন। সেই সময়ে একজন বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। ঐ বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গর্ভবতী হয় এবং যথাকালে স্বাভাবিক নিয়মে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। ঐ পুত্রের যুযুৎসু নাম হইয়াছিল। এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর গর্ভে শতপুত্র ও এক কন্যা এবং বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসু নামা পুত্র জন্মে। আদিপর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই মহারাজ পাণ্ডু বনবাসকালে কুন্তীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া পরপুরুষদ্বারা অপত্যোৎপাদনের প্রস্তাব করিলে কুন্তী কহিলেন "হে ধর্ম্মাত্মন্ আমি তোমারই ধর্ম্ম পত্নী বিশেষতঃ তোমারই অনুরক্ত অতএব তোমার এরূপ অনুমতি অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত হইতেছে," পরিশেষে উভয়ের অনেক তর্ক বিতর্কের পর পাণ্ডুর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কুন্তী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে মহারাজ আমি বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথি সৎকারে নিযুক্ত থাকাসময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা তথায় আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। আমি যত্ন সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম, মহর্ষি আমার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন "গ্রহণ কর, তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যেই দেবকে আহ্বান করিবে তিনি অকামই হউন আর সকামই হউন তৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। তুমিও সেই অমর প্রসাদে পুত্রবতী হইবে," রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীবাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "সুন্দরী!

দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে আহ্বান কর," কুন্তী যে আজ্ঞা বলিয়া বিবিধোপচারে ধর্ম্মের উদ্দেশে পূজা সাঙ্গ করিয়া মহর্ষি প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিমানে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলে কুন্তী তাঁহাকে কহিলেন "মহাত্মন্ আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক সন্তান প্রদান করুন।" ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া তাঁহার গর্ভে সর্ব্বপ্রাণী হিতকর পরম যশস্বী এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র ইন্দ্রদৈবত চন্দ্রসংযুক্ত অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সময় জন্ম গ্রহণ করিল। এই পুত্রই যুধিষ্ঠির। তৎপর পাণ্ডুর আদেশ অনুসারে বলবান পুত্রের জন্য কুন্তী মহর্ষিদত্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বায়ুকে আহ্বান করিলেন। বায়ু তৎক্ষণাৎ মৃগারোহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন, এই পুত্রের নাম ভীম, পাণ্ডু সর্ব্বলোক শ্রেষ্ঠ একটী পুত্রলাভের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহর্ষিগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক পাণ্ডু কুন্তীকে সাম্বৎসরিক ব্রতানুষ্ঠানের আদর্শ প্রদান করিলেন এবং আপনিও একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপস্যাচরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ তদীয় তপঃপ্রভাবে সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন "আমার অনুগ্রহে তোমার মনোমত পুত্র জন্মিবে," পাণ্ডু কুন্তীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন "তুমি এইক্ষণে ত্রিদশাধিপতিকে আহ্বান করিয়া তাঁহা হইতে পুত্র উৎপাদন করিয়া লও।"

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে মহর্ষি দত্ত মন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিলেন, ইন্দ্রদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলেন, ঐ পুত্রের নাম অর্জ্জুন।

অনন্তর মাদ্রী নির্জ্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন "মহারাজ? দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋষিশাপে সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, কুন্তী পুত্রবতী হইলেন। আমি পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত রহিলাম, যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলেই আমার পুত্র হয়, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুরোধ করেন তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি।" রাজর্ষি পাণ্ডু সম্মত হইয়া কুন্তীকে অনুরোধ করিলেন। কুন্তী পাণ্ডুনৃপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মাদ্রীকে কহিলেন "তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে তোমার অনুরূপ পুত্রলাভ হইবে," মাদ্রী কুন্তীর আদর্শ ক্রমে অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনী কুমার তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভে যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব।

মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেবতুল্য প্রিয়দর্শন পঞ্চপুত্র লাভ করিয়া পরমসুখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে ঋতুরাজ বসন্ত আবির্ভূত হইলে রাজা বনবিহার করিতে গমন করিলেন। মদ্ররাজ দুহিতা দিব্যাম্বর পরিধান পূর্ব্বক একাকিনী তাঁহার পশ্চাৎ ২ চলিলেন। বনমধ্যে রাজার অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে ২ অনঙ্গ শরে অবশচিত্ত হইয়া ঋষি কুমারের শাপবিস্মৃত হইতে মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন। অলঙ্ঘনীয় মৃগরূপধারী ঋষি কুমারের অভিসম্পাত প্রভাবে পাণ্ডু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মাদ্রী মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুন্তীও দূর হইতে আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। মাদ্রী সহমরণ গমনেচ্ছা করিয়া কুন্তীকে কহিলেন আমার এই ভিক্ষা যে মহারাজার মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর। আমার পুত্রদ্বয়কে আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিও। মদ্ররাজ দুহিতা কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ—

REGTD. No. C. 704.

১৪শ বর্ষ | মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩১ | ৪র্থ সংখ্যা।

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত

প্রতিভা

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার
এম্-এ, পি-এইচ-ডি, এফ্-সি-এস

সূচী

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২।০/০ } শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রতিভা কার্য্যালয়, ঢাকা। { এই সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সহ ৷৷৵০

——(০)——

প্রতিভার নিয়মাবলী।

১। প্রতিভার বার্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সহ ২।৵০ আনা। এক সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র। নমুনার জন্য ।০ আনা পাঠাইতে হইবে। সাধারণের সমিতি বা পাঠাগার হইতে ৴১০ আনার টিকিট সহ আবেদন করিলে নমুনা প্রদত্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়। কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকেও বৈশাখ হইতে পত্রিকা লইতে হয়। মূল্যাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট পাঠাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপন দেওয়ার নিয়ম—মাসিক একপৃষ্ঠা বা দুই কলম—১০৲, অর্দ্ধপৃষ্ঠা বা এক কলম—৫॥০ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—৩৲, সিকি কলম—২৲।

কভারের পৃষ্ঠার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম। ছয় মাস বা তদূর্দ্ধ কালের জন্য বিজ্ঞাপনে স্বতন্ত্র চুক্তির দর দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহা পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে, নতুবা পূর্ব্ব ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রহিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। চুক্তির বিজ্ঞাপন তিন মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

প্রতিভার জন্য বিনিময় পত্রিকা ও প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। সমালোচনার জন্য গ্রন্থাদি দুইখানি করিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি সমস্তই নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার প্রতিভা।
ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ কার্য্যালয়,
৬৭ নং প্যাট্রেল স্ট্রীট, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

ঢাকা, বনগ্রাম রোড, সন্তোষ প্রেস—প্রিন্টার শ্রীমদনমোহন দে সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

১৪শ বর্ষ | মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩১ | ৪র্থ সংখ্যা

ভারতের মৃগয়া প্রথা।

ভারতের রাজন্যবর্গের মৃগয়া বিহার সবিশেষ আনন্দ ও কৌতুকপ্রদ। সে কালের রাজন্য সমাজে ইহার কিরূপ প্রসার, প্রচলন ও সমাদর ছিল সংস্কৃত কাব্যামোদী বিদগ্ধবর্গের পক্ষে উহার নূতন পরিচয় দান অনাবশ্যক। মৃগয়া শব্দের জন্মকালের অনুসন্ধানে জানা যায়, এটী খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বকালে পরিসমাপ্ত বলিয়া অনুমিত। অতি প্রাচীন পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীর মূলে ব্যুৎপাদিত হয় নাই। এক শতাব্দীর পরে পাণিনীর ৩।৩।১০১ সংখ্যক সূত্রটীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বার্ত্তিক প্রণেতা কাত্যায়ন তদ্‌রচিত বৃত্তিতে মৃগয়া শব্দটী ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। মূল সূত্রে উক্ত অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনার নাম বৃত্তি। সুতরাং অষ্টাধ্যায়ীতে অব্যুৎপাদিত মৃগয়া শব্দের বার্ত্তিক সূত্রমালায় সংগ্রথন অতি মাত্র যুক্তিসহ। ঐ সুদূর অতীতকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত মৃগয়ার স্বল্প বিস্তর অনুষ্ঠান এদেশে প্রচলিত আছে। অরণ্য-বহুল শ্বাপদ সঙ্কুল জনপদকে নিরাপদ করা মৃগয়ার গৌণ উদ্দেশ্য। আর যুদ্ধক্ষম শারীর বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক আনন্দ উপভোগ মৃগয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। মহামান্য মনুস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের "পানমাক্ষঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়াচ" ইত্যাদি ৪৭—৫০ শ্লোকে সুরাপান প্রভৃতি ১৮শ প্রকার ব্যসন (Hobbey or manea) রাজার পক্ষে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই আঠার প্রকার ব্যসনের মধ্যে মৃগয়া, দ্যূত (জুয়াখেলা—Gambling), মদ্যপান, ও স্ত্রৈণতা (Excessive fondness for women) এই চারিটী "কষ্টতম" অর্থাৎ অতি অহিতকর বলিয়া বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখন বিবেচ্য যে ভারতীয় আর্য্য সমাজের প্রধান নিয়ন্ত্রী সর্ব্বস্মৃতি শিরোমণি মনুস্মৃতিতে যেটী অতি গর্হিত বলিয়া বর্জ্জনের বিধান রহিয়াছে, আবহমানকাল সেই শাস্ত্র নিন্দিত প্রথা কিরূপে জন সমাজে বিশেষতঃ দেশীয় সভ্যতার মূলাধার রাজন্য সমাজে সাদরে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

শাস্ত্রীয় বিচার সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়া দেখিলে এটা একটা বিরাট অসামঞ্জস্য বা stupendous anomaly বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। বিষয়টী বিশদ করিবার জন্য এস্থলে শ্রীমদ্ ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের ২৬শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকটীর অনুবাদ দেওয়া হইতেছে। এই শ্লোকে জীবরূপী পুরঞ্জনের মৃগয়া প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, "রাজা প্রসিদ্ধ তীর্থে বৈধশ্রাদ্ধ সম্পাদনার্থ পবিত্র পশুগণকে আবশ্যক মত বধ করিবেন। ইহার পূর্ব্বে ৪র্থ শ্লোকে "মৃগব্যসনলোলুপঃ" রাজার একটী বিশেষণ আছে। উহার অর্থ মৃগয়া ব্যসনে অত্যাসক্ত। এখন দেখিতে হইবে উক্ত শ্রীমদ্ ভাগবতীয় বচনের তাৎপর্য্য বিধি না নিয়ম। উহা "মৃগবধ করিবে না" এরূপ বিধি (Injunction) হইতে পারে না। কারণ "অপ্রাপ্ত প্রাপকের বিধিঃ" রাগ (প্রবৃত্তি) ও শাস্ত্রীয় বিধানে পূর্ব্বে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাহার কর্ত্তব্যতার আদেশের নাম বিধি। এস্থলে মাংস গ্রহণার্থ মৃগবধ মানবের পক্ষে রাগপ্রাপ্ত, কিনা প্রবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তির মূল স্বভাব। স্বভাবের কোন মূল বা হেতু নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শিখাইয়াছেন, স্বভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ চলে না। "নহি স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে।" শারীরক ভস্য, ২য় অঃ, ১ম পাদ, ৩৩ সূত্র। "ভোজন করিবে" যেমন বিধি হয় না, "মাংসার্থ মৃগবধ করিবে" ঠিক তেমনি বিধি নহে। উহা অন্যথা মাংস ভোজন প্রবৃত্তির সংকোচক নিয়ম। ফলে যদি মৃগবধ করিতেই হয়, তাহা হইলে, কেবল রাজাই করিবেন, তিনিও যদি মাংস ভোজনে প্রবৃত্তিমান্ হন, তাহা হইলে, তীর্থক্ষেত্রে, শ্রাদ্ধকৃত্যে, প্রয়োজনানুরূপ পবিত্র পশু বধ করিবেন। এই ছয় প্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে থাকিয়া মৃগয়ায় পশুবধ করা যে ভগবান্ মনুর অনভিমত অবাধ জীবহত্যার প্রশ্রয় দান নহে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিতেছেন। একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ কর্ত্তার অন্ততঃ আঘ্রাণ লইয়াও শ্রাদ্ধ শেষ ভোজন যেমন অপরিহার্য্য নিয়ম, মৃগয়া বিনোদশীল রাজার তথাকথিত দেশকাল অবস্থার অধীন হইয়া মৃগয়া করণও সেইরূপ বাধ্যতঃ মূলক অনুষ্ঠান।

এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তমূলে ভারতের পঞ্চম বেদ মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া মহাকাব্য, নাটক, কথাকাব্য পর্য্যন্ত প্রায় সকল সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থেই ইহার ন্যূনাধিক বিবরণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও মৃগয়ার নিদর্শনের অভাব নাই। Book of Genisis XXV, 27 (২৫শ অধ্যায়ের ২৭শ সংখ্যক) পাঠাংশে উক্ত হইয়াছে,—"And Esau was a cunning hunter, as man of the field." + + + + + And Esau went to the field to hunt for venision." ইত্যাদি। স্থবির পিতা Isaac এর মাংসভোজন স্পৃহার চরিতার্থে সুদক্ষ শিকারী ইশে (Esau) হরিণ মাংস সংগ্রহার্থে প্রস্থান করিলেন। আমরা হরিবংশে ঠিক এই ভাবের কথা দেখিতে পাই। বৃদ্ধ মহারাজ ইক্ষ্বাকু তাঁহার যুবক পুত্র বিকুক্ষিকে মৃগয়া দ্বারা মাংস সংগ্রহ করিতে আদেশ দিতেছেন। "ইক্ষ্বাকুস্ত বিকুক্ষিংবৈ অষ্টকায়াং যথাদিশৎ মাংস মানয় শ্রাদ্ধায় মৃগাং হত্বা মহাবল॥" মহাভারত আদিপর্ব্ব ১১৪শ অধ্যায়ে "কিয়ৎ দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু + + + + পত্নীদ্বয় সঙ্গে বনবিহার বাসনায় বন প্রস্থান করিলেন। তথায় সর্ব্বদা মৃগয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রিয়তমাদের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বের ১১৮শ অধ্যায়ে মৃগরূপী ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে "পাণ্ডু কহিলেন, রাজাদিগের শত্রুবধ যেমন কর্ত্তব্য মৃগবধও সেইরূপ কর্ত্তব্য। প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য মৃগ পাইলেই বধ করিবে। দেখ, মহর্ষি অগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মৃগয়া করিয়াছিলেন।" ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ১১৩ অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে "ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় পরাক্রমার্জ্জিত মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাদিগকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদয় অরণ্য পশুকে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। + + + +। এইরূপে মৃগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥" রামায়ণে মৃগয়া বিলাসী মহারাজ দশরথের অপূর্ব্ব বীরত্ব

বিজ্ঞাপক শব্দভেদী বাণের অসাক্ষাতে সিন্ধুবধের করুণ আখ্যান ভারতের সর্ব্বজন সুবিদিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যুবরাজ উত্তম ও পুরঞ্জয় প্রভৃতি প্রজাপালগণের উপাখ্যানে মৃগয়ার সবিশেষ বর্ণনা দেখা যায়। অতি প্রাচীন ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" ইত্যাদি নিবন্ধে যজ্ঞ ও মৃগয়ায় পশুবধের অনুমোদনের আভাস পাওয়া যায়। এতাদৃশ যজ্ঞ ও মৃগয়া কেবল ক্ষত্রিয় নৃপতির পক্ষে অনুমোদিত হইয়াছে। কাব্যপ্রকাশ প্রমুখ সুপ্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাকাব্যের সোপান নির্ণয়ে মৃগয়া একটী অন্যতম প্রধান বর্ণনীয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এমতে সংস্কৃত মহাকাব্য মাত্রেই মৃগয়ার অল্পাধিক বর্ণনা অপরিহার্য্য। ভারতের কবি-সম্রাট কালিদাসের কাব্য প্রতিভার তরুণ অরুণ রঘুবংশের ৯ম সর্গের ৪র্থ শ্লোক হইতে শেষাংশ কেবল মহারাজ দশরথের মৃগয়াচর্য্যার মনোজ্ঞ বিবরণে সুসজ্জিত। এই কবিরাজরাজেশ্বরের প্রতিভা সম্ভব পৃথিবী জয়ী নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ২য় অঙ্কের প্রথমাংশে সেনাপতির মুখে মৃগয়ার যে অপূর্ব্ব গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে, সাহিত্যসেবীর উহা চির অবিস্মরণীয়। পরে উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইল। সুবিখ্যাত মহানাটক বা হনুমন্নাটকের ৩য় অঙ্কে "রামো মৃগং মৃগয়তে বনবীথিকাসু" ইত্যাদি বর্ণনায় মৃগয়ার চিত্র সুব্যক্ত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর বিখ্যাত মহাকাব্য ভট্টিকাব্যের ৪র্থ সর্গে, "শয্যোত্থায়ং মৃগান্ বিধ্যন্" ইত্যাদি শ্লোকেও মৃগয়ার প্রসঙ্গ সুপরিস্ফুট। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত শ্রীহর্ষের সুধারসানন্দী নৈষধীয় চরিতের ২য় সর্গের ৯।১০ম শ্লোকে রাজকবি হংসমুখে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মৃগয়ার বৈধতা ও সুন্দর উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। একাধিক মহাকাব্যের কথাই বলা হইল। এখন সংস্কৃত গদ্য কাব্যের বা কথাকাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, প্রবীণ দণ্ডী কবির লিখিত বিশ্রুতনামা দশকুমার চরিতের অষ্টম উচ্ছ্বাসে বিশ্রুত চরিত বর্ণনা মুখে মৃগয়ার অসাধারণ গুণগ্রাম পরিগীত হইয়াছে। বর্ত্তমান সন্দর্ভের উপজীব্য গ্রন্থের নাম এবং উহাতে প্রদত্ত মৃগয়ার বিবরণের স্থান মোটামুটি একরূপ উল্লিখিত হইল। এখন রাজনীতির মূল গ্রন্থ কামন্দকীয় নীতিসারে রাজধর্ম্মের নৈমিত্তিক অঙ্গ মৃগয়াক্রিয়ার কিরূপ বিধি ব্যবস্থা আছে তাহা দেখার প্রয়োজন। কারণ উক্ত কাব্য গ্রন্থাবলীর সর্ব্বপ্রধান টীকাকার পণ্ডিতরাজ মল্লিনাথ তৎকৃত ব্যাখ্যার সমর্থন কল্পে প্রায়শঃ এই গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন। অতএব এ সম্পর্কে একেবারে নীরব থাকিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানির বিশেষ সম্ভাবনা। ঐ গ্রন্থের ১৩শ সর্গে ব্যসন সমূহের নাম ও লক্ষণ নির্দ্দেশ, এবং ১৪শ সর্গে প্রবল ব্যসন গুলির সেব্যতা, অসেব্যতা ও দোষ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৪শ সর্গের ৯শ শ্লোক হইতে ২৪শ পর্য্যন্ত শ্লোক গুলিতে যানভঙ্গ, ক্ষুধা, পিপাসা, আয়াস, শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ুঘটিত ক্লেশ, কুশ, কণ্টকময়, উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ ভূমিতে ভ্রমণ, বৃক্ষ সঙ্কট, কণ্টকময় লতা গুল্মের ছেদন, দুরারোহ শৈলারোহণ, উচ্চতর বল্মীক লঙ্ঘন; গহন কানন, পঙ্কিল, নদী ও গুহা গহ্বরের কৃচ্ছ্রাবাধ্য সঞ্চরণ; বনদস্যু, শত্রুপক্ষ ও শত্রুসৈন্যের প্রচ্ছন্ন অবস্থিতি; ভীষণ ভল্লুক, অজগর, বন্যহস্তী, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদজনিত ভয়; দাবাগ্নি দাহ, দিঙ্‌মোহ (Mistaking the way or direction) প্রভৃতি মৃগয়া মূলক কথিত হইয়াছে। অতঃপর ২৫শ হইতে ২৭শ শ্লোকে ব্যায়াম, শ্রম পাটব, মেদশ্ছেদ (Reduction of fat), শ্লেষ্মক্ষয়, আমনাশ, চঞ্চল (ধাবমান) লক্ষবেধনে কৃতহস্ততা আদি বহু গুণের সমুল্লেখ আছে। এই অধ্যায়ের ৬৫তম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, রাজা যথাশক্তি স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন, পরিমিত মাত্রায় সুরাপান করিতেও পারেন, কিন্তু তিনি কখনও যেন দ্যূত ক্রীড়ায় আসক্ত বা মৃগয়ায় অত্যাসক্ত না হন। ঐ শ্লোকের "পানং বা সাধু মাত্রয়া" এই অংশে "সাধু" শব্দটির অর্থ সাবশেষ প্রাণদানাই। ইহার স্থান সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা যদি মৃগয়ায় অভিলাষী হন, তাহা হইলে রাজধানীর অনতিদূরে অর্দ্ধ যোজন বিস্তৃত ও পরিধি সমন্বিত, পশুদিগের অলঙ্ঘ্য পরিখা পরিবৃত, পর্ব্বত কিংবা নদী সমীপবর্ত্তী প্রচুর জলযুক্ত, শ্যামল তৃণরাজি

শাভিত, কণ্টক লতাগুল্মহীন, বিষ বৃক্ষ বিরহিত, ফল পুষ্প শোভী ছায়াস্নিগ্ধ নিবিড় দ্রুম মণ্ডিত, কলকণ্ঠে বিহগ কাকলী মুখরিত, হস্তি ব্যাঘ্র মৃগ বহুল মনোহর মৃগয়া কানন প্রস্তুত করাইবেন। পদক্রমে পটু নৃপতি রাজকার্য্যের কোনওরূপ ব্যাঘাত না করিয়া আপ্ত বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গের সহিত মৃগয়া বিহারার্থ ঐ বনে বিচরণ করিবেন। প্রবেশের পূর্ব্বে বন প্রদেশ উত্তমরূপে পরীক্ষিত করাইবেন এবং ঐ বনের বহিঃপ্রদেশে সর্ব্বদা সশস্ত্র সৈন্য প্রস্তুত রাখিবেন। কামন্দকীয় নীতিসারের ইহাই হইল মৃগয়া সংক্রান্ত মোটামুটি কথা। এই নীতি সূত্রের আদর্শে কালিদাসের কাব্য কহিনুর অভিজ্ঞান শকুন্তলে উক্ত হইয়াছে, "মৃগয়াচর্চ্চার ফলে মেদঃক্ষয় হইয়া উদর কৃশ, শরীর লঘু ও উৎসাহযোগ্য হয়। ভয়ে ও ক্রোধে বন্য জন্তুর চিত্তের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা বুঝিবার শক্তি জন্মে। ধানুষ্ক দিগের ইহাও একটা বিশেষ শ্লাঘার বিষয় যে, তাঁহারা এই মৃগয়ানুশীলনের ফলে চঞ্চল (পলায়মান) লক্ষ বাণ বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন। বিশেষতঃ নিরন্তর সবলে ধনুর্গুণ আকর্ষণ করায় ইঁহাদের শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ অতিশয় দৃঢ় ও কঠিন হইয়া থাকে। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন। কঠোর পরিশ্রমেও গাত্রে শ্রম জল উদ্গত হয় না। শরীর ক্ষীণ হইলেও পেশী মণ্ডলীর দৃঢ়ত্ব ঘটিত ঘন সংঘাতে উহা সহসা ক্ষীণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ইহার প্রভাবে প্রাণশক্তি সমধিক পরিপুষ্টি ও দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করে। লোকে মৃগয়াকে নিরর্থক ব্যসন (বাতিক) বলিয়া নিন্দা করে। এরূপ বিশুদ্ধ আমোদ আর কিসে পাওয়া যাইতে পারে?" অভিজ্ঞান শকুন্তলের ২য় অঙ্কের ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকের ভাবানুবাদ। দশকুমার চরিতের বর্ণনা আরও বিশদ ও সমুজ্জ্বল বিবেচনায় কিঞ্চিৎ অনূদিত হইল। "মহারাজ! রাজার পক্ষে মৃগয়া যেমন উপকারী তেমন আর কিছুই নহে। ইহাতে উপযুক্ত ব্যায়ামের ফল হওয়ায় জঙ্ঘা (Thigh) দীর্ঘ পথ অতিক্রমের শক্তি সঞ্চয় করে। শক্তিশালিনী জঙ্ঘার সাহায্যে বিপৎকালে যথেষ্ট উপকার লাভ হয়। কফের অপায়ে আরোগ্যের নিদান জঠরাগ্নির সন্ধুক্ষণ ঘটে। মেদক্ষয় হেতু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির দৃঢ়তা, কাঠিন্য ও লঘুতা জন্মে। শীত গ্রীষ্ম, বাত বর্ষা ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করিবার মত শক্তি সঞ্চয় হয়। অবস্থা বিশেষে সংঘটিত আরণ্য জন্তু নিবহের মনোভাবের ভাবান্তর বুঝিতে পারা যায়। হরিণ গবয়াদি শস্যভোজী পশুকুলবধে শস্য রক্ষা হয়। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর নিপাতে স্থল পক্ষের বিপদ নিরাকৃত হয়। পর্ব্বত, গুহা অরণ্যানী প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। অরণ্যচারীদের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনের সুযোগ ঘটে। শরীর লঘু ও কর্ম্মপটু হওয়ায় উৎসাহ শক্তি সমধিক বৃদ্ধি লাভ করে। ইহাতে প্রতিপক্ষ বিশেষ ভীত হইয়া থাকে।" নৈষধচরিত প্রণেতা রাজকবি (Poet Laureate)। তিনি এই রাজার পক্ষে মৃগয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পারগামীদের অনুমোদিত, অতএব উহা রাজধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া পরে, মৃগয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কেন, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন কবির উক্তির ভাবার্থ—"ধর্ম্মশাস্ত্র পারদর্শী নৃপমণ্ডলী মৃগয়ার নিন্দা করেন না, প্রত্যুত উহার অনুষ্ঠানই করিয়া থাকেন। নরেন্দ্র! আমি হংস, মৃগয়াধর্ম্ম অনুসারে আপনি আমাকে বধ করিলেও আপনার কোনও প্রত্যবায় হইত না। তথাপি আমাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় আপনার পবিত্র রাজধর্ম্ম দয়াগুণে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইল। বিবেচনা করিয়া দেখুন, চুকল স্বকুলভোজী বৃহৎ মৎস্য বধ করায়, বিষ্ঠা ত্যাগ ও ফল নাশাদির দ্বারা নিজ আবাস বৃক্ষের অনিষ্টসাধক পক্ষি কুলের হত্যায়, আর জগৎপ্রাণ শস্যভোজী মৃগ কুলের হননে মৃগয়াপ্রিয় রাজার কোনও পাপ স্পর্শ হয়না। পরন্তু জগতের প্রভুত অহিতকারী ঐসকল অত্যাচারী জীবের অদমনে কর্ত্তব্যের ত্রুটি ঘটায়, রাজার মহৎ অযশ ও স্বপদচ্যুতির সম্ভাবনা।" মৃগয়ার উপকারিতা সম্পর্কে একাধিক কথাই বলা হইল, মনে হয়। এখন ইহার সময় সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের জনক অভিন্ন বিভিন্ন বয়সের সন্তান হইলেও পৈতৃক গুণ সংক্রমণে ইহাদের উভয়ের ভিতর খুব বড় একটা ব্যবধান

দেখা যায়না। একখানি মহাকাব্য আর একখানি নাটক। একখানি কেবল পাঠ বা শ্রবণ করিয়া রসগ্রহ করিতে হয়। অপর খানির রস আস্বাদনে দর্শন শ্রবণ দুএরই প্রয়োজন। একখানি কেবল বর্ণনা, অন্যখানি বিচিত্র চিত্র। একখানি ভাব প্রধান, অপরখানি রসপ্রধান। ননি মাখনের ন্যায় ইহাদের অন্তরের মৃণাল তন্তু সুখ উৎকর্ষ অপকর্ষ অবধারণ করা সবিশেষ সাধনা সাপেক্ষ। তবে এই মাত্র বলা যায় যে অভিজ্ঞানশকুন্তল পৃথিবী-জয়ী হইলেও রঘুবংশ তাহার সারথি। রঘুর দিগ্‌বিজয়ের রথচক্রই শকুন্তলার পৃথিবীজয়ের প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। এই দুই মহাগ্রন্থেই আমরা মৃগয়া কালের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইতেছি। প্রথমতঃ রঘুবংশের ৯ম সর্গের ৪৮শ শ্লোকে "অথ যথাসুখ মার্ত্তব মুৎসব মনুভুয়" এই কবিতাংশে আর্ত্তব উৎসব শব্দে বসন্তোৎসব (Vernal festivity) বুঝাইতেছে অর্থটী টীকাকার মল্লিনাথ কৃত। বসন্তোৎসব সমাপ্ত হইলে মৃগয়া যাত্রা করিলেন বলিলে, স্থলতঃ গ্রীষ্ম প্রারম্ভই (Early summer) বুঝায়। অভিজ্ঞান শকুন্তলে ঠিক এই সময়ের কথাই বলা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় "সুভগ সলিলাবগাহা ইত্যাদি শ্লোকে গ্রীষ্ম প্রারম্ভেই শকুন্তলার অভিনয় কথা সূচিত হইয়াছে। ২য় অঙ্কের প্রথমেই মাধব্যদুষ্মন্ত সংবাদে মৃগয়ার কথা উঠিয়াছে। একথার প্রথম গ্রীষ্মের পরিচয় সুপরিস্ফুট। "অষ্ট মহিষগণ নির্ভয়ে জলে অবগাহন করুক। মৃগকুল শীতল বৃক্ষছায়ায় দল বদ্ধ হইয়া গিলিত চর্ব্বন অভ্যাসে ব্যাপৃত থাকুক," ইত্যাদি কবিতাই ইহার অকাট্য প্রমাণ। রঘুবংশে এ ভাবের অনেক শ্লোক আছে। ছয়টী ঋতুর মধ্যে যে অবস্থায় মৃগয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, উহাতে বর্ষা শীত সম্পূর্ণ অসময়। শরৎকাল যুদ্ধযাত্রায় সুপ্রশস্ত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহাবীর ভীষ্ম দক্ষিণায়নে শরশয্যায় শয়ান থাকায় উত্তরায়ণের প্রারম্ভেই মহাপ্রয়াণ করেন, ইহা মহা-ভারতের প্রবল প্রমাণ। শরতের পর হেমন্ত যুদ্ধের পর বিশ্রামের কাল। বসন্তকালে ভারতীয় রাজা মহারাজা দিগের ভারত জোড়া বসন্তোৎসব বা হোলীপর্ব্ব শাস্ত্রসম্মত ও সপ্তকাব্য বর্ণিত। এমতে নববর্ষারম্ভ প্রথম গ্রীষ্মই মৃগয়া যাত্রার কাল নির্দ্ধারিত হওয়া সুসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। চৈত্রে বর্ষশেষে অতীত বর্ষের যাবতীয় রাজ কার্য্যই শেষ (আখিরী) করিতে হয়। তৎপরে নব বর্ষারম্ভের প্রথম প্রথম কাজের তত ভীর না থাকায়,তখন মৃগয়া যাত্রা অশোভন নহে। "অন্য কার্য্য না থাকিলে মৃগয়া যাত্রা করিবে।" কামন্দকীয় নীতিতেও এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। তৎকালে মৃগয়ার উপযোগীবেশ প্রস্তুত করান হইত। রঘুবংশের ৯ম সর্গের ৫০ সংখ্যক শ্লোকে "মৃগবনোপগম ক্ষমবেশভৃৎ" এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলের "অপনয়ন্তু ভবন্তো মৃগয়াবেশং" এই গদ্যাংশে আমরা মৃগয়ার স্বতন্ত্র বেশের উল্লেখ দেখি। শকুন্তলার প্রচলিত কোনও টীকায় আমরা মৃগয়াবেশের বিশেষত্ব জ্ঞাপক কোন অর্থ পাই না। রঘুবংশের প্রাচীন টীকাকার চরিত্রবর্দ্ধনের ব্যাখ্যায় আমরা এই বেশের স্বরূপ দেখিতে পাই। তিনি লিখিয়াছেন "যে বেশো লঘু কৃষ্ণকঞ্চুকাদিভিঃ বিভক্তি। দীর্ঘ বস্ত্রাচ্ছাদনেন স্যাৎ। শুক্ল বস্ত্রাবলোকনেন মৃগাদয় দূরতএব পলায়ন্তে অতস্তথাবেশ রথ নমকরেৎ।" অর্থাৎ, সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ কঞ্চুকাদি (অঙ্গরাখা, Jacket) পরিয়া। বড় কাপড় পরিলে পায়ে বাধিয়া দৌড়ানের বাধা জন্মিতে পারে। শুক্ল বস্ত্র দেখিলে পশু কুল দূরে পলাইয়া যায়। এজন্য মৃগয়ার উচিত বেশ পরিয়া ছিলেন। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলে পরিজনবর্গের প্রতি মহারাজের বেশ পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ দানের তাৎপর্য্য বেশ বুঝিতে পারা গেল। রাজা বলিলেন, আজ মৃগয়া বন্ধ থাকিল, সুতরাং তোমরা মৃগয়াবেশ (Hunting suit) ত্যাগ করিয়া শিবিরে অবস্থানের মত বেশ ধারণ কর। মৃগয়ার যান বাহনের বৈশিষ্টও রক্ষিত হইয়াছে। রঘুবংশের ৯ম সর্গের ৫৭ সংখ্যক শ্লোকে "জবন বা জিগতেন" বেগবান্ ঘোটকে আরূঢ় হইয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হেমাদ্রি এস্থলে তৎকৃত টীকায় বসন্তরাজের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—হীনাঙ্গ বিকলাঙ্গ, ক্ষুধাতুর, অশিক্ষিত, মন্থর গতি, রুগ্ন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বৃদ্ধ, যুদ্ধে অনভ্যস্ত, এবং

গর্দ্দভ, গো, মহিষ কিংবা উষ্ট্রযানে মৃগয়া যাত্রা করিবে না। মৃগয়ায় হস্তী শিকার করিবে, কিন্তু বধ করিবে না কারণ হস্তী রাজ্যের অর্থ সমৃদ্ধ বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। মৃগয়া যাত্রায় আমরা মহাভারতে মহারাজ পাণ্ডুকে যুগল পত্নী সমভিব্যাহারে এবং রঘুবংশে রাজাধিরাজ দশরথকে "বিলাসবতী সখঃ" (৯ম, ৪র্থ) ইত্যাদি বিশেষণে প্রিয়তমা মহিষী সঙ্গে যাত্রা করিতে দেখি। মৃগয়াচর্য্যা যখন রাজাদের আমোদ বা সখের ব্যাপার, তখন সে আমোদে মহিষীদের যোগদান নিষিদ্ধ হইলে বিশেষ অঙ্গহানি হয়। পাত্র, মিত্র, ভৃত্য, সৈন্য সামন্ত সঙ্গে থাকায় অবরোধ রক্ষার কোন অসুবিধা হয় না। এমত অবস্থায় সমহিষীক মৃগয়া যাত্রার পক্ষে যুক্তি, রীতি ও বিবেক মূলক কোন বাধা দেখা যায় না। অবশ্য অভিজ্ঞানশকুন্তলে মহারাজ দুষ্মন্তকে মহিষী সঙ্গ বর্জিত করিয়া মৃগয়ায় উপস্থিত করা, চতুর কবি কালিদাসের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শকুন্তলের সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজে ঐ প্রয়োজনের উল্লেখ অনাবশ্যক। প্রবন্ধের প্রতি পাঠ বিষয় মোটামুটি একরূপ বলা হইল। এখন কি অভিপ্রায়ে এ প্রবন্ধ প্রকটিত হইল, সেটা বলা উচিত। প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে মৃগয়ার যে দীর্ঘ ফল শ্রুতি কীর্ত্তিত হইয়াছে, ঐ গুলির তথ্য অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, রাজভোগের মধ্যে লালিত পালিত বিলাস প্রিয় অলস রাজার পক্ষে মৃগয়া লভ্য ফলগুলি যুদ্ধের নিরতিশয় সাহায্যকারী। মৃগয়াপটু মহীপাল অসম্ভাবিত যুদ্ধ কাল উপস্থিত হইবা মাত্র সোৎসাহে ও সানন্দে উহাতে অগ্রসর হইতে পারেন। কারণ যুদ্ধকালে অবশ্য সহনীয় যাবতীয় ক্লেশই তিনি মৃগয়া ব্যপদেশে সহ্য করিতে শিখেন। দেশ ও প্রজারক্ষা রাজার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বা Paramount duty। এই রাজধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত হইবার জন্যই শাস্ত্রাদিতে মৃগয়ার এত যশোবাদ ও বর্ণনার ঘটা দেখা যায়। মৃগয়া সংক্রান্ত আলোচনা একেবারে অসার পণ্ডশ্রম নহে বিবেচনায় আমি ইহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিলাম। সুবিজ্ঞ পাঠক ও সুধী সাহিত্যিক মণ্ডলী এই প্রয়োজনীয় বিষয়টীর প্রতি সাভিনিবেশ মনোযোগ দিলে, কালে এ বিষয়ের বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে, এরূপ আশা একান্ত দুরাশা নহে।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

মায়ের ছেলে।

"সর্ব্ব রূপময়ী দেবী সর্ব্বদেবী ময়ং জগৎ।
অতোহহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্" ॥

জীবন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। আয়ুঃ সূর্য্য—অস্তাচলের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। মায়ের ছেলে সংসারাঙ্গনে মুগ্ধমনে খেলা করিতেছিলেন; কোন দিকে দৃষ্টি নাই,—ঘরে ফিরিতে হইবে সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন। এমন সময় হঠাৎ কি মায়ের ডাক শুনিতে পাইলেন? সে স্বর দূরে—অতি দূরে বড় অস্পষ্ট। তখন তাঁর প্রাণে কেমন একটা উদাসভাব জাগিয়া উঠিল। কি করিতে তিনি এই সংসার ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন? আর কেমন করিয়াই বা তাঁহার দিন কাটিয়াছে! হায়, কিছুইত করা হয় নাই! এখন ত এ খেলা ঘর—এ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইবে। তাই তিনি ব্যাকুল স্বরে গাইয়া উঠিলেন—

ঝংলা—কাওয়ালি।

"প্রাণ যায় রে কখন জানি যায়।
না যায় যে আশ্চর্য্য, নবদ্বার অনিবার্য্য,
কিমাশ্চর্য্য ধৈর্য্য, মন না ভাব উপায় ॥

হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ গেছে কুভ্রমণে,
জিহ্বা গেছে মিথ্যা কুভজনে;
নয়ন গেছে কুদর্শনে, শ্রবণ গেছে কুশ্রবণে,
মনন গেছে কুভাব ভাবনায় ॥

দেখ যে মন দিন যায়, দিন যায় না আয়ু যায়,
যায়রে যায় রাখা নাহি যায়;
কেবা আসে দেখা যায়, দেখা নাহি পাওয়া যায়,
হয় না পুনরায় যেরূপ যায় ॥

পেয়েছিস্ দুর্লভ জনম, সকল জন্মের উত্তম জনম,
উত্তম হতে হয়েছিস্ উত্তম ; কাজে যদি হইস্ উত্তম্,
হবিরে উত্তমোত্তম্. নইলে যাবি অধমাধমতায় ॥

ভাল কার্য্যে দিয়ে ইতি, মন্দ কার্য্যে মতি রতি,
প্রীতি নাহি স্মৃতি শ্রুতি ; কে শিখাল এমন রীতি,
নাহিরে তোর অব্যাহতি, রাজমোহনের ঘটল বিষম দায় ॥

ধীবর যেমন জগদ্বের জাল ফেলিয়া বেগবতী স্রোতস্বতীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণশীল মৎস্যকুলকে ক্রমে ক্রমে করায়ত্ত করে, তেমনি করিয়াইত কালরূপী ধীবর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে।

মিশ্র—দাদ্‌রা।

"জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে'।
ভবে আমার কি হবে গো মা ॥
অগাধ্য জলেতে মিনের আশ্রয়,
জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়।
ও সে যখন যারে মনে করে,
তখন তারে ধরে কেশে ॥

পালাবার পথ নাইকো জালে,
পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে।
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক,
শমন দমন করবে এসে ॥"

প্রাণ আকুল হইয়াছে বটে, কিন্তু কি করিয়া এই সংসার সমুদ্র পার হইতে হইবে? পারের কাণ্ডারীকে ডাকিয়া ভক্ত ছেলে বলিলেন,—

মিশ্র—ঝাঁপতাল।

"পার করহে মাঝি মহাশয়।
আমি যাত্রা করে' বসে আজি
খেয়াঘাটে অনেকক্ষণ হয় ॥

দিব আমি পারের কড়ি, কাঙ্গাল বলে ক'র নাহে ভয়,
যদি আস্‌বার সময় দিয়ে থাকি—
দিব কড়ি যাবার সময় ॥

যাব আমি কালাপুরে, ঠেকা কর্ম্ম না গেলে ত নয়,
এখন তোমার ঠেকায় ঠেকে আছি,
(নইলে) পার হইতাম্ কোন্ সময় ॥

অন্তকে পার করতে তোমার, না হয় সময় অসময়,
কেবল আমার সময় ফিক্র খাটাও,
চোক রাঙ্গাও আর মুখ কালো হয় ॥"

কি করিয়া মাকে পাইব? সেই যে কবে যেন তাঁর ডাকের মত শুনিয়াছিলাম—হায় আর ত শুনি না। কে বলিয়া দিবে কেমন করিয়া তাঁকে পাওয়া যায়?

বাউলে সুর—কাওয়ালি

"পেতে যদি চাও রে মায়ের শ্রীচরণ।
তবে ঘৃণা লজ্জা ভয় আদি
অষ্টপাশ হও মোচন ॥

পেতে চেলে শবাসনা, ত্যজরে সংসার বাসনা,
বিবসনায় বিবসন মন না হ'লে কি পায় কখন;
(দেখ) যে নামের অনুরাগী শঙ্কর হয়েছেন যোগী,
হয়েছেন সর্ব্বত্যাগী,—শ্মশানবাসী পঞ্চানন ॥

(আগে) লয়ে জ্ঞানী বৈদ্যের বিধি,নাশ কর পাপব্যাধি,
ঘরভেদী কাম আদি বন্দী কর ছয়জন;
জ্ঞান আলো জেলে ঘরে, (নাশ) অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
ভক্তি ডোরে কর মন মুক্তকেশীকে বন্ধন ॥

পূর্ণ বলে ও মন ভ্রান্ত, ভ্রমেতে হইও না ক্লান্ত,
অনন্তময়ীর অন্তবেদে নাহি নিরূপন;
বৃথা খোঁজ তন্ত্র আদি, নিজগুণে দয়া না করেন যদি,
(দেখ) বিধিমতে পুজে বিধি,যোগে না পায় যোগীগণ॥"

এতদিন কিছুই করা হয় নাই, হায়, সময়ে চেষ্টা করিলে সবই হইত। কিন্তু এখনও ত হইতে পারে। সময় তো একেবারে বয়ে যায় নাই! হাজার বছরের অন্ধকার গুহা তো একটি মাত্র দীপশলাকার সংঘর্ষে মুহূর্ত্তে আলোকিত হইতে পারে। আর যেন অমূল্য সময় নষ্ট না হয়। তাই তিনি গাইলেন,—

প্রসাদী সুর—একতালা।

"মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা॥

কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥

অদ্য অব্দ শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না
এখন আপন ভেবে (মনরে আমার) যতন করে,
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তিবারি তায় সেঁচনা,
ওরে একা যদি (মনরে আমার) না পারিস মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না॥"

এখন "মা মা" বলে একবার—

বাউল সুর—লোভা।

হৃদয়ভেদী উচ্চস্বরে, ডাকরে মন কালী বলে।
(ওরে) ফিরে তারে আর পাবিনা একবার জনম বয়ে গেলে॥

(ওরে) প্রেমে মেখে ভক্তিচন্দন পূজ শ্যামা মায়ের চরণ
মন আমার, তবে হৃদি মাঝে দেখা পাবি তার,
মেজে রাখ হৃদয় মন্দির, শোন বলি ওরে অধীর,
(হৃদয় মলিন হলে মায়ের দেখা পাবি না পাবি না)
(ওরে) বৈরাগ্যরূপ ঝাওরা ধরে', পূতজ্ঞান-গঙ্গাজলে॥

(ওরে) আর কতকাল এই ভবে মোহ ঘুমে ঘুমাইবে মন আমার, চেয়ে দেখ পারের উপায় নাহি আর; ডুবলী বেলা, ওরে ভোলা, ফুরাল তোর ভবের খেলা, (মা মা বলে ডাকা আর বুঝি হল না হল না) এখনো তারে ডাকিলে, কি করিতে পারে কালে॥

কিন্তু কৈ, পারা ত যায় না? "আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে"। এ প্রভাবী মন ছিল ইন্দ্রিয়ের রাজা এখন হয়েছে তার দাস। তুমিই ত এমন করেছ মা! আর

প্রসাদীসুর—একতালা।

"মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে কারণে আমায়, ছটা কলুর অনুগত॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে' তরে' গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চখের ঠুলি,
দেখি শ্রীপদ মনের মত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রাম প্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাক পদানত॥

তখন মায়ের ছেলে অন্তর্নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলেন যে তার স্নেহময়ী অনন্ত ঐশ্বর্য্য শালিনী মা তাহার আপন হৃদয়েই আছেন। তিনি ত দূরে নহেন। তাই তিনি গাইলেন—

প্রসাদীসুর—একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও কুল কুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তিভাবে কুড়িয়ে পাবে, শিব যুক্তি মতন চেলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলদি গায় মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন মানিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে!
রাম প্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবেরতন ফলে ফলে॥

ভক্তের মানস মন্দিরে তখন সেই মহাকালের মনোমোহিনীর অবর্ণনীয় চিন্ময়ী রূপ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইল। তিনি দেখিয়া গাইলেন—

খাম্বাজ একতালা।

"নীল বরনী, নবীনা রমনী,
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষিনী।
নীল-নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশা-নাথ-নিভাননী॥

নিরমল নিশাকর কপালিনী,
নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী,
নৃকর চারু কর সুশোভিনী,
লোল রসনা করাল বদনী॥

নিতম্বে নিচোল শার্দ্দুল ছাল,
নীল পদ্ম করে করি করবাল,
অপর দ্বিকরে নৃমুণ্ড খর্পর,
লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনী॥

নিপতিত পতি শব রূপ পায়,
নিগমে যাঁহার নিগুঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিত্যসিদ্ধি তারা নগেন্দ্র নন্দিনী॥"

৺শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর।

মায়ের সে অপরূপ রূপ দেখিয়া দেখিয়া ভক্ত সন্তান তন্ময় হইয়া গেলেন। তাহার হৃদয়াকাশে তখন মায়ের বিচিত্র লীলা সকল প্রকট হইতে লাগিল। কখনও দেখিলেন ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি মহাবলশালী মহিষাসুর খুর দ্বারা মহীতল বিদীর্ণ করিতে করিতে শৃঙ্গাঘাতে উচ্চ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং ভৈরব গর্জ্জনে দিঙ্‌মণ্ডল আপুরিত করিয়া ফেলিল। পৃথিবী তাহার সবেগ ভ্রমণে বিক্ষুন্না হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইল। সাগর সমূহ তাহার লাঙ্গুল তাড়নে বিক্ষুব্ধ হইয়া সর্ব্বস্থান প্লাবিত করিল। মেঘ সকল তাহার শৃঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। তাহার নিশ্বাস বায়ুতে শত শত পর্ব্বত উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। তখন মহা শক্তিরূপিনী জগন্মাতা দশভুজা-রূপে তাহাকে বধ করিলেন।

পুনরায় দেখিলেন অনন্ত বাসনা রূপী রক্তবীজ বিপুল বিক্রমে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। দেবী উহাকে আঘাত করিতেছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহার শরীরের একএক বিন্দু রক্ত হইতে শতশত অসুর উৎপন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী তখন অতি বিস্তৃত বদনা চামুণ্ডা রূপ ধারণ করিয়া সেগুলিকে মুখবিবরে ফেলিয়া নিঃশেষে সংহার করিলেন।

আবার দেখিলেন হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে অপূর্ব্ব শ্যামামূর্ত্তি পর্ব্বত প্রদেশ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। মূর্ত্তিমান কামরূপী শুম্ভ নিশুম্ভ নামা ভ্রাতৃদ্বয় দূত মুখে দেবীর অপরূপ লাবণ্যের কথা শুনিয়া তাহাকে আনিবার জন্য সেনাপতির পর সেনাপতি পাঠাইতেছেন, কিন্তু একে একে সকলেই দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে। শেষবার দূত আসিয়া যখন নিশুম্ভের নিধন বার্ত্তা বলিল তখন শুম্ভ নিজেই মহাবিক্রমে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সসৈন্যে পর্ব্বত প্রদেশে উপস্থিত হইতেই অনেক সেনা নায়ক তাহাকে বলিল—

বেহাগ—একতালা।

"কে এ বামা বারিদ বরনী, তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহার ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হেরহে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ চরণ-শরণ লয়॥

বামা—হাসিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে সকলে শাসিছে,
নিকটে আসিছে বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ হয়॥

বামা—টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবনময়॥

কেরে—ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,

হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আসবে মগনা রয় ॥"

ক্রমে মহাযুদ্ধে শুম্ভও নিপাত হইল। মহাশক্তি মহামায়ার কৃপায় ক্রোধরূপী মহিষাসুর, বাসনারূপী রক্তবীজ এবং কামের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ শুম্ভ নিশুম্ভ নিহত হইল। কিন্তু পরশ পাথর ছুঁইলে যেমন লোহাও সোনা হইয়া যায় নিহত দৈত্য কুলেরও সেইরূপই হইল। ভক্ত আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন—

ইমন্ কল্যাণ—ধামার।

"বামা কেরে এলো-চিকুরে ?
বিহরে আনন্দময়ী শব-হৃদি-পরে ॥
বসন নাহিক গায়, পদ্ম গন্ধে অলি ধায়,
চলে যেতে ঢলে প'ড়ে, আসব ভরে ॥
যে ঠেকেছে রাঙ্গা পায়, হত-দিতি-সুতচয়,
স্পর্শ মাত্র শিব হয়, সমর মাঝারে ;
কমলা কান্তের ভাষী, সর্ব্বনাশী ধরে অসি,
করিলি সব কাশীবাসী, জনমের তরে ॥"

তখন ভক্তসন্তান নিজহৃদয় কমলে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গাইয়া উঠিলেন—

সুরট মল্লার—তেওরা।

"বড় ধুম লেগেছে হৃদি কমলে,
মজা দেখিছে আমার মন পাগলে।
করতেছে পাগলের মেলা—
ক্ষেপাতে ক্ষেপীতে মিলে,
(আবার) আনন্দেতে সদানন্দে
আনন্দময়ী পড়্ছে ঢলে'।
দেখে অবাক লেগেছে তাক,
ইন্দ্রিয় আর রিপুদলে,
(আবার) পেয়ে সুযোগ এই গোলযোগ
জ্ঞানের কবাট গেছে খুলে।
প্রেমিক পাগল বলে সকল,
তা ব'লে মা মন কি টলে,
(ও যার) পিতা মাতা বদ্ধ পাগল,
ভাল হয় কি তাদের ছেলে।
শোন মা তারা ভুভার হরা,
এই বেলা মা রাখ্ছি বলে,
(যখন) ভাস্ব জলে, অন্তকালে,
তনয় বলে' ধরিস্ কোলে।"

আবার মায়ের মহিমা গাইতে গাইতে বলিলেন—

মিশ্র—ঠুংরি।

উমা কত মহিমা মা তোমার।
তব মায়া বুঝা ভার ॥
অনন্ত তোমারি নাম অনন্ত রূপিনী,
স্থানে স্থানে বর্ণে বর্ণে বর্ণ বিহারিনী,
সত্ব রজ তম তারা তৃগুণ ধারিনী,
ধর্ম্মদা, কামদা, মোক্ষফল প্রদায়িনী,
কারে দিয়ে ইন্দ্রত্ব কত বারাও মাহাত্ম,
কারে অধোগামী করে' কর ত্রিতাপে তাপিত,
তব মায়াশ্রিত আছে ত্রিজগত,
হলেম ভ্রান্তি যুক্ত মা,—
বর্ণিতে তোমার গুণ সাধ্য আছে কার ॥
কাশীতীর্থে অন্নপূর্ণা তুমি গো অন্নদা,
গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, কামাক্ষায় কামদা,
দক্ষিণে কালিকা তুমি, উৎকলে বিমলা,
অমঙ্গল নাশিনী দুর্গে, সর্ব্ব মঙ্গলা,
ওমা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জন্ম, কর্ম্ম, সুখ, দুখ, পাপ,
পুণ্য, মান্য, গণ্য, ধন্য, মন্যু তোমারি কৃপায়—
বিনে পদাশ্রয়ে ভবভয়ে পরিত্রাণ নাই,
কুমতি, সুমতি, সকল তুমি পার্ব্বতী,—
ওমা, তবে কেন পাপ পুণ্যের—
এত হয় বিচার ॥
জীবের জীবাত্মা, পরমাত্মা রূপিনী,
জন্ম মৃত্যু কাল দ্বয়ে নির্ব্বান দায়িনী,
ভোগবতী, অলকা নন্দা, তুমি মন্দাকিনী,

ত্রিলোক তারিতে হলে গঙ্গা তরঙ্গিনী,
তব পাদ পদ্ম দেবের দেবারাধ্য,
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র না পায় ক'রে আরাধন,
জ্ঞানাজ্ঞান বর্ত্ত দেব দুরাসদ্য,
হ'ল উন্মত্ত শিব শ্মশানবাসী অনিবার।"

সেই অনন্তরূপ ধারিণী অরূপার স্বরূপ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া ভক্ত বলিলেন,—

প্রসাদীসুর—একতালা।

"কে জানে কালী কেমন।
ষড় দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।"

মা তো ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অনন্ত সন্তান কুল কত ভাবেই তার আরাধনা করিতেছে কত নামেই না তাকে ডাকিতেছে। যে যেভাবে তাঁকে ডাকিতেছে, মা তাকে সেই ভাবেই কোলে তুলিয়া নিতেছেন। ভক্ত গাইলেন,

মিশ্র—ঝাপতাল।

"জানি গো জানি গো তারা,
তুমি জান ভোজের বাজি,—
যে নামে যে ডাকে তোমায়
তাইতে তুমি হও মা রাজি।

মগে বলে ফরাতারা,
গড্ বলে ফেরিঙ্গী যারা,
আল্লা বলে ডাকে তোমায়
সৈয়দ্, পাঠান, মোগল, কাজি।

গাণপত্য বলে গণেশ,
যক্ষ বলে তুমি ধনেশ।
সৌরী বলে সূর্য্য তোমায়,
বৈরাগী বলে রাধিকাজি।

শাক্ত বলে তুমি শক্তি,
শিব তুমি শৈবের উক্তি,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা,
বদর বলে নায়ের মাঝি।

শ্রীরাম দুলালে বলে
বাজি নয় এ জেন ফলে,
এক ব্রহ্মা দিধা ভেবে
মন আমার হয়েছে পাজি।"

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" কিন্তু মায়ের ছেলের কাছে "মা ডাকে'র মত অমন মধুর ডাক আর নাই, তাই তিনি বলিলেন—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

"জানি না কি বলে' ডাকি তোরে,
(ও গো শ্যামা মা)
তুই কখনো শ্যামের বামে,
(আবার) কভু হরহৃদি পরে॥
(তুই) কভু বিশ্ব বিমোহিনী,
কভু শ্যামা উলঙ্গিনী,
(আবার) কভু শ্যাম সোহাগিনী,
কভু রাধার চরণ ধরে॥
(তোরে) যে যা বলে (আমি তা) বলিব না,
(তোর ঐ) মা নামের নাই তুলনা,—
তাই তোরে ডাকি মা মা
(তোর ঐ) অভয় চরণ পাবার তরে॥"
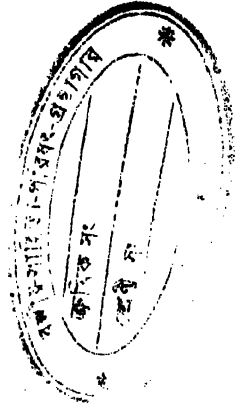
তাঁর মাইত যুগে যুগে কত লীলা করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন। সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলা ত তাঁরই। তিনিইত গোপাল রূপে যশোদার নয়ন রঞ্জন করিয়াছেন। তাই তিনি সেই ভাবে বিভোর হইয়া গাইলেন,—

মিশ্র—একতালা।

"যশোদা নাচাত গোমা বলে' নীলমনি॥
সে রূপ লুকালে কোথা করাল বদনী।
(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে)
(মুক্তমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক্)
(তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচ গো শ্যামা)
(যে রূপ ব্রজমাঝে নেচে ছিলি)
(একবার বাজা গো মা) (তোর ঐ মোহন বেণু)
(যে বেণুরবে ধেনু ফিরাতিস্)
(যে বেণুরবে যমুনা উজান বয়)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হত,
বলে ধর ধর ধর, ধররে গোপাল ক্ষীর সর নবনী,
এলায়ে চাচর কেশ, রাণী বেঁধে দিত বেণী।
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে,
আবার তাথৈয়া তাথৈয়া, তাতা থৈয়া থৈয়া বাজাত নূপুর ধ্বনি,
শুনতে পেয়ে আস্‌ত ধেয়ে যত ব্রজের রমণী।

ভক্ত আবার গাইলেন—

প্রসাদীসুর—একতালা।

"তাই কালোরূপ ভালবাসি।
জগমোহিনী মা এলোকেশী।
কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালোরূপ তার হৃদয় বাসী।
কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী
ঐ যে তাহারি মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে পূর্ণিমেশশী॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালোরূপে মেশা মেশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন করো না দ্বেষা দ্বেষী॥"

এইরূপ গাহিতে গাহিতে মায়ের মূর্ত্তি তখন তিনি দেখিতে পাইলেন। সে মূর্ত্তি হৃদয়াকাশ আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে। ভক্ত ভাবিলেন। "আমি কে? মাইত সব করিতেছেন। তাঁহার ইঙ্গিতেই ত এ জগত চলিতেছে। কিসের অহঙ্কার, কিসের দম্ভ, কেন কর্ত্তৃত্বাভিমান, কেন ভেদা ভেদ? তিনি গাইলেন—

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

"মার ভাবনা মায়ে ভাবে, তুমি আমি কি করতে পারি
মায়ে কাঁদায়—কাঁদি, হাসায়—হাসি, কলের কাজ যেন কলে সারি॥
(মন) ভুলো নারে অহঙ্কারে, "আমি করি" ভেবোনারে,
করান তিনি, ব্রহ্মময়ী, (তাই) কখন জিতি, কখন হারি॥
হারা জেতা কান্না হাসি, সর্ব্বঘটে সেই সর্ব্বনাশী।
প্রাণ কাড়ে, কখন্ বাজিয়ে বাঁশী, কালী কালা।
চিন্‌তে নারি॥"

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

আবার মা-কে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

লুম্ঝিঁঝিট্—একতালা।

"কে গো আমার মাকি এলি।
আয় মা মনের কথা বলি॥
বহু দুঃখ দিয়ে শ্যামা, যদি দয়া প্রকাশিলি,
তবে মা হয়ে মা, মায়ের মত ছেলের কথা শোনমা বলি॥
দাঁড়া গো মা হৃদ্‌কমলে, পূজি মানস কুসুমদলে,
ভক্তি চন্দন মাখায়ে তার পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥
করিব সু মহৎ হোম, চিৎকুণ্ডে অনল জ্বালি,
পূর্ণাহুতি দিব তাহে জয়কালী, জয়কালী বলি।
প্রাণান্ত এ দক্ষিণান্ত, কর্ম্মফল মা তুই সকলি,
মায়ের ছেলে প্রেমিক এখন, যাঁর কাছে যম কৃতাঞ্জলি॥"

ভক্তের মনে মায়ের পূজার সাধ জাগিয়াছে। তিনি মাকে তাঁর হৃদ্‌কমলে দাঁড় করাইয়া তাহার শ্রীপাদ পদ্মে "মানস কুসুম দলে ভক্তি চন্দন মাখাইয়া অঞ্জলি দিবেন। "জয়-কালী" মন্ত্রে চিৎকুণ্ডে অনল জ্বালিয়া হোম করিবেন। কিন্তু বলির কি ব্যবস্থা? বলি ছাড়া তো প্রলয়ঙ্করী করালিনীর পূজা হয় না? তিনি কি প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিয়া সাড়ম্বরে অজা শিশু আর মহিষ বলি দিবেন? তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া গাইলেন।

ফকিরচাঁদের সুর—কাওয়ালি।

"বলি দাও বলে সবে, বলি কিতা বোঝেনা।
ওরে, বলি কারে বলে ভেবে দেখে না॥
বৃক্ষলতা বনস্পতি যত দেখ জগতে,
ওরে বলি দানে জগন্মাতার পূজা করে তাবতে,
ফল শস্য করি দান, ওষধি হারায় প্রাণ;
বিনা আত্ম বলিদান, পূজা সিদ্ধ হয় না হয় না॥
রক্ত দানে শক্তি পূজা করে যে সব বলবান,
তারা শাক্ত নাম ধরে, (লোকে) করে তাদের কীর্ত্তিগান;
রাখিতে ধর্ম্মের মান করে যারা প্রাণ দান,
তারা করে বলি দান, ছাড়ি সংসার বাসনা, কামনা॥
কাঙ্গাল বলে বনপশু বলি দেয় রে যে জনা,
(তারা) আপন ঘরের মাঝে কত পশু আছে জানে না,
মন তুমি দাও বলি রাগ দ্বেষ মহিষ বলি,
লোভ নর বলি, কাম অজা বলি কল্পনা, জল্পনা॥"

তখন মায়ের পূজা করিয়া মায়ের পদে আত্ম নিবেদন করিতে লাগিলেন,—

আলাইয়া—কাওয়ালি।

"আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়।
মা আমার অনুপায়। ভজন পূজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
জননী গো বিষয়-বিষ ভোজনেতে প্রাণ যায়॥
জঠরে যাতনা পেয়ে বল্লাম—
এবার ভজিতে তোমায় আর ভবে চল্লাম,
সুপুত্র হয়ে রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,
(কিন্তু) ধরায় পতিত হয়ে, রয়েছি পতিত হয়ে,
পতিত পাবনী ভুলে মা তোমায়॥
হলো না সাধন, আর হয় না, হে দুর্গে মা আমার,
দুঃখ তো আর সয় না—অপার দাশরথীর শঙ্করী,
হয় না মানস বশ কি করি, (মা) যদি মোরে মনে করি,
স্বগুণে বন্ধন করি, মুক্ত কর মুক্তকেশী, এ ভব-বন্ধন-দায়॥"

আবার গাইলেন,—

সিন্ধু—কাওয়ালী।

তনয়ে তার মা তারিণী।
ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশি দিন হতেছি সারা,
বার বার অনিবার, কত দুঃখ পাব আর,
অধম সন্তান-দুখ নাশ দুখ নাশিনী॥
সংসার রাঙ্গা ফলে মজা'ও না মা এবার,
খাইয়ে দেখেছি তার নাই যে কোন সুতার,
সে যে পূরিত গরলে, খেলে মা কুফল ফলে,
জ্ঞান হারা হই তোমা ধনে ভুলে রই,
মা হয়ে সন্তান-মুখে দিও না তা জননী॥
আমার আবার বলে মত্ত হই অনিবার,
ইন্দ্রিয়াদি, দারা সুত সকলই বলি আমার,
কিন্তু আমি কোন খানে, খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
কোথা গেলে আমি মিলে, দে মা আমায় বলে,
দীন জনে ভ্রমে আর রেখ না নিস্তারিণী॥'

মায়ের হাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া বলিতেছেন,—

মিশ্র—ঝাঁপতাল।

"সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ করকরী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরনী,
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি ॥"
মা, তোমার ঐ চরণ যুগলই মাত্র আমার ভরসা,

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারা পরমেশ্বরী,
কখনও পুরুষ হও মা, কখনও ষোড়শী নারী।
অজ্ঞানে জ্ঞান-দায়িনী, ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী,
এ ভব সংসারে মাগো, ভরসা তব চরণ তরী॥"

মায়ের কৃপালব্ধ সন্তান তখন আপনার মনকে বলিতেছেন—

কালাংড়া—ঝাঁপতাল।

যতনে হৃদয়ে রেখো, আদরিনী শ্যামা মাকে।
তুই দ্যাখ আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে॥
(মাঝে মাঝে সে যেন মা বলে ডাকে)
কুরুচি, কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনা কো।
জ্ঞান, নয়নকে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে॥
(খুব যেন সাবধানে থাকে)"

আর বাহিরে ঘুরিয়া কাজ কি? তাই গাইলেন,—

পিলু—ঝাঁপতাল।

"আপনাকে আপনি থেকো মন, যেওনাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন ঐ পরশ মণি, যা চাবে তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামনীর নাচ দুয়ারে॥
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ মন উচাটন হ'য়ো নারে,
(তুমি) আনন্দে ত্রিবেণী স্নানে শীতল হওনা মূলাধারে।
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
(তুমি) বাজি করে চিনলে নাকো, যে এই ঘটের ভিতর বিরাজ করে॥"

মায়ের শ্রীচরণে আশ্রয় পাইয়া সন্তানের মৃত্যু ভয় দূর হইল। তিনি মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

রাগিনী পিলুবাহার—তাল খং।

"তুই যারে কি করবি শমন, শ্যামা মায় কয়েদ করেছি।
মন বেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি॥
হৃদি-পদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুল কুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সপেছি॥
এমনি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফায়দা।
হামেশকরু ভক্তি-প্যাদা, দুনয়ন দ্বারবান রেখেছি॥
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্বজ্বর হর লৌহ গুরুতত্ত্ব পান করেছি॥
শ্রীরাম প্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে' যাত্রা করে বসে আছি॥"

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

শ্রীকরনন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

পঞ্চদশ শতকের শেষে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্* গৌড়ের রাজ-তখ্তে বিরাজ করিতেছিলেন। হুসেন শাহ্ বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। যাঁহার অমাত্য পুরন্দর খাঁ, দবীর খাস (প্রাইভেট সেক্রেটারী) রূপ এবং সভাসদ্ সনাতন, তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে প্রীতির চক্ষে না দেখিবেন কেন? তাঁহার সময়কে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। তাঁহার রাজত্ব কালে পশ্চিম বঙ্গে বিপ্রদাস ও পূর্ব্ববঙ্গে বিজয়গুপ্ত মনসা মঙ্গল লিখেন। তাঁহার সময়েই যশোরাজ খান তাঁহার পদ রচনা করেন। তাঁহার সেনাপতি পরাগল খান ও ছুটিখানের আশ্রয়ে মহাভারত ও জৈমিনি ভারত বাঙ্গালায় তর্জ্জমা হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে দ্বিজ জনার্দ্দন মঙ্গলচণ্ডী উপাখ্যান লিখেন। তাঁহারই সময়ে চৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হন। কবিগণ হুসেন শাহের প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ ছিলেন।

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতে রাজ্যকাল ১৪৯৪ হইতে ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দ।

ঋতু শশী বেদ শশী পারিমিত শক।
নৃপতি হুসেন শাহ নৃপতি তিলক॥
× × × × বিজয়গুপ্ত। *

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সা গৌড়ে সুলক্ষণ॥
বিপ্রদাস। †

শ্রীযুং হুসন জগত ভূষণ শোহ এই রসজ্ঞান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভণে যশোরাজ খান॥
পিতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী। ‡

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
পরাগলী ভারত। ¶

নসরত তাত শাহ অতি মহারাজা।
রামবহু নিষ্ঠ § পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন শাহ যেহ ক্ষিতিপতি।
সাম দাম দণ্ডভেদে পালএ বসুমতী॥
ছুটিখানের মহাভারত ৩ পৃঃ।

শ্রদ্ধাষ্পদ দীনেশ বাবু বলেন হুসেন শাহ্ পূর্ব্ববঙ্গ জয়ের জন্য পুত্র নসরত শাহ্ ও লস্কর পরাগল খাঁকে প্রেরণ করেন। পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ। ইহা পরাগলী ভারতে উল্লেখ আছে। ৮৭৮ হিজরায় (১৪৭৩—৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) ২৫শে রমজান তারিখে এই রাস্তি খাঁ চট্টগ্রামে এক মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। * সম্ভবতঃ এই রাস্তি খাঁ পরাগল খাঁর পিতা। তাহা হইলে বাদশাহ হুসন শাহ্ পরাগল খাঁকে গৌড় হইতে প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার উপর ত্রিপুরা বিজয়ের ভার দিয়াছিলেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ। পরাগল খাঁর আদেশে একজন কবি মহাভারতের অভিষেক পর্ব্ব † পর্য্যন্ত অনুবাদ করেন। তাঁহার পুত্র ছুটিখানের আদেশে জৈমিনি ভারতের অনুবাদ হয়। দীনেশ বাবুর মতে পরাগলী মহাভারতের অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর, এবং ছুটিখানী ভারতের অনুবাদক শ্রীকর নন্দী বা শ্রীকরণ নন্দী, এবং উভয়েই পৃথক্। কিন্তু ছুটিখানী মহাভারত বিশেষরূপে পড়িয়া আমাদের মনে হইতেছে উভয়েই এক ব্যক্তি। নিম্নে সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
পিবন্ত ভকত জনে দুই কর্ণ ভরি॥
লস্কর পরগেল খানের তনয়।
কর্ণ সমদাতা ছুটিখান মহাশয়॥
তাহার আদেশ মাল্য (মাল্য) মাথে আরোপিয়া।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর [কহে] পাঞ্চালি রচিয়া॥
৬৩ পৃঃ।

অন্যত্র

অশ্বমেধ যজ্ঞ শত তন্ত্রের সার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার॥

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সংস্করণ ১৬৯ পৃঃ।

† J. A. S. B. New Series vol V. p 253।

‡ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সংস্করণ ১৫২ পৃঃ।

¶ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সং, ১৪৪ পৃঃ।

§ 'রামবহু নিষ্ঠ' স্থানে 'রামবৎ নিত্য' বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাই শুদ্ধ।

* শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ২২০ পৃঃ।

† পরম শ্রদ্ধাষ্পদ ডকটর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "৪র্থ সংস্করণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "কবীন্দ্র পরমেশ্বর স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন।" কিন্তু ৪২৬ পৃঃ পুনরায় বলিতেছেন "কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত মহাভারত— আদি হইতে অশ্বমেধ পর্ব্ব পর্য্যন্ত।"

নসরত পরাগল খানের তনয়।
সংগ্রামে বিজয় খান মহাশয়॥
অষ্টাদশ ভারতের পুরাণ বাখান।
রাত্রিদিন ভারতের কথা অবধান॥
অশ্বমেধ সমর্পিয়া হরষিত মন।
স্বর্গেতে হইল তবে পুষ্প বরিষণ॥

১৪০ পৃঃ।

অথচ এই ছুটিখানী মহাভারতের অন্য সাত স্থানে (৪,২৪, ৩০, ৪৬, ৫২, ৮০, ১২৯ পৃষ্ঠায়) শ্রীকর নন্দীর নাম দেখা যায়। ১৩৫ পৃষ্ঠায় শ্রীকরণ নন্দী নাম দেখিতে পাই।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভা খণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান্ মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহার আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দী কহিলেক পয়ার ধরিয়া॥

অন্যত্র

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমর বিজয়ী ছুটিখান মহাশয়॥
তাহার আদেশ মাল্য মাথে আরোপিয়া।
শ্রীকরণ নন্দীএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া॥

১৩৫ পৃঃ

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে ছুটি খানী ভারত কাহার রচিত? কবীন্দ্র পরমেশ্বরের না শ্রীকর নন্দীর বা শ্রীকরণ নন্দীর? শ্রীকর নন্দীরই নাম যে শ্রীকরণ নন্দী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বোধ হয় "শ্রীকরণ নন্দী" লিপিকর প্রমাদে হইয়াছে যাহা হউক, যদি আমরা শ্রীকর নন্দীকে ইহার রচয়িতা মনে করি, তবে দুইস্থানে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের নাম কোথা হইতে আসিল? যদি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ইহার রচয়িতা মনে করি, তবে শ্রীকর নন্দীরই বা নাম কোথা হইতে আসে? পুঁথি লেখকের পক্ষে এইরূপ গোলমাল করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে শ্রীকর নন্দীরই উপাধি বা নামান্তর। 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর'। কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধির মত শুনায়ও বটে। ইহা নাম হইতে পারে না। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে কবির নাম শ্রীকর, পদবী নন্দী আর বাদশাহী খেতাব কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

এখন একটি খটকা লাগিতেছে যে পরাগলী মহাভারতে "কবীন্দ্র পরমেশ্বর" এই ভণিতা দেখিতে পাই। তাহাতে 'শ্রীকর নন্দী' এই নাম পাওয়া যায় না। ইহার সমাধান এইরূপে হইতে পারে যে—প্রথমে ছুটিখান শ্রীকর নন্দীকে জৈমিনি ভারত অনুবাদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধি দেন। তার পর পরাগল খাঁ তাঁহাকে মহাভারতের অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। সেই সময় কবির উপাধি এত প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে তাঁহার নিজের নাম ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। পরাগলী মহাভারতে দেখিতে পাই—

শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥ *

এই নসরত খান খুব সম্ভবতঃ হুসেন শাহের পুত্র। বোধ হয় তিনি প্রথমে অন্য কোন কবিদ্বারা মহাভারতের অনুবাদ করেন। এই কবি সম্ভবতঃ সঞ্জয় হইবেন। † তৎপরে পরাগল খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। এই জন্যই সঞ্জয় রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয়। ‡

---

* প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়েরও এই মত। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা দেখুন।

† বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত, ১১৩ পৃঃ

‡ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬ পৃঃ

এই মহাভারত রচনার সময়েও কবি নিজের সাবেক প্রভুকে ভুলিতে পারেন নাই—

প্রিয় পাত্র তাহান বিখ্যাত ছুটিথান।
পঙ্কজ গৌড়েতে যার নামের বাখান॥ ¶

অন্যত্র তনয় যে ছুটিথান পরম উজ্জ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল॥ §

পরাগলী মহাভারতের পর যদি কবি ছুটীখানি ভারত রচনা করিতেন, তবে তাহাতে নিজের নাম ব্যবহার করিতেন না। অধিকন্তু অসম্পূর্ণ মহাভারত রাখিয়া কবি জৈমিনি ভারতের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিতেন না। শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু বলেন তথা কথিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত বস্তুতঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরই রচিত মহাভারত। লিপিকর প্রমাদে ভনিতায় "বিজয় পাণ্ডব কথা" স্থানে "বিজয় পণ্ডিত কথা" হইয়া গিয়াছিল। * আমরা এস্থলে তাঁহারই সহিত একমত।

¶ ঐ ১১৫ পৃঃ
§ ঐ ১৪৮ পৃঃ
* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, ৪২৬, ৪২৭ পৃঃ।

বাঙ্গালা বানান সমস্যা

অথবা

বাঙ্গালা শিক্ষা সমস্যা?

গত ১৩৩১ সালের প্রথম (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়) সংখ্যা "প্রতিভা" পত্রিকায় অধ্যাপক মৌলবী শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম, এ, মহাশয়ের "বাঙ্গালা বানান সমস্যা" শীর্ষক প্রস্তাব এবং উক্ত বৎসরের তৃতীয় (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ) সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিভূষণ ঘোষ, এম, এ, মহাশয়ের "বাংলা বানান সমস্যা (আলোচনা)" শীর্ষক প্রস্তাব এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের "উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব তিনটি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

মৌলবী শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রথম প্রস্তাব "বাঙ্গালা বানান সমস্যা" যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনই উহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। মৌলবী সাহেব যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী, তখনই আমরা তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা এবং গবেষণাজ্ঞানের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাহার পর তিনি ভাষা-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া অধ্যাপনা করিতে করিতে গবেষণা ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শাস্ত্রি মহাশয়ের আনীত এবং প্রচারিত "বৌদ্ধগান ও দোহা" পুস্তকের শব্দার্থ লইয়া তিনি এক প্রস্তাব "প্রতিভা"তে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাবের লেখা দেখিয়াই আমরা তাঁহার গবেষণার উপর প্রথম আকৃষ্ট হই। বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন কর্ম্মীর শুভাগমন লক্ষ্য করিলে হৃদয়ে বড়ই আনন্দের উদয় হয়; আমাদের কাল ত একপ্রকার শেষ হইয়া আসিয়াছে। গত বৎসরের প্রথম সংখ্যার "প্রতিভায়" তাই শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্

সাহেবের উক্ত প্রস্তাবটি পড়িয়া খুব আনন্দ পাইয়াছিলাম। আমাদের মনে আশা হইয়াছিল যে আমাদের এই পরাধীন দেশে এবং পরানুকারিগণের মধ্যেও ক্রমে বীমস্, হর্ণলি এবং গ্রীয়ারসনের অভ্যুদয় হইবে।

প্রায় এক বৎসর পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিভূষণ ঘোষ, এম, এ, মহাশয় মৌলবী সাহেবের "সমস্যার" "আলোচনা" করিয়াছেন। এই "আলোচনা" পড়িয়া মনে হয় যে শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয়ও মাতৃভাষার উন্নতিকামী এক মহাজন। ঢাকার "সাহিত্য পরিষৎ" পত্রিকায় এইরূপ প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়া যে উঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের কিন্তু মনে হয়, "বাঙ্গালা ভাষার" শিক্ষার্থিগণের পক্ষে উহার "বানান-সমস্যা" বড় সমস্যা নয়, উচ্চারণ সমস্যা তদপেক্ষা বড়, এবং উহার আদৌ শিক্ষার সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

মৌলবী সাহেব "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি মহাশয়ের কল্যাণে (? আশীর্ব্বাদে) জানিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার বয়স জোর হাজার বছর"। তাঁহার এই কথায় 'সায়' দিতে পারিলাম না। বাঙ্গালা ভাষার বয়স নির্ণয় করিবার শক্তি আমাদের নাই। হাণ্টার সাহেবকে কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে কবি কৃত্তিবাসই বাঙ্গালীর আদি কবি; আর সেই কথাই আমরা ছেলেবেলা মুখস্থ করিয়াছিলাম। ক্রমশঃ রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপুরাণ, ময়নামতীর গান, এবং অবশেষে "বৌদ্ধগান ও দোহা" বাহির হইয়াছে। কোন বই বাহির হউক আর নাই হউক, বই এর প্রমাণ হইতে ভাষার বয়স ঠিক করা যায় না। আমাদের মতে, বাঙ্গালী জাতি যত দিনের, বাঙ্গালা ভাষাও তত দিনের। যাঁহারা বলেন, যে, পাল রাজাদের সময়ে, কিংবা আদিশূর রাজার সময়ে, বাঙ্গালী জাতিটা গজাইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি। আমরা মানি যে, "অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্ম-উড্র-কামরূপাদি" সমন্বিত এই গৌড়মণ্ডল অতিশয় প্রাচীন,—আর তাহার ভাষা "গৌড়ী" ও সেইরূপই পুরাতন। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃত "গৌড়ী" রচনাপদ্ধতি এবং "মাগধী", "গৌড়ী অথবা "প্রাচ্যা" ভাষার (প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ) প্রতিষ্ঠা এদেশে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। পুরাতন কাহিনী খুঁজিতে গিয়াই প্রথমে দেখিতে পাই যে আমাদের জাতি (এবং তাহার সঙ্গে তাহার ভাষা) রাজনৈতিক প্রভাব হারাইতে হারাইতে ক্রমেই সংকুচিত হইয়াছে। বেদের "গাথার" (ছন্দঃ ?) সহিত "আবেস্থার গাথা"র তুলনা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে সেই ভাষার প্রসার এবং প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল। "সংস্কৃত" ভাষা সাধারণ লোকের কথ্যভাষা কখনও থাকুক বা না থাকুক, সে ভাষা শুনিলে যে দেশের সকলেই এককালে বেশ বুঝিতে পারিতেন, তাহা আমরা স্বীকার করি। প্রাচীন নাটকের পাত্র-পাত্রীদিগের উক্তি এবং প্রত্যুক্তির প্রতি একটু মনোযোগ করিলেই এই তথ্য সুপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। মৌর্য্য অশোকের (দেবানাং পিয় পিয়দশীর) নামে প্রচারিত যে সকল শিলালিপির পাঠ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে "গান্ধার হইতে জলধি সীমা" পর্য্যন্ত "প্রাচ্যা" অথবা "মাগধী" প্রাকৃতের একরূপ একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল। সেই রাজত্বের চিহ্ন "পোস্তু" এবং "কাফিরি" ভাষার কলেবরে এখনও নাকি পাওয়া যায় (১)। পরে মহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনী মাগধীর এলাকা সংকুচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

সে অনেক পুরাতন কথা। তাহার পরও পশ্চিমে মগধের সীমা হইতে পূর্ব্বে কামরূপের সীমা এবং উত্তরে গৌরীগুরু গিরিরাজ হইতে দক্ষিণে বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত এই বিশাল প্রদেশেও একই ভাষার অখণ্ড রাজত্ব ছিল। রাজনৈতিক দুরবস্থা বশতঃই আমরা জাতিতেও ছিন্ন ভিন্ন এবং

(১) A. F. Rudolf Hoernle's "A comparative Grammar of the Gaudian Languages" Introduction.

অবাধেও বিভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি। ভাষার কথা ছাড়িয়া একবার লিপির কথা ভাবুন। একমাত্র গান্ধারের সীমায় "খরোষ্ঠী" অধিকারের কথা ছাড়িয়া দিলে মৌর্য ভারতখণ্ডে "ব্রাহ্মী" লিপির একাধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। "গুপ্তনাথ"গণের অভ্যুদয়ের সময়ে একই প্রকার লিপি ("গুপ্তলিপি" বলিয়া যাহার নামকরণ হইয়াছে) আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। তাহার পরে "পাল" এবং "সেন" রাজগণের সময়েও একই প্রকার লিপি কাশী হইতে কামরূপ এবং কলিঙ্গ হইতে (কাশ্মীর না হউক) নেপাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে, অর্থাৎ পাল-রাজগণের সময়ে, আমাদের গৌড়ীয় ভাষার যে প্রকার মূর্ত্তি ছিল, তাহার আভাস শাস্ত্রি মহাশয়ের "বৌদ্ধগান ও দোহা"তে পাওয়া যায়। যদি মগধে "কৈথী" (অথবা "কায়থী") এবং ওড়িশায় "ওড়িয়া" লিপির বাধা না থাকিত, তাহা হইলে এখনও "বেহারী", "মৈথিলী" এবং "ওড়িয়া" ভাষাকে এত "পর" বলিয়া বোধ হইত না। আজিও "মৈথিলা লিপির আকার আমাদের লিপির সহিত প্রায় একরূপই রহিয়াছে। "প্রায় একরূপ" এইজন্য বলিতেছি যে আজকালকার বাঙ্গালা লিপির চেহারা উইলকিন্স সাহেবের এবং শ্রীরামপুরের কর্ম্মকারদিগের "কল্যাণে" অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের হাতের লেখা পুথি পড়িতে পারেন না;—সে সকল পুথি "তিরুটে" (ত্রিহুতীয়া—তীরভুক্তিক) অক্ষরে লেখা। অতি অল্পদিন আগেও ত্রিহুতের ভাষা উত্তরবঙ্গের (শুধু উত্তরবঙ্গ কেন?—গৌড়ীয় বা বাঙ্গালা) ভাষার সহিত অভিন্ন ছিল এবং সেই জন্যই বিদ্যাপতি ঠাকুর (মৈথিল ব্রাহ্মণ) বাঙ্গালা ভাষার কবি বলিয়া আজও পূজিত হইতেছেন। মহানন্দা নদী পার হইলেই ত্রিহুতের রাজত্ব; আজিও পূর্ণিয়ার "সিরিপুরিয়া" বাঙ্গালা "কৈথী" লিপিতে লেখা হইতেছে। বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, ব্রহ্মদেশের লিপিতে এবং দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, মেদিনীপুর বালেশ্বর সিংহভূম, মৌরভঞ্জ অঞ্চলে, ওড়িয়া লিপিতে বাঙ্গালা ভ লিখিত ও পঠিত হইতেছে। ওড়িয়া ভাষার গোল মড়ার মাথার মত লিপির বিভীষিকা যদি না থাকিত, ত হইলে, ওড়িয়া কবিরাজ (অথবা রাজকবি) উপেন্দ্রভঞ্জ মৈথিল বিদ্যাপতির মত বাঙ্গালা ভাষার কবি বলিয়া গ্র করিবার লোকের অভাব হইত না।

রাজনৈতিক-বিচ্ছেদের জন্য ক্রমশঃ আমরা সামাজিক হিসাবেও যেমন মগধ, মিথিলা, ওড়িশা এবং কামরূপ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি, তদ্রূপ কারণেই এই কয়েকশত বৎসরের মধ্যেই আমাদের বাঙ্গালা ভাষা মগধী মৈথিলী, ওড়িয়া এবং অসমীয়া হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ কেন হইল? আমাদের রাজপুরুষেরা অবশ্য কয়েক ক্ষেত্রে এই ভেদের সহায় হইয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারাই মৈথিলী, মগাহী, ওড়িয়া অসমীয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাষার স্বত্ব দখলী ডিক্রী পাইয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা ব্যতীত কোদিত ছাপার হরফে আবার এই বিভিন্নতা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাগ্যে; বাঙ্গালা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন হরফ খোদেন নাই, তাই আমরা আজও ছোট-নাগপুরের কোল হইতে ব্রহ্মদেশের সীমা পর্য্যন্ত একই (বাঙ্গালা) ভাষার সাক্ষাৎ পাইতেছি। নচেৎ, যদি ব্রহ্মদেশের অক্ষরে চট্টগ্রামের উচ্চারণ-বাঁধা পড়িয়া যাইত, তাহা হইলেই উহাকে এক "স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ভাষার আকারে" আমরা বিদ্যালয়ে (বিশ্ব হইতে গ্রাম্য পর্য্যন্ত বিবিধ স্তরের) এবং আদালতেও দেখিতে পাইতাম। বিধাতারা যে এইরূপ ব্যবস্থা করেন নাই,—সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ভেদের বড় পক্ষপাতী। হিন্দিভাষা-টিকে তাঁহারা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দুইটি একেবারে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ভাষার আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আগরা-মথুরার ভাষা আর কাশী-অযোধ্যার ভাষা একেবারেই আলাহিদা। তবে সুখের বিষয় এই যে, দেশের লোকে এই ভেদ মানিয়া লয়েন নাই এবং তাঁহারা চান্দবর্দ্দাই, বিহারীদাস,

সুরদাসের সহিত কবীর-তুলসীদাসকে একই ভাষার কবি এবং পূর্ব্বে পূর্ণিয়া হইতে পশ্চিমে মীরাট-পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র একই ভাষার অধিকার স্বীকার ও তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেছেন।

"গৌড়পাদ ও দোহার" সময়ে আমাদের এই প্রাচ্যদেশে যেমন বাঙ্গালা, মৈথিলী, মগাহী, অসমীয়া এবং ওড়িয়া একাত্মে এবং একঘরে ছিলেন, এমন কি বিদ্যাপতি ঠাকুরের সময়েও রাজধানী মদঃকরপুরে "বাঙ্গালী বোলী"রই (লক্ষণ সংবৎ ইতি নাম ধের বাঙ্গালী সংবৎ সহিত) আধিপত্য ছিল, তদ্রূপ "পৃথিরাজরাসোর" কবি (লাহোর নিবাসী) চারণ-রাজ চান্দবর্দ্দাই এর সময়েও পঞ্জাবী, সিন্ধী এবং গুজরাতী এই তিন ভগিনী হিন্দী হইতে পৃথগন্ন হইয়া নিজের নিজের গৃহস্থালী পাতান নাই। মুসলমান সাম্রাজ্যের কল্যাণেই সমাজের একত্বার সহিত হিন্দু (আর্য্য) ভাষার ও একত্বার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল এবং য়ুরোপীয় আমলে সেই ভেদ নিজ নিজ প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ক্রমশঃ এই সকল ভগিনীরা পরস্পর লড়াই ঝগড়া করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন।

এক আর্য্যাবর্ত্তের ভিতর এত ভাষা ভেদ কেন? ভেদের মূলে যে উচ্চারণ ভেদ, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশে মানুষের মুখে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হইয়া "যোজনান্তরে ভাষার" সৃষ্টি করে। অতিশয় পুরাতন কাল হইতেই মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের এই দোষে (বা গুণে) বিভিন্ন রূপে অপ (ভ্রংশ) ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল এবং সেই সকল অপ ভাষার দোষ নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই ব্যাকরণ শাস্ত্রের আবশ্যকতা হইয়াছিল। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যের প্রথমেই "ব্যাকরণ শাস্ত্র কেন পড়িতে হইবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, "অপ শব্দকেই (অশুদ্ধ শব্দকে) 'ম্লেচ্ছ' বলে; ব্রাহ্মণের (জ্ঞানীর) পক্ষে ম্লেচ্ছ ভাষা অর্থাৎ অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতে নাই। যাহাতে আমরা ম্লেচ্ছ না হই, (অর্থাৎ অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার না করি), সেই জন্যই ব্যাকরণ পাঠ করিতে হয়" (২) ব্যাকরণের দ্বারা ভাষার শব্দ, তাহার গঠন, আকৃতি বা অবয়বের (বানানের) শুদ্ধতা রক্ষিত হইয়া থাকে। শব্দের শুদ্ধ (বানান) মূর্ত্তি রক্ষা করিয়া প্রাচীনেরা ভাষার একটা ঐক্য রাখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠিন নিয়ম নিগড়ে বাঁধা পড়িয়াই 'সংস্কৃত ভাষা' আসমুদ্র-হিমাচল ভারত খণ্ডের সর্ব্বত্র এক অভিন্ন এবং অপরিবর্ত্তনীয় মূর্ত্তিতে আজও বিদ্যমান রহিয়াছেন।

যতদূর সম্ভব প্রাকৃত ভাষারও একটা নির্দ্দিষ্ট আকার (Standard) রক্ষা করাই উক্ত ভাষায় ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোক দিগের জন্য, অর্থাৎ কেবল প্রাকৃত ভাষাই শিখাইবার জন্য, প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের পরিশিষ্ট স্বরূপই প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ গুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস, এবং আমরাও তাহাই মনে করি। "সেতুবন্ধ" এবং গউড়বহো প্রভৃতি কাব্য এবং হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের (মাগধী) এবং জৈন ধর্ম্মের (মহারাষ্ট্রী) অনেক গুলি ধর্ম্ম পুস্তক প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। প্রাকৃত ভাষার সাহিত্য রচিত এবং অনুশীলিত হইবার সাহায্যের জন্যই প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ গুলি মুখ্যতঃ রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষার "বানান সমস্যার" জন্য এত পুরাতন কথা বলার দরকার কি? দরকার এই যে একই ভাষার শব্দগুলি যখন বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মুখে বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হইতে থাকে, তখনই "বানান-সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রকাশ করিবার যন্ত্র স্বরূপ ব্রাহ্মী অথবা দেবনাগর লিপির সৃষ্টি হইয়াছিল। উহাতে যে সকল স্বর এবং ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ চিহ্ন অথবা অক্ষর

(২) পতঞ্জলির ব্যাকরণ মহা ভাষ্যের প্রথম আহ্নিক, উপোদ্ঘাত প্রকরণ।

আছে, উহাদের একটিকেও ছাড়িয়া দিলে সংস্কৃত ভাষার সংসারধর্ম্ম অচল হইয়া পড়ে। প্রাকৃত ভাষার শব্দগুলির জন্য উহাদের সকলগুলির প্রয়োজন হয় না বলিয়া প্রাদেশিক কোন কোন লিপির অক্ষরের তালিকায় সকলগুলির অস্তিত্ব নাই। যাঁহারা কচ্চায়ণ (কাত্যায়ন বররুচি) এবং হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃত বৈয়াকরণের নাম করিয়া অথবা অশোক-লিপির অক্ষর তালিকা অথবা বর্ত্তমান "তিব্বতী" "কৈথী" "মহাজনী" ইত্যাদি লিপিমালার দোহাই দিয়া বলিতে চান, যে প্রাদেশিক প্রাকৃতাদি ভাষায় সংস্কৃত বর্ণমালার সবগুলি অক্ষর ছিল না অথবা নাই, তাঁহাদিগের কথা সত্য হইলেও ইহা নিশ্চয় যে উক্ত বৈয়াকরণগণ সংস্কৃত বর্ণমালার সহিত উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন। প্রাকৃত ভাষা কোন না কোন আকারে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল (এবং এখনও আছে) তাহা নিশ্চয়, এবং সেই সকল দেশের অধ্যাপকগণ শিক্ষার্থী ছাত্র মণ্ডলীকে পূর্ণ সংস্কৃত বর্ণমালা শিখাইতেন (এবং এখনও শিখাইয়া থাকেন)। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ উক্ত বর্ণমালার ভাণ্ডারের কতকগুলি অক্ষরকে পরিত্যাগ করিবার হেতু আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিভূষণ ঘোষ এম. এ, মহাশয়ের প্রস্তাব হইতে দেখিতে পাইছি যে তিনি কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষার আধিপত্য সহ্য করিতে চাহেন না। আমরা বলি, "কলিকাতার প্রাদেশিক" ভাষাই নাই। গ্রীয়ারসন্ যাহাকে Standard অথবা Central Bengali বলিয়াছেন, তাহাই কলিকাতার কতকগুলি (সামান্য সংখ্যক) বাসিন্দার অবলম্বন। উত্তরে মালদহ মুরসিদাবাদ হইতে দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর প্রাচীন খাতের উভয় তীরেই প্রাচীন গৌড় রাজ্যের রাজধানী এবং প্রধান নগরগুলি স্থাপিত ছিল; সুতরাং রাজধানীর এবং নগরের সভ্যতা গৌড়ীয় বা বাঙ্গালা ভাষার একটা আকার গড়িয়া দিয়াছিল যাহাকে লোকে "সাধু ভাষা" এই নাম দিয়াছিলেন, এখনও দিয়া থাকেন। কোন বিশেষ জেলার নাম করিয়া প্রাদেশিকতার পক্ষ অবলম্বন করিব না। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতার পত্তন হইলে, প্রাচীন গৌড় এবং সপ্তগ্রাম প্রভৃতি নগরের ব্যবসায়ী সওদাগরেরাই প্রথম প্রথম কলিকাতায় যান, পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর নানাবিধ রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে ইংরেজের আশ্রিত কলিকাতা রাঢ় (বরেন্দ্র ও বাগড়ীরও বটে) দেশের অনেক লোকেরই আশ্রয় স্থান হইয়া পড়ে। সুতরাং কলিকাতায় "বাঙ্গালা" ভাষা সেই প্রাচীন রাঢ় (এবং বাগড়ী বরেন্দ্রের) দেশেরই "সাধু ভাষার" স্থান পাইয়াছে। কথ্য সাধু ভাষার পরে লিখিত সাধু ভাষার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীরাম-পুরের মিসনরী সাহেবেরাই ছাপার হরফ খুদিয়া বাঙ্গালা পুরাতন পুঁথি ছাপাইতে এবং বাঙ্গালা গদ্যে বাইবেল ও খবরের কাগজ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা রাজধানীতে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাধু ভাষায় পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা কেন, হিন্দী খড়ীবোলীর আদর্শ গদ্য কাব্য "প্রেমসাগর" ও লালা লল্লুলাল নাকি কলিকাতাতেই লিখিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গদ্য লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ওড়িয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর রাঢ় দেশের লোক ছিলেন। মদন মোহন তর্কালঙ্কার অক্ষয় কুমার দত্ত রাঢ় এবং বাগড়ীর সন্ধি স্থলের অধিবাসী ছিলেন। কবি মধুসূদন, রঙ্গলাল এবং হেমচন্দ্র রীতিমত "ক্যালকেশিয়ান্ই" ছিলেন এবং নবীনচন্দ্র জন্মে "চাটগেঁয়ে" হইলেও কর্ম্মে "কলকত্তাই" ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধুও ক্যাল-কেশিয়ান্। কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর ঢাকার নিবাসী হইলেও তাঁহর লেখায় "ঢকি" অপভ্রংশের কোনও গন্ধত নাই? পরন্তু তাঁহার রচনা গুরু-গম্ভীর "গড়ী" রচনা পদ্ধতির একান্তঅনুসরণ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। এই রূপে উনবিংশ-শতাব্দে ধীরে ধীরে "সাহিত্যিক বাঙ্গলা ভাষা" গড়িয়া উঠিয়াছে এই সাহিত্যিক বাঙ্গালা ভাষাকে আমরা "গৌড়ীয় সাধু ভাষা" বলিতে পারি। মাইকেল মধুসূদনও তাহা বলিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিয়া গিয়াছেন।

এই নূতন-"গৌড়ীয় সাধুভাষা" ভিন্ন প্রাচীন গৌড়ীয় সাধু ভাষার বিশাল ভাণ্ডার আছে। রমাই পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম ঘনরাম, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, ইত্যাদি ইত্যাদি বৈষ্ণব, শাক্ত এবং বৌদ্ধ (প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ) প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নানা প্রদেশ নিবাসী কবির কাব্যাবলী রহিয়াছে। এই সব রচনার ভাষা আমরা গৌড়ীয় সাধুভাষা" বলিয়া জানি। এই প্রাচীন পদ্য সাহিত্যের পর, অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রাজকৃষ্ণ রায় পর্য্যন্ত অনেক পদ্য-সাহিত্য লেখকের লেখা আছে। গদ্য এবং পদ্য, (প্রাচীন ও নূতন) এই সাধুভাষার ভাণ্ডার যে বহু বিস্তৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার উপর আমাদের দুরাকাঙ্খা যে সমগ্র ওড়িয়া এবং অসমীয়া সাহিত্যকেও আমরা এই "গৌড়ীয় সাধুভাষার" কুক্ষিভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

এখন সমস্যা এই যে এই বিশাল সাধুভাষার শব্দসমূহের ঠিক ঠিক বানান করিতে গেলে সংস্কৃত বর্ণমালার বিন্দুবিসর্গকেও বাদ দিতে পারা যায় কি না? বীমস্, হর্ণলি এবং গ্রীয়ারসন প্রমুখ পণ্ডিতেরা দুঃখ করিয়াছেন যে আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা এবং ওড়িয়া ভাষায় সাচ্চা সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বড় বেশী। এই দেশের প্রাচীন লেখকেরা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনার সময়ে সাতাইশ গজ লম্বা সমাস, তেতালা চৌতালা সন্ধি এবং দাঁতভাঙ্গা শব্দসম্ভারের সাহায্যে যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় রচনা পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "গৌড়ী" (গুড়ের মত মুখরোচক?)—সাহেবেরা যদি এই পুরাতন কথাটি মনে রাখিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহারা আমাদের জন্য দুঃখ করিতেন না। ওড়িশার মেছুনীরা মাছ লইয়া ফিরি করিবার সময় ডাকে, "ঝস্ লইব?" (৩)। সে দেশের মেয়ের শ্বশুর বাড়ী হইতে ঝি তত্ত্ব লইয়া আসিলে গৃহিনী বলেন, "উদন্ত কেণি আসুঅছি—?" আমাদের অনেকেই অভিধান না খুলিয়া "ঝস্" অর্থে 'মাছ' এবং "উদন্ত" অর্থে 'খবর' বুঝিতে পারেন না। আর আমরাই বা কম কি? এই "তত্ত্ব" বা "সন্দেশ" শব্দের ব্যবহারই দেখুন না। "সন্দেশ" বলিতে না বলিতে অনেক বাঙ্গালীরই মুখে লাল পড়িবে, কিন্তু উহার আসল মানেত সেই "তত্ত্ব," "উদন্ত"—অর্থাৎ 'খবর'। লোকে কুটুম্ব বাড়ীতে শুধু হাতে খবর পাঠায় না, সঙ্গে মিষ্টান্ন পাঠাইয়া থাকে; এই জন্যই "সন্দেশ" এই নূতন অর্থ পাইয়াছেন এবং গুণাকর ভারতচন্দ্র উহার সাহায্যে মালিনী মাসীর মুখে শ্লেষ এবং যমকের বাহার খুলিয়া দিয়াছেন। আসল কথা এই যে, জয় গোপালের অত্যাচার থাকুক আর নাই থাকুক, প্রাচীন অথবা নূতন যে কোন প্রসিদ্ধ কবির রচনা লইয়া পড়িতে বসুন, দেখিবেন যে বাঙ্গালা সাধুভাষার ভিতর খাঁটি সংস্কৃত ("তৎসম" নহে একেবারে তৎ) শব্দ অনেক রহিয়াছে। এই খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলির অবয়ব বা আকৃতির ঐক্য বা সাম্য-বিজয় রাখিবার জন্য সংস্কৃত বর্ণমালার সকল গুলিরই আমাদের প্রয়োজন আছে! সংস্কৃত বর্ণমালার সবগুলিকে না রাখিলে (দীর্ঘ ঌ কারের প্রয়োগ সংস্কৃতভাষায়ও পাণিনি স্বীকার করেন নাই) ঐ শব্দগুলির শুদ্ধ (উচ্চারণ যাহাই হউক) বানান রক্ষা করা চলিবে না। এরূপ অবস্থায়, "তদ্ভব" শব্দ গুলির উচ্চারণ ধরিয়া (Phonetic) বানান করিবার জন্য বর্ণমালার অক্ষর যোগ বিয়োগ রূপ পরিশ্রম স্বীকার করা অনাবশ্যক বলিয়াই মনে হয়না কি?

পাণিনি মুনি গন্ধারবাসী ছিলেন;—তাঁহার বার্ত্তিক-কার এবং ভাষ্যকার পাটলিপুত্রের অধিবাসী ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে ও পরে প্রাচ্যদেশের ছাত্রমণ্ডলী গন্ধারের "তক্ষশিলা"র এবং মধ্যযুগে গন্ধারের ছাত্রেরা মগধের "নালন্দা"র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেন। একই সাধু প্রাকৃত ভাষার আশীর্ব্বাদে আচার্য্য এবং বিদ্যার্থিবর্গের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলিত এবং প্রাদেশিক উচ্চারণ

(৩) নিম্নরেখ অক্ষরগুলির শেষের অকার উচ্চারিত হইবে।

বিভিন্নতার জন্য তাঁহাদের কোন বিশেষ অসুবিধা হইত না। আজও সাধু বাঙ্গালা (গৌড়ীয়) ভাষার সাহায্যে কলিকাতা, শ্রীহট্ট, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপক এবং ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ভাব বিনিময় চলিতেছে। (রাজভাষা ইংরাজির কথা আমি ইচ্ছা করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছি।) কটক কলেজের ছাত্রেরাও বেশ সাধু বাঙ্গালাভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন। এই সাম্য অথবা একতার বন্ধন রজ্জুরূপিনী সংস্কৃত শব্দমালাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা একমাত্র "তদ্ভব" নামের আশ্রয়ে কাজ চালাইতে যাই, এবং সেই শব্দগুলিকে "ক্যালকেশিয়ান" উচ্চারণের সঙ্গত করিয়া বানান করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে, আশঙ্কা হয় যে দেশে এক উদ্ভট ও অত্যাশ্চর্য্যময় "ব্যাবেলের" সৃষ্টি হইয়া নিতান্ত বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে।

মৌলবী সাহেব নিজে ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত হইয়াও বাঙ্গালা-ভাষায় স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বৈভিন্ন লইয়া এত অধিক সময় কেন কাটাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে বৈদিক সময় হইতেই হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত ভেদে স্বরের নানাবিধ ভেদ রহিয়াছে। ছাত্রদিগকে এই স্বরগুলির শুদ্ধ এবং সুষ্ঠু উচ্চারণ শিখাইবার জন্য গুরুশিষ্য উভয়কেই বহু কসরৎ করিতে হইত, এবং সেই কসরতের সাহায্যের জন্য ষড়ঙ্গের অন্যতম এক বেদাঙ্গেরই (শিক্ষা) সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। এসিয়া এবং য়ুরোপ খণ্ডের পণ্ডিতবর্গের দ্বারা আবিষ্কৃত যাবতীয় জের, জবর এবং পেশ অথবা (নানা আকারের বিন্দু ও রেখার সমবায়ে ঘটিত) diacrital চিহ্ন প্রয়োগ করিয়াও স্বরের উচ্চারণ বৈচিত্রকে কেহ বাঁধিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। "ঘরের চাল," "নূতন চাল, আর ঝি বউ এর নব্য চাল" এই তিন রকম "চাল"ই দেখুন না। এরূপ উচ্চারণ বৈচিত্র অনেক যে আছে, তাহা সকলেই জানেন। মৌলবী সাহেব যে সকল যোড়স্বর দেখিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয় 'ইআ' এবং 'অ-ও-আ-ইআ' প্রভৃতি আরও যে সব উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাদের অনেকগুলি ব্যঞ্জন-লুপ্ত চিহ্ন মাত্র। ওড়িয়ায় "করিণ (ড়্)" প্রাচীন বাঙ্গালায় "করিঞা তা" পরে "করিআ" এবং এখন "করিয়া"য় দাঁড়াইয়াছে। ইহারা যেমন আছে তেমনই থাকুক, লোকে এখনও শুনিয়া উচ্চারণ শিখিতেছেন, পরেও শিখিবেন। ইহাদের জন্য নূতন স্বরবর্ণ অন্য কোন হিন্দী, ওড়িয়া, মরাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি) প্রাকৃত ভাষায় নাই;—আমাদেরও দরকার আছে বলিয়া বোধ হয় না।

তাহার পর, ব্যঞ্জনবর্ণের কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় "বর্গীয়" এবং "অন্তস্থ" এই দুই "ব" এর একত্ব ঘোষণা করেন নাই। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষার লিপিতে দুই "ব" এর আকার একরূপ হইয়া গিয়াছিল এবং সেই জন্য তিনি বাধ্য হইয়া দুই স্থলেই এক আকারের দুইটি "ব" রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ওড়িয়া লিপিতেও দুই "ব" এর একরূপই আকার,—যদিও উচ্চারণ পার্থক্য আছে। ওড়িয়ারা "দেবান" লেখেন এবং পড়েন "দেwan," আমরা ও আগে তাহাই লিখিতাম, এখনকার মত "দেওয়ান" লিখিতাম না। আসল কথা এই যে, অন্তঃস্থ "য, র, ল, ব" এই চারিটি সংস্কৃত বর্ণমালার অর্দ্ধস্বর অর্দ্ধব্যঞ্জন এবং অনেকটা দ্বিভাবগন্ন বা Dipthong ধর্ম্মাবলম্বী(৪)। ই এবং ঈ অবস্থান্তরে পড়িয়া "য" উ ঊ "ব" ঋ ৠ "র" এবং ঌ "ল" হইয়া পড়ে। তবে, মাগধী অথবা প্রাচ্য হিন্দীর ধর্ম্মে পড়িয়া শব্দের আদ্যের এবং সংযুক্ত স্থানের 'য' এর উচ্চারণ 'জ' হইয়া যায়। শব্দের মধ্যে উহাদের উচ্চারণ প্রায়ই সংস্কৃত "য" র মত উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং এই প্রভেদ বুঝাইবার জন্যই উহার "য"এবং য় এই দুই আকার উদ্ভাবিত হইয়াছে। ওড়িয়ারাও "য" এর নিম্নভাগে একটি বাঙ্গালা ২ লিখিয়া উহার "য" বা "y" এর উচ্চারণ বুঝাইয়া থাকেন। ঙ, ঞ, ণ, ষ, স, ইহারাও নিরর্থক নহে। খাটি

(৪) ই+অ=য, উ+অ=ব, ঋ+অ=র, ঌ+অ=ল। ঋ এবং ঌ না থাকিলে সংস্কৃত শব্দ (যেমন পিতৃ+আজ্ঞা) গুলির সন্ধি করিতে অথবা বুঝিতে পারা যাইবে না।

সংস্কৃত শব্দ এবং উহাদের সন্ধির পরিবর্তন এবং ষত্ব ও ণত্বের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য উহাদিগকে রাখা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা আর খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

মৌলবী সাহেব তাঁহার মূল প্রস্তাবের (৩৬ পৃষ্ঠা, প্রথম স্তম্ভ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ) একস্থলে "সংস্কৃতেরই মত অর্থাৎ বৈয়াকরণেরা যাহাদিগকে 'তৎসম' বলেন, সে গুলিকে সংস্কৃতের নিয়মেই লেখা উচিত" মানিয়া লইয়াছেন। যদি তাহাই তিনি মানিয়া লইতে পারেন, (এবং নিশ্চয়ই পারেন) তবে আর এত "গবেষণার গণ্ডগোল" কেন? তিনি সংস্কৃত (খাঁটি সংস্কৃত, সম টম নহে) শব্দ গুলির হুবহু সংস্কৃত বানান রাখিতেছেন, অথচ যুক্তাক্ষরের সমস্যায়ও পড়িয়াছেন। এই "সমস্যা" আমি বুঝিলাম না। তিনি দৃষ্টান্ত দিতেছেন, "পালী বা প্রাকৃত লিখে ভিক্‌খা, আমরা কেন লিখিব ভিক্ষা অর্থাৎ ভিক্‌খা? পালী বা প্রাকৃত লিখে দক্‌খিণ, আমরা কেন লিখিব দক্ষিণ?" ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে আমরা "ভিক্ষা" এবং "দক্ষিণ" লিখি বটে কিন্তু উহার উচ্চারণ করি "ভিক্‌খা" এবং "দক্‌খিণ"। প্রাকৃত সমধর্ম্মিনী ভাষার প্রায় সবগুলিতেই যে "ষ" 'খ' রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায়ই ইহার খুব ব্যভিচার আছে। হিন্দী লেখেন "লষণ" কিন্তু পড়েন 'লখন', এমন কি "ষষ্ঠী" লিখিয়াও "খষ্ঠী" পড়েন। এক লক্ষণ শব্দের বানান তুলসী দাসের রামায়ণে "লক্ষণ" লষণ, লচ্ছণ লছমন, লখণ, ইত্যাদি বহুরূপেই দেখা যায়। সীতা, সিঅ, সিআ, সিয়, সীয় রূপে দেখা দিয়া থাকেন। গুরু নানকের শিষ্যগণ হিন্দীতে শিক্ষ হইয়াছেন আর আমরা সোজাসুজি শিখ, করিয়া লইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় যদি আমরা "ষ" র উচ্চারণ সর্ব্বত্রই "খ" র করিতাম, তাহা হইলে প্রাকৃত অথবা পালীর দোহাই দিয়া ভিক্খা, দক্খিণ লিখিতাম। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা (এবং ওড়িয়া ভাষাও) অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্রতা বজায় করিয়া চলিতেছেন, সুতরাং উক্তরূপ আক্ষেপের অবকাশ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বাল্যকালে এক বাঙ্গালী পণ্ডিতের লিখিত ব্যাকরণে আমরা পড়িয়াছিলাম,—

১। আদ্য এবং যুক্ত ভিন্ন ড, ঢ, এবং য যথা ক্রমে ড়, ঢ় এবং য় রূপে উচ্চারিত হয়;

২। ক্ষ, জ্ঞ এবং ষ যথা ক্রমে ক্‌খ, গ্‌গ, এবং খ রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

পণ্ডিত মহাশয় এই উচ্চারণ রীতিকে বঙ্গীয় রীতি বলিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগকে "প্রাচ্যপ্রাকৃতরীতি" বলিতে পারিতেন। বৈয়াকরণ ক্রমদীশ্বর (রাঢ়দেশের)? প্রাকৃত পাদে এই রূপ অনেক ব্যত্যয়ের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কচ্চায়ণ (বররুচি) এবং হেমচন্দ্র প্রমুখ বৈয়াকরণগণও নিজ নিজ অভিজ্ঞতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দেশ বিদেশে উচ্চারণের প্রভেদে কিছু কিছু থাকিলেও খাঁটি সংস্কৃত শব্দ গুলি ঠিক সংস্কৃতের নিয়মেই লিখিত হওয়া উচিত এবং তাহা হইইতেছে। খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলিকে প্রাদেশিক উচ্চারণসঙ্গত রূপে (phonetically) বানান করিতে গেলে উহারা অসংস্কৃত, বা ম্লেচ্ছ, হইয়া জাতি হারাইয়া বসিবে। আমাদের এই দৃঢ় জাতিভেদের দেশে জাত হারানো বানানের পক্ষপাতী লোক অধিক পাওয়া যাইবে না।

মৌলবী সাহেব তাঁহার প্রস্তাবের (৩৮ পৃষ্ঠায়) শেষ ভাগে যুক্তাক্ষর ওয়ালা কতকগুলি সংস্কৃত এবং পালী এই তিন প্রকার রূপ দিয়া উহাদের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখা ধরিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন "ইহার জন্য চাই শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি এবং নৈতিক সাহস"।

আমরা "পুরানী রোশনী"; "সাহসের" কথাতেই আমরা ভয় পাই এবং খাঁটি সংস্কৃতের আমলে "নৈতিক সাহসের" স্থান ও নাই। "সাহস মাত্রেই "অনৈতিক", তবে ইংরাজীর "moral courage" আছে বটে। ইংরেজীতে সুপণ্ডিত মৌলবী সাহেব এই ইংরেজী moral courage কেই সংস্কৃত বেশে "নৈতিক সাহস" রূপে চালাইয়াছেন। ইহাতেও বিভ্রাট আছে। অনুবাদ বিভ্রাটে পড়িয়া অনেক সংস্কৃত

শব্দের অর্থই যে কদর্থে পরিণত হইয়াছে এবং নিত্যই হইতেছে তাহা অনেকেরই "সহিয়া" গিয়াছে। সেকথা রাখিয়া তাঁহার উদ্দিষ্ট বিষয়ই দেখা যাউক। তিনি শব্দ, কথিত, ছদ্ম, যুগ্ম, শয্যা, সত্য, জিহ্বা, জিবা, চিহ্ন, অপরাহ্ন, কহ্লার, ক্ষীর, যক্ষ, জ্ঞান, যজ্ঞ, কার্য, লক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ" এই ১৮টি যুক্তাক্ষর ওয়ালা শব্দ এবং তাহাদের পালী এবং প্রাকৃত রূপ দিয়াছেন। প্রাকৃত এবং পালী ভাষায় ঐ সংস্কৃত শব্দ গুলির উচ্চারণসঙ্গত রূপ অর্থাৎ বানান আছে বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষায়ও সেই সেই ভাষার অনুকরণই করিতে হইবে, ইহাই কি মৌলবী সাহেবের অভিমত? আমরা কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সংস্কৃত শব্দ গুলি হুবহু লেখা এবং (বাঙ্গালীর মুখে যতদুর সম্ভব ততদুর) পড়া হইতেছে। মদনমোহন, বিদ্যাসাগর অথবা শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবুর (যাঁহারই হউক) একখানি "শিশুশিক্ষা" অথবা "বর্ণপরিচয়" দ্বিতীয়ভাগ খুলিলেই সবগুলিকেই হুবহু পাওয়া যাইবে। অধ্যাপক মহাশয় বলিবেন, "সেই টাই ত দোষ এবং সেই দোষ আমাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি এবং নৈতিক সাহসের সহিত সর্ব্বথা এবং সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য"। মৌলবী সাহেবের বাড়ী যেখানেই হউক, তিনি "ভাগীরথীপথ-সন্নিহিত-প্রদেশবর্ত্তী" (ক্যালকেশিয়ান্?) সাধু উচ্চারণের পক্ষপাতী; তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি কোন সভ্যভব্য ক্যালকেশিয়ানের মুখে উক্ত অষ্টাদশ শব্দের পালী অথবা প্রাকৃত সঙ্গত উচ্চারণ শুনিয়াছেন? আমাদের নিবাস "ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী "সেই সপ্তগ্রাম অঞ্চলে হইলেও অনেকদিন হইতে কোচবিহারে উত্তর এবং পূর্ব্ব বঙ্গবাসী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ডুবিয়া আছি; আমরা এক "খীর" আর দ্বিতীয় "জিব্‌ভা" ভিন্ন, তাঁহার প্রদত্ত শব্দমালার আর কোন প্রকৃত বা পালি উচ্চারণ শুনি নাই। পশ্চিমে এবং পূর্বে সর্বত্রই "ক্ষীর" স্থলে "খীর" বা "খির" বলে, আর পূর্ব্বঅঞ্চলে "জিহ্বা" স্থলে "জিব্‌ভা" শুনিতে পাওয়া যায়; এই দুইটি ছাড়া আর তাঁহার তালিকাধৃত কোন শব্দেরই পালী বা প্রাকৃত উচ্চারণ শুনি নাই। তিনি শুনিয়াছেন কিনা, তাহা বলিতে পারি না। যদি ঐ সকল শব্দের ঐরূপ উচ্চারণই আমাদের না থাকে, তবুও কি পালী অথবা প্রাকৃতের খাতিরে আমাদিগকে ঐরূপ নকল করিতে হইবে? তবে যদি তিনি বলেন, আমরা পঙ্গ, যুগ্‌গ, গংগান, পকথ, কার্জ, লক্‌খন, তীক্ষ, ইত্যাকার কেন লিখিব না? তাহার উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি তিনিও সেই যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত শব্দের বানান খাঁটি সংস্কৃত Orthographyর নিয়মে চলিবে।

শ্রীযুক্ত ঘোষজ "লক্ষ্মী" শব্দের ষ্‌ এবং ম্‌ এর উচ্চারণ আদৌ করেন না বলিয়াছেন। ইহা তাঁহার ঠিক হইয়াছে কি? তিনি ষ্‌ এর উচ্চারণ খ্‌ করেন; আর ম্‌ এর উচ্চারণ যে করেন না তাহা ঠিক। অনুনাসিকের উচ্চারণ পূর্ব্ববঙ্গে আদৌ নাই বলিলেই হয়। অনুনাসিক উচ্চারণ তাঁহাদের নাই বলিয়া অনেক সময়ে তাঁহারা কৌশলে সেই কাজ সারিয়া থাকেন। পশ্চিম বা ক্যালকেশিয়ান যেখানে চাঁদ, কাঁদন, বাঁধন, বলেন এবং লেখেন, পূর্ব্বদেশবাসী সেখানে চান্দ, কান্দন, রান্ধন, ইত্যাদি রূপে সে কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আনুনাসিক উচ্চারণের গোলযোগে তাঁহাদের আরও গোলমাল হয়। ঘোষজা লিখিয়াছেন, কলিকাতায় "মুলোর শাঁক্" বলে;—কিন্তু তাহা ঠিক কি? রাঢ়ের লোক আমরা বলি "মুলোর শাগ্"। আনুনাসিক উচ্চারণের অনেক রহস্য হর্ণলি এবং বীমস্ তাঁহাদের পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত বৈয়াকরণেরাও অনেকগুলি সূত্রে সেই রহস্য বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভূয়োদর্শনে ধরা পড়ে নাই, এরূপ রহস্য আরও অনেক আছে। 'ণ' এর প্রকৃত উচ্চারণ প্রায় "ড়ঁ,"—ইহা ওড়িয়ায় ঠিক আছে এবং সেই জন্যই প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যে কবিতায় ণ র সহিত ন র মিল (Rhyme) করা দেখা যায় না। আধুনিক ওড়িয়াকবিগণ বাঙ্গালীর প্রভাবে ণ এবং ন রএ ভেদ কাব্যে কবিতায় ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। মানভূম জেলায় মানুষকে "মাড়ুঁষ" বলে। সিংহভূম, মানভূম

এবং মেদিনীপুর জেলায় ওড়িয়ার প্রভাবনশতঃ "ড়" এবং (ল এর স্থানে) ড় এর খুব চলন দেখা যায়। ওদিকে বাঙ্গালার অনেক স্থানেই প্রাচ্যহিন্দীর (বা মাগধী অপভ্রংশের) প্রভাব বশতঃ ড় এবং ঢ় একেবারে র এর সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলে এই ড় এবং ঢ় এর গোলযোগ অত্যন্ত বেশী। শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয়ের প্রবন্ধে "গরমিল" কয়েকস্থলে "গড়মিল" হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্যহিন্দীতে ড় এবং ঢ় স্থানে (এবং কতকগুলি ল স্থানেও) বিকল্পে "র" র ব্যবহার আছে। পূর্ব্ববঙ্গে তাহা করিলেও অব্যাহতি নাই। অনেক শিক্ষিত লোকেও আবার র কে ড় লিখিয়া বসেন, সেইটাই আশঙ্কা জনক। ঢাকা নিবাসী এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ (আমার বিশেষ বন্ধু স্থানীয় মহাশয় ব্যক্তি) একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের দেশের লোকে নিশ্চয়ই ছেলেবেলা হইতে ষড়যন্ত্র করিয়া ড়, ঢ় এবং আনুনাসিক উচ্চারণ গুলি শিখিয়া লয়, তাহাতেই তোমরা উহাদের ঠিক উচ্চারণ করিতে পার; নচেৎ কাকরা (কাঁকড়া) পাপর (পাঁপড়), পরা (পড়া,—পঠন এবং পতিত হওয়া) এ সব কথায় ড় এর অত্যাচার কেন?" আমি তাঁহাকে ড় এবং ঢ় এর একটা সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছিলাম! কাঁকড়া এবং পাঁপড়ে আবার আনুনাসিকের অত্যাচারও আছে, সে অনেক কথা বলিয়া উহা বুঝাইতে পারি নাই। বন্ধু আমার সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত; তাই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে টবর্গ অথবা ত বর্গের কোন বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইলে উহা ড় (বা ঢ়) হইবে, কখনও র হইবে না। দৃষ্টান্ত,—

সংস্কৃত	বাঙ্গালা	হিন্দী
কঠোর	কড়া	কড়া
কটাহ	কড়া (ই)	কড়াই
পঠন	পড়া	পঢ়া
পতন	পড়া	পড়
বৃদ্ধ	বুড়	বুঢ়, বুঢঢ
কর্পট	কাপড়	কাপড়
কর্কট	কাঁকড়া, কেঁকড়া	কেঁকড়া, কাঁকড়া
পর্পট	পাঁপড়,	পাঁপড়
চর্পট,	চাপড়,	চাপড়, ইত্যাদি

অপর পক্ষে 'পরিধান' 'পরা'ই থাকিবে (৫)। পূর্ব্ববঙ্গের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা একটু সাবধান হইলে বোধহয় ড়, ঢ় এবং র এর গোলমালের হাত হইতে অনেকটা মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

মৌলবী সাহেব তাঁহার মৌলিক প্রস্তাবের যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা বড়ই মূল্যবান। তিনি বলিয়াছেন, "পয়লা বাঙ্গালীর জিভকে সংস্কৃত করুণ, তার পর বানান সংস্কৃতের মত লিখিবেন। কিন্তু সে কি সম্ভব?"

এইটি "বাঙ্গালা বানানের" নয় কিন্তু "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার"ই বড় সমস্যা। গ্রীয়ারসন সাহেবের চেষ্টায় সংকলিত Linguistical survey পুস্তকে বাঙ্গালা ভাষার (উচ্চারণ ভেদ বশতঃ অথবা প্রাদেশিক ভিন্নতা বশতঃ রকম ওয়ারী যে সকল মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে, তাহা মনোযোগের সহিত পড়িয়া এবং ভাবিয়া দেখিলে প্রকৃতই হতাশ হইতে হয়। একপক্ষে উত্তর, মধ্য এবং পশ্চিম বাঙ্গালায় এবং অন্যপক্ষে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এই বঙ্গবাসিগণের মনে "ক্যাঙ্ককেশিয়ান" আধিপত্যের বিরুদ্ধে বেশ ঝাল ও ঝাজ আছে। শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয় স্পষ্টবাক্যে সেই ঝালের পরিচয় দিয়াছেন। রাজসাহীর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল, (বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার একজন পরীক্ষক) এই "প্রতিভা" পত্রে "আমার বাঙ্গালা পরীক্ষা শীর্ষক প্রস্তাবে একাধিক বার এই ঝালের পরিচয় দিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্ব্ব-

(৫) "বৃদ্ধ" "বুড়" হইয়াছে। দ্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঢ় এবং (aspiration বা মহা প্রাণতা ছাড়িয়া) ড় হইয়াছে কিন্তু 'বৃ' 'বু' হইল কেন? ওড়িয়া এবং মরাঠীর আলোচনা করিলেই এই রহস্য বুঝা যায়। ওড়িয়া এবং মরাঠীতে ঋর উচ্চারণ 'রি' নয়, অনেকটা "রু"র মত। কৃষ্ণ কে তাঁহারা ইংরাজী বর্ণমালায় Krushna লেখেন। আমাদের "বৃদ্ধ-বুড়" সেই প্রাচীন স্মৃতি জাগাইয়া বসিয়া আছে। বৃক্ষ এক দিকে "বিরিখ" এবং অন্যদিকে "রুখ" এবং ঋক্ষ "রিছ" এবং "রুখ" হইয়াছে।

বঙ্গের ছেলেরা বিদ্রোহ বশতঃ "দুঃখ বুগ' লেখে এবং পরীক্ষককে "দুঃখ দেয়"।

আমরা কিন্তু, হতাশ হইবার কোনও কারণ দেখি না। দেশপ্রেমের কল্যাণের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিবর্গ অনেক সময়েই নিঃস্বার্থপরতার অথবা স্বার্থসঙ্কোচের পরিচয় দিয়াছেন। আপাত প্রতীয়মান প্রাদেশিক স্বার্থের দিকে যদি তাঁহাদের সত্যই খুব টান থাকিত, তাহা হইলে, "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের" সেরূপ মূর্ত্তি আমরা কখনই দেখিতে পাইতাম না। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সহর ও বন্দরের মায়া কাটাইয়া "কলকত্তা"রই অনুরাগী হইয়াছেন। তাই, আমাদের খুব আশা আছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য রসিক সজ্জনেরা "মহাজনগণের পদানুবর্ত্তী" হইয়া বাঙ্গালা "সাধু ভাষার" মাপ এবং মান বজায় রাখিবেন। আমরা অবশ্য কোনও বিশেষ ব্যক্তির (তিনি যত বড় উপাধিধারী অথবা মাননীয় ব্যক্তি হউন না) খেয়ালের অনুকরণে "ক্যালকেশিয়ান' অথবা অন্য কোন 'আন' প্রাদেশিকতার ওকালতী কখনও করি নাই,—করিবও না। "বীরবল" প্রমুখ বীরবরেরা প্রাণপণ বিক্রমে যাহা এপর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছেন এবং এখন ও করিতেছেন, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই ;—তাঁহারা "সাধু ভাষা"র প্রচুর ব্যবহারের সহিত শুধু ক্রিয়া পদগুলির কথ্য আকার চালাইয়াছেন। তাঁহাদের ভাষা পড়িতে এবং বুঝিতে অর্থাৎ রসগ্রহ করিতে কষ্ট হয় না। তবে, সম্প্রতি এমন অনেক নূতন লেখক আসরে নামিয়াছেন, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ প্রণালীকে (ইচ্ছা অথবা অক্ষমতা বশতঃ ভগবান জানেন) পরিত্যাগ করত হুবহু ইংরেজী রচনা প্রণালী চালাইতেছেন; এটা কি ভাল?

আমাদের অর্থাৎ "পুরানী রৌশনী"দের, মতে দেবনগর বর্ণমালার অঙ্গহানি করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তবে, ফারসী আরবী এবং ইংরেজী ভাষা হইতে গৃহীত শব্দগুলি যদি কেহ ঠিকঠিক বানান করিতে চান, তাহা হইলে Q, F, Qh, Z, Zh, W, ইত্যাকার বর্ণের প্রতিনিধির জন্য ক়, খ়, জ়; ঝ়, ব়, এইরূপ বিশেষ চিহ্ন (বিন্দু অথবা রেখা) যুক্ত বর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। হিন্দী ভাষায় সাহিত্যিকগণ এইরূপেই কাজ চালাইতেছেন। ভাষার বৈজ্ঞানিক বিদ্যার্থী এ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারেন যে কোন ভাষা অপর যে কোন ভাষার শব্দাবলী গ্রহণ করুক না কেন তাহাদিগকে আপনার ভাণ্ডারে যোগ করে। আর তাঁহারা এই মৌলিকনীতির নজীর স্বরূপে প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষা সমূহের (মগধী, শৌরসেনী হইতে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান্ ইত্যাদি ইত্যাদির) দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিবেন। এই মৌলিকনীতির বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় নৃপতি, হৃদয়, কৃপা, কৃষ্ণ, ঘৃত, বৃহস্পতি ইত্যাদির পরিবর্ত্তে নৃিপতি, হ্রিদয়, ক্রিপা, কেষ্ট, কিষ্ট, ঘ্রেত, বেস্পতি ইত্যাদি চালাইতে চান এবং পূর্ব্ববঙ্গের যুবকেরাও কড়া, পড়া, কাঁকড়া চাঁদ, হাঁস, ভাত ভোগ আষাঢ় ইত্যাদির বদলে করা, পরা, কাকরা, চাদ, হাস, বাত, বুগ আসার ইত্যাদি এবং অসমীয়া ভ্রাতৃগণ শর্ম্মা, চিল, সাগর, কাক ইত্যাদির স্থলে হর্ম্মা, সিল, হাগর, খাখ্ ইত্যাদি চালাইতে চাহিতেছেন। শ্রীহট্ট বাসী এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" শ্লোকাংশের অর্থ করিতে গিয়া যে বলিয়াছিলেন, "দৈ আর বাত (ভাত) অপেক্ষা বলকর আর কিছুই নাই," তাহাও এইরূপ উচ্চারণ বৈকল্যেই ঘটিয়াছিল। আমরা বৈজ্ঞানিক নহি, পরন্তু সাংসারিক;—সংসারের কোন ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধ মূলনীতি ঠিকঠাক চলেনা:—নানারূপ রফা-নিষ্পত্তি অর্থাৎ compromise করিয়াই আমাদের সংসার যাত্রা অহরহঃ চলিতেছে। রাজনীতি হইতে দাম্পত্যনীতি পর্য্যন্ত—সংসারের সর্ব্বত্রই এই রফা নিষ্পত্তির রাজত্ব;—তাই, আমরা ভাষা-বিজ্ঞানের সঙ্গেও রফা রাজিনামা করিয়াই চলিতে চাই। অর্থাৎ, খাঁটি সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলিতে সংস্কৃতের বানানই, বজায় থাকুক, আর যে গুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া (অর্থাৎ মৃণাল হইতে 'মোলামে'র মত) একেবারে "বাঙ্গালী" হইয়াছে সে গুলিকেও "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা" নীতির নকলে বানান করা

চলুক। রাণী, সোনা, কান, আমরা লিখি; যদি কেহ রানী, সোণা, কাণ লিখেন, (যেমন অনেকে লিখিতেছেন) তাহাও চলুক। সকল ভাষায়ই বিকল্প বিধান (optional forms) আছে; খাস সংস্কৃত এবং রাজভাষা ইংরাজীতেও যখন অনেক শব্দের বানান সম্বন্ধে একাধিক সাধু রূপ আছে, তখন বাঙ্গালারই বা দোষ কি? হিন্দীর প্রাচ্যমূর্ত্তিতে ত বিকল্পের ব্যবহার অসীম বলিলেই হয়; তাঁহারা ঘোড়া, ঘোড়বা, ঘোড়া, ঘোরবা, ঘোল, ঘোর, কাঁকড়া, কেঁকড়া, কাকড়া, কেকড়া, কাকরা, কেকরা,—সবই চালাইয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষায়ও এরূপ বানানের দৃষ্টান্তের কোন কালেই—অভাব ছিলনা, এখনও নাই। সুতরাং টাঁকশালের টাকা-পয়সার মত ভাষার শব্দগুলিরও যে হুবহু একই আকৃতি না হইলে উহারা "অচল" হইয়া যাইবে সে আশঙ্কা নাই।

আমরা, কিন্তু এই বানান-সমস্যা এবং উচ্চারণ-সমস্যা অপেক্ষাও এক গুরু সমস্যা দেখিতেছি। পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বাঙ্গালা ভাষার স্বত্ব-দখল এখন সাব্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর বালক বালিকাগণের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের বড়ই অভাব দেখা যাইতেছে। নিম্ন-শ্রেণীর পাঠ্য গদ্য-সাহিত্যের সরল এবং সহজ-বোধ্য পুস্তকের দর্শন প্রায়ই পাওয়া যায়। ইংরাজি Murray's spelling Book এর অনুকরণে মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বয়ের সঙ্কলিত Spelling Book বা বানানের বই গুলির আদর্শ এখনও চলিতেছে। তর্কালঙ্কারের "শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ" এবং বিদ্যাসাগরের "কথামালা"র মত পাঠ্য পুস্তক (Readers) অনেক আছে বটে, কিন্তু উহাদের ভাষা বড়ই কঠোর বলিয়া বোধ হয়। যে সকল পুস্তক উহাদের অনুকরণে অথবা অনুসরণে (ইংরাজীর তর্জ্জমা?) রচিত হইয়াছে, উহাদের দোষের মাত্রা যেন আদর্শকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, অথচ সুগমতা বা সরলতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্ঘট সন্ধি, কঠোর যুক্তাক্ষর এবং শক্ত শক্ত সুদীর্ঘ সমাসের (অনেক সময় তাহা আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মত শুদ্ধভাবে সম্পাদিতও নহে) দ্বারা এই সকল পাঠ্য পুস্তক আচ্ছন্ন প্রায় রহিয়াছে। কৃষি-শিল্পাদি বিষয়ের প্রস্তাবগুলি লিখিবার সময়ে লেখকগণের ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্যের প্রভাবে (এবং মাতৃভাষায় তুল্যরূপ পটুতার অভাবে?) অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব উদ্ভট শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের ভয়ে ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রী (এবং তাহাদের শিক্ষকেরাও) অস্থির হইতেছে। এই জন্য, নিম্ন শ্রেণীতে বাঙ্গালা "পড়া" চলিলেও ছেলে মেয়েরা সোজা বাঙ্গালা বা মাতৃ ভাষায় আপন আপন মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অধ্যাপক সাহেব ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রী দিগের বাঙ্গালা পরীক্ষার উত্তর পত্র অনেক দেখিয়াছেন, উচ্চতর শ্রেণীর বালক বালিকাগণের রচনাও দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশে, সুশিক্ষিত শিক্ষকগণের দ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিবর্গের রচনা দেখিয়া, আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষার মূলে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। আমরা শিক্ষা ব্যবসায়ী নহি;—আমাদের মনে হয় যে অন্যান্য নানা ত্রুটির মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর উপযোগী সরল এবং সহজ-বোধ্য পাঠ্য (Readers) পুস্তকের অভাব খুবই অধিক।

এই অভাবের মূলেও সেই প্রাদেশিক বিভিন্নতার বাধা বিদ্যমান। আমরা (ক্যালকেশিয়ান অথবা Central Bengali Speaking people) বাড়ীতে যে ভাষা সর্ব্বদা ব্যবহার করি, তাহা পূর্ব্ব এবং উত্তর অঞ্চলের ছেলে মেয়ে কেন শিক্ষকগণেরও সহজ বোধ্য নহে। আমরা ঢক ঢক্ করিয়া চিনির পানা খাই কিন্তু ঢাকার সুপণ্ডিত শিক্ষক সে রস পান কিনা জানিনা। এ কথা আমার কল্পনা নহে, নিত্য অনুভূত। "নধর পল্লব" কথায় পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত অর্থ বুঝিলেন, "পাতা এখনও ধরে নাই"। ইহাতে তাঁহার দোষ নাই। তাঁহাদেরও অনেক "ঘরুয়া বোলী" আমরা বুঝি না। ইহার উপায় কি? আমাদের মনে হয় যে অধ্যাপক মৌলবী সাহেব যদি পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গের কয়েকজন সাহিত্য-রসিক বন্ধু বান্ধবের সাহায্য লইয়া সরল এবং সহজ বাঙ্গালায় (সর্ব্ব প্রদেশ প্রচলিত অথচ অগ্রাম্য) হাজার দেড় হাজার শব্দ লইয়া

একটি তালিকা (Vocabulary) প্রস্তুত করিতে পারেন এবং তাহাদের সহায়তায় কয়েকখানি ছোট ছোট পাঠ্য পুস্তক (Reader) রচনা করিতে বা করাইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের বড় একটা উপকার হয়। পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী দ্বারাই এই কাজ হইতে পারে। সেখানে পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গের অনেক সুবিদ্বান্ আছেন, আর "কেল-কেশিয়ানের" ও অভাব নাই। মৌলবী সাহেব যেরূপ ভাষাতত্ত্বে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আশা আছে যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকৃত উপকার করিয়া সেই সুখ্যাতিকে চির স্থায়িনী করিবেন। ঢাকা সাহিত্য পরিষদ আমাদের এই সমস্যা সমাধান করিতে প্রযত্ন করিবেন, এইরূপ আশা এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমাদের এই আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি। যদি অনবধানতা বশতঃ এই আলোচনায় কোন অসত্য অথবা অপ্রিয় কথা থাকিয়া যায় তাহার জন্য শ্রীযুক্ত মৌলবী সাহেব, ঘোষজ মহাশয় এবং পাঠকপাঠিকাবর্গ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যুক্ত করে এই নিবেদন জানাইতেছি। যদি সাহিত্য পরিষদ অথবা সাহিত্যিক সজ্জনগণ কৃপা করিয়া এ সম্বন্ধে মনোযোগী হন, তাহা হইলে ভগবানের প্রসাদে আমাদের প্রার্থনা যে সিদ্ধ হইবে তৎ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই (৬)।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।
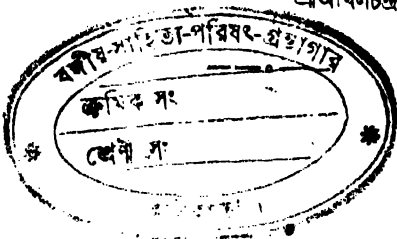
(৬) শ্রীযুক্ত ক্ষিতি ভূষণ ঘোষজ মহাশয়ের স্বাক্ষর (১৩৪ পৃষ্ঠায়) "শ্রীখিতিভূষণ ঘোষ" ছাপা হইয়াছে ; জানিনা, ইহা স্বেচ্ছাকৃত অথবা মুদ্রাকর প্রমাদ জনিত। "বৈজ্ঞানিক বিবাদ" বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম।

বাংলা বানান সমস্যা।

(প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)

প্রতিভায় প্রকাশিত বাংলা বানান সমস্যা সম্বন্ধীয় আলোচনাগুলি আমি মনোযোগের সহিত পড়িয়া আসিতেছি। গত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতি বাবুর লিখিত "বাংলা বানান সমস্যার" 'আলোচনা' ও মূল প্রবন্ধ লেখক অধ্যাপক মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের 'আলোচনার উত্তর' পাঠ করিয়া আলোচনার প্রত্যুত্তরে আমি কয়েকটী কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মূল প্রবন্ধের আলোচনায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিবাবু যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, বানান সমস্যার পথে যে সমস্ত ব্যবহারিক বাধা বিপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, যে সমস্ত দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন, অধ্যাপক সাহেব সে সম্বন্ধে এক রকম কিছুই বলেন নাই। অধিকন্তু তিনি তাঁহার উত্তরে এমন কতগুলি কথা বলিয়াছেন যাহা নিতান্ত প্রমাদপূর্ণ এবং যাহার দুই একটা মূল আলোচ্য বিষয়ের আত্মবিরোধী বা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন (Self contradictory)। অধ্যাপক সাহেব তাঁহার মূল প্রবন্ধে বাংলা বানানের দুরূহতা নিরাকরণের জন্য "উচ্চারণ মত" বানান সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু "উচ্চারণ মত" বানান সংস্কার করিতে হইলে যে একটা উচ্চারণের আদর্শ চাই সে সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। অপিচ তিনি তাঁহার 'প্রতিবাদের উত্তরে' লিখিয়াছেন "উচ্চারণ আমার আলোচ্য ভাষা নহে"। অধ্যাপক সাহেব "উচ্চারণ মত" বানান সংস্কার করিবেন অথচ উচ্চারণ আলোচনা করিবেন না ইহা ঠিক ঘোড়া না কিনিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিবার প্রস্তাবের মত। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান সংস্কার করিতে হইলে উচ্চারণের একটা আদর্শ রাখিতে হইবেই। নচেৎ একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণের গণ্ডগোলে বানানের সংস্কার না হইয়া বানানের বিভ্রাট হইবে। এবং যদি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজ নিজ "উচ্চারণ মত" বানান লিখিতে প্রয়াসী হন, তবে

দেশের ভাষায় একটা "ব্যাবেলের" (Babel) সৃষ্টি হইবে। অতএব বানান সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে একটা সার্ব্বজনীন উচ্চারণের আদর্শ খাড়া করিতে হইবে। (অবশ্য যদি ইহা সম্ভবপর হয়।) এরূপ একটা উচ্চারণের আদর্শ স্থাপন করিতে হইলে বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষার (Provincial dialect) ও উচ্চারণের বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে। অধ্যাপক সাহেব যখন বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এত আলোচনা, এত অনুসন্ধান ও এত শ্রম স্বীকার করিতেছেন, তখন তিনি নিজে যদি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তবে এই বিষয়ে যে একটা সুফল ফলিবে, ইহা নিশ্চয়ই আশা করা যাইতে পারে।

প্রাদেশিক ভাষা (Provincial dialect) ও প্রাদেশিক উচ্চারণ (Provincial বা local pronunciation) সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া "উচ্চারণ মত" বানান সংস্কার করিতে গেলে, ইহা যে সর্ব্বতোভাবে একদেশী প্রাদেশিকতার ছাঁচে গড়িয়া উঠিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অধ্যাপক সাহেবের মনের ভাব-ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহাই; অর্থাৎ তিনি কলিকাতার প্রাদেশিকতাকেই তাঁহার আদর্শ বাংলায় চালাইতে ইচ্ছুক। সুতরাং তিনি সেই আদর্শেই বাংলা শব্দের বানান সংস্কার করিতে চাহেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন "আমরা এই উচ্চারণকেই (কলিকাতার প্রাদেশিক উচ্চারণকেই) শিষ্ট উচ্চারণ মনে করি।" তিনি তাঁহার মূল প্রবন্ধেও এই "শিষ্ট উচ্চারণ অনুযায়ী" যত, তত প্রভৃতি কতগুলি শব্দের নীচে কষি দিয়া যতো, ততো ইত্যাদিরূপ উচ্চারণ দেখাইবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Local patriotism এর খাতিরে কোন স্থান বিশেষের উচ্চারণকে আদর্শরূপে চালাইবার বিরুদ্ধে ক্ষিতি বাবু তাঁহার প্রবন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন, সে-সম্বন্ধের এখানে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ক্ষিতি বাবু লিখিয়াছিলেন "আমাদের বাড়ী সুদূর শ্রীহট্টেই হউক আর সুন্দরবনের ধারেই হউক, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেই হউক আর দার্জ্জিলিংই হউক কথাবার্ত্তায় ও বক্তৃতায় ও আমরা হুবহু "কেলকেশিয়ান।" এই কথা কয়টীর উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক সাহেব বলিয়াছেন "ইহাতে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই।" কেননা "আমরা ইহাকেই শিষ্ট উচ্চারণ মনে করি।" "আমরা" বলিতে তিনি কাহাকে বুঝেন জানি না। কিন্তু কোন বিজ্ঞলোক এইরূপ উচ্চারণকে "শিষ্ট উচ্চারণ" মনে করিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করিবেন। তিনি ক্ষিতি বাবুর লেখা আর একটু মনোযোগের সহিত পড়িলে বা আর একটু বেশী উদ্ধৃত করিলে দেখাইতে পারিতেন যে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির পরেই আছে "যদিও আমাদের ধার করা বাক্য পুচ্ছের ফাঁকে ফাঁকে স্বরের ও শব্দের প্রাদেশিকতা স্বপ্রকাশ পাইয়া নিতান্ত করুণ ও হাস্যরসোদ্রেকের কারণ হয় মাত্র।" এই কথাগুলি হইতে ইহাই কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না, যে আমরা কথাবার্ত্তায় "কেলকেশিয়ান" হইতে বা কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষার অনুকরণ করিতে যাইয়া একটা ভয়ানক বেয়াদবী করিয়া বসি? এই বেয়াদবীর পাল্লায় আমরা যে বিশ্রী বিকৃত উচ্চারণ করি তাহা কোন বুদ্ধিমান লোকেরই বিবেচনায় "শিষ্ট" বলিয়া গৃহীত হইবে না। খাঁটি কলিকাতার উচ্চারণ কলিকাতার লোকের নিকট শিষ্ট মনে হইতে পারে (Local patriotism এর খাতিরে), কিন্তু তাহা সারা বাংলা কদাপি শিষ্ট উচ্চারণ মনে করিবে না। অভিধানে Standard pronunciation সব দেশের সব ভাষায়ই আছে। বাংলা ভাষায়ও আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক উচ্চারণের বালাইও আছে। তাই বলিয়া অন্য কোন দেশেই কোন স্থান বিশেষের প্রাদেশিক উচ্চারণকে আদর্শ করিয়া বানান সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় নাই। অন্য পরে কা কথা আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও এরূপ ব্যাপার হয় নাই।

আদর্শ-উচ্চারণ (Standard pronunciation) সব ভাষায়ই আছে। এবং থাকার প্রয়োজনীয়তাও আছে। সেই জন্যই আমরা আমাদের মাতৃভাষায় তাহা রক্ষা করিতে

কৃত সম্বল। কবি বার্ণস্ তাঁহার খাঁটি দেশীয় বুলিতে অনেকগুলি কবিতাই লিখিয়াছেন। সেগুলি তাঁহার স্বদেশবাসীদের নিকট যত মধুরই লাগুক না, স্কটল্যাণ্ডের বাহিরে সেগুলিকে বুঝিতে হইলে যে বিশেষ টীকা টিপ্পনির প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আদর্শ ইংরেজীতে লিখিত বই পড়িতে গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসী এবং ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞের কোন টীকার দরকার হয় না। সেইরূপ কলিকাতার "শিষ্ট উচ্চারণ" অনুযায়ী বানান করিয়া বাংলা লিখিলে, তাহা যে সারা বাংলার সকলের বোধগম্য হইবে না, ইহাও অতি সত্য কথা। সুতরাং সে ভাষাও দেশের "একমুঠা" লোকের জন্যই হইবে। ক্ষিতি বাবুও এই কথা বলিয়াছেন। বানান সম্বন্ধীয় কোন কথার প্রারম্ভেই যে উচ্চারণের কথা উঠিবে ইহা ন্যায় সঙ্গত; কেননা উচ্চারণ ছাড়া বানানের অস্তিত্ব থাকে না।

ইংলাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিগুলি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। সেজন্য তাঁহাদের সকল চেষ্টাই মানুষের শ্রম লাঘব এবং স্থান ও কালের দূরত্ব মোচনের জন্য নিয়োজিত। আমেরিকানরা যখন ইংরেজী Colour, honour, ladies প্রভৃত শব্দগুলির Color, honor, ladiz প্রভৃতি বানান লিখেন, তখন তাঁহারা যে কেবল শব্দগুলির উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বানান লিখেন, তাহা নয়। তাঁহাদের অধিকতর লক্ষ্য থাকে লিখিবার সুবিধার দিকে; অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত আকারে কোন শব্দ লিখিতে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সহজ ও সরল হয় এবং তাহাতে যেন অধিকতর স্থান ও কাল ব্যয় না হয়। এই উদ্দেশ্য সফল না হইলে শুধু পরিবর্ত্তনের জন্য পরিবর্তন হয় না এবং হওয়া উচিত নয়। বাংলা বানান লিখিতে ই-কার, উ-কার, ঋ-কার প্রভৃতি স্বরের চিহ্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযোগ করিতে লেখককে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়। ইহার উপর যদি নৃপতি, দৃঢ় প্রভৃতি শব্দে ঋ-ফলার একটা মাত্র চিহ্নের পরিবর্ত্তে নৃিপতি, দ্রিঢ় প্রভৃতি রূপে বানান লিখিয়া দুইটা স্বরের চিহ্নের আমদানি করা হয়, তবে তাহা যে কতটা বিরক্তিকর অনুভূত হইবে তাহা বলা যায় না। তদুপরি বেশী স্থান ও বেশী সময়ক্ষেপ ত আছে-ই। অধ্যাপক সাহেবের এই বিধি প্রচলিত হইলে বেচারা লেখকদের "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া বঙ্গ ভাষাকে বিদায় অভিবাদন করিয়া হাঁপ ছাড়িতে হইবে। এমতাবস্থায় এরূপ বিশ্রী বিরক্তিকর পরিবর্ত্তন যে কদাপি সাধারণে গ্রাহ্য হইবে না, তাহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। ক্ষিতি বাবুও বলিয়াছেন "স্থান ও কালের অপব্যয় বাঁচান এবং সঙ্গে সঙ্গে সহজ ও সরল পন্থা আবিষ্কারই বিজ্ঞানের উপকারিতা। কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলি যদি সফল না হয়, তবে কেবল পরিবর্ত্তনের জন্য পরিবর্ত্তন কেহ গ্রহণ করিতে রাজি হইবেন কিনা জানি না।

ক্ষিতি বাবু ঁ চন্দ্রবিন্দুর স্থান কোথায় হইবে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক সাহেব "এই প্রশ্নের সঙ্গতিই" দেখিতেছেন না। কেননা, "চন্দ্রবিন্দু একটা চিহ্ন মাত্র।" অতএব তিনি লিখিয়াছেন "কোন স্বর অনুনাসিক হইলে তাহার উপর এই চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে।" অধ্যাপক সাহেব একজন বড় Philologist. তাঁহার কাছে এ কথাটা বোধ হয় নিতান্ত অজ্ঞাত নয় যে বর্ণ মাত্রই চিহ্ন বিশেষ। প্রত্যেক স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ-ই এক একটা চিহ্ন। সুতরাং তিনি কথাটাকে আরও একটু ব্যাপক ভাবে বলিলে বলিতে পারিতেন যে বাংলা বানান সমস্যায়ও "কোনও সঙ্গতিই" নাই। যেহেতু কোন শব্দ (Sound) উচ্চারিত হইলে, তাহা ভাষায় প্রদর্শনের জন্য স্বর ও ব্যঞ্জনের চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয় অতএব অধ্যাপক সাহেবের "যে স্বর অনুনাসিক হইবে, তাহার উপরেই চন্দ্রবিন্দু বসিবে" এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া তিনি নিজেই বলিতে পারেন যে, যে শব্দের (Sound) যে রূপ উচ্চারণ হইবে, তাহার জন্য সেরূপ স্বর ও ব্যঞ্জনের চিহ্ন বসিবে। ইহাৎ সহজ নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত (Logical inference)। সুতরাং বাংলা বানান সংস্কারের জন্য এত মাথা ঘামা ঘামির কোন প্রয়োজনই ছিল না। "যেখানে যেরূপ উচ্চারণ

হইবে, সেখানে সেরূপ স্বর বা ব্যঞ্জনের চিহ্ন বসিবে" এরূপ একটা ব্যবস্থাপত্র বাজারে প্রচলিত হইলেই বানান সম্বন্ধীয় সকল লেঠা চুকিয়া যাইবে।

তারপরে "যে স্বর অনুনাসিক হইবে, তাহার উপরেই চন্দ্রবিন্দু বসিবে" এই কথাটাতে ক্ষিতি বাবুর প্রশ্নের উত্তর হয় কি? কোন্ স্বর অনুনাসিক তাহাই ত ক্ষিতিবাবুর মূল প্রশ্ন। যিনি বাংলা বানান সংস্কারের প্রশ্ন বিদ্বজ্জন সমাজে তুলিয়াছেন এবং স্বয়ং সে সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা পত্র দাখিল করিয়াছেন, তাঁহার কাছে চন্দ্রবিন্দুর স্থান নির্দ্দেশের প্রশ্নটা বোধ হয় অবান্তর নয়, কেননা ইহা যে বাংলা বানানের অন্তর্গত একথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

অধ্যাপক সাহেব বাংলা ভাষার একজন নামজাদা প্রত্নতাত্ত্বিক। সেই হিসাবে তাঁহার কথার একটা মূল্য আছে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সাধারণতঃ তাঁহার কাছ হইতে সাধারণে নির্ভুল উক্তিই আশা করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি যখন "পূর্ব্ববঙ্গে স্বরের অনুনাসিক উচ্চারণ নাই।" এরূপ হাস্যকর উক্তি করেন, তখন দুঃখের সীমা থাকে না। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ব্ববঙ্গে ড়-কারের ও স্বরের অনুনাসিক উচ্চারণ নাই, সাধারণের মধ্যে এরূপ একটা ভুল ধারণা আছে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক বা **Philologist** কে নির্ব্বিচারে সাধারণের ধারণায় বিশ্বাসী হইতে দেখিলে দুঃখ আরও বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপক সাহেব যদি ঢাকার তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র পদবাচ্য লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়া ঐরূপ ধারণায় পৌছিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে বলি যে ঐ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত, তিনি যদি কষ্ট করিয়া নারায়ণগঞ্জ ষ্টিমারে চাঁদপুর হইয়া নোয়াখালী, ফেণী চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে রেলগাড়ী চড়িয়া কোনও স্থানে না নামিয়া কেবল একটীবার ঘুরিয়া আসেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্বধারণা বদলাইবার যথেষ্ট মাল মসল্লা পাইবেন। দৈবক্রমে যদি শেষ রাত্রের মেইলট্রেণে করিয়া নোয়াখালী ষ্টেশনে গিয়া পৌছাইবার দুর্ভাগ্য তাঁহার কোন দিন হয়, তখে তিনি "পোঁঝা আঁছে নি? পোঁঝা আঁছে নি?" এইরূপ অনুনাসিক বাহুল্য শব্দের চীৎকার ধ্বনিতে নিদ্রোত্থিত হইয়া নিজেকে হঠাৎ কোনও ভূতের দেশে অবতীর্ণ মনে করিবেন। তার পরে যদি তিনি সেই "ভূতের দেশের" লোকদের সাথে একটু আলাপ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে তিনি দেখিবেন যে সে অঞ্চলে কেবল অনুনাসিক উচ্চারণের প্রাবল্য নয়, ড়-কারের উচ্চারণের প্রবলতাও যথেষ্ট আছে। এমন কি অনেক র—কারের স্থলে ড়-কারেরও অনুনাসিকের স্থানে অনুনাসিকের যেমন বোঝা স্থলে (পোঁঝা) উচ্চারণ দেখিতে পাইবেন।

যা হউক বাংলা বানান সম্বন্ধে আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি শব্দশাস্ত্রবিৎও নই আর বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবকও নই। সুতরাং আমি একথা বলিয়াই উপসংহার করিতে চাই যে "Example is better than precept" উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত প্রকৃষ্টতর। তিনি যেরূপ বানানের আদর্শ স্থাপন করিতে চাহেন, সেইরূপ বানান তিনি তাঁহার লেখায় যদি pioneer রূপে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, তবে তাহার নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিবার উপযুক্ত সৎসাহসী লোকের দেশে নিশ্চয়ই অভাব হইবে না, যদি তাঁহার বানানগুলি যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মত হয়। ইতি

শ্রীইন্দ্রকুমার মজুমদার।

স্বাগতম্।

(নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে পঠিত।)

এই সেই ঠাঁই যেথায় প্রথম
জ্ঞান-শতদলে মেলিল আঁখি,
এই সেই দেশ যার রাঙা-করে
শোভিত শোভার কনক-রাখী।

এই সেই দেশ ললাটে যাহার
জলিত শৌর্য্য-শিখা অনিবার,
আজি সে রিক্ত গৌরবহারা—
জাগিছে স্মৃতির ভস্ম মাখি।

এই সেই দেশ—তীর্থ পরম
যার অনাবিল হৃদয় ভরে
ভকতির ধারা গলিত নিয়ত
মুকতির সুধা পড়িত ক্ষরে।

কোথা সে অতীত সুখের স্বপন,
কোথা সে মুখর বাণী-তপোবন,
আজি সে মৌন 'ক্ষুধিত পাষাণ'—
হাহাকার শুধু গুমরি মরে।

হৃত-গরিমার শূন্য বেদীতে,
বেদনোচ্ছল শ্মশান মাঝ;
স্বাগত সারদা-সাধকবৃন্দ,
স্বাগত দরদী হে মহারাজ।

হে কৃতী-ভক্ত ভাবুক সুজন,
আনো নবভাব নব-জাগরণ,
বাণী-যজ্ঞের জ্বালো হোমানল—
উৎসব কর সফল আজ।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বার্দ্ধক্য ও তাহার প্রতিকার।

আমরা দেখিতে পাই সময়ে মানুষ মাত্রেরই দেহে বার্দ্ধক্য নামক এমন একটা অবস্থা আসে যাহার কবল হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই এবং যাহার শেষ হইতেছে মৃত্যু। অর্থাৎ বার্দ্ধক্য অগ্রদূতরূপে মৃত্যুর সমীপাগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায় যে কেহ হয়তো চল্লিশ বৎসর বয়সেই বুড়া হইয়া পরেন এবং কাহারও দেহে বার্দ্ধক্যের লক্ষণনিচয় উহার বহু পর পর্য্যন্তও প্রকাশ পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যাহার দেহে বার্দ্ধক্য যত গৌণে প্রকট হইবে তিনি তদনুপাতে দীর্ঘজীবী হইবেন।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে বার্দ্ধক্য কাহাকে বলে? বার্দ্ধক্য দৈহিক জড়ত্বের নামান্তর মাত্র এবং উহা কতকগুলা অভিদ্যোতক লক্ষণ দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহে কি ভাবে এবং কি কি পরিবর্ত্তন হয় তৎসম্বন্ধে শারীর-সংস্থান-বিদ্যা বিশারদ ও শারীর বিধান তত্ত্ববিদ্‌গণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ক্রমে এমন একটা সময় আসে যখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সমূহ আর যথোচিত ভাবে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। অর্থাৎ উহাদের কার্য্যকরী শক্তির হ্রাস পাইয়া থাকে। দেহের এই অবস্থাকেই বার্দ্ধক্য বলা হয়। এতদ্‌সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই। তবে মোটামুটিভাবে আমরা দেখিতে পাই যে পরিণত বয়সে দেহের উচ্চতা খর্ব্ব হইতে থাকে এবং দেহটা ক্রমেই সম্মুখের দিকে ঝুকিয়া পড়ে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে যৌবনে কাহারও দেহের উচ্চতা ১৭৪ ধরিলে, ৭০ বৎসর বয়সে উহা কমিয়া ১৬১তে দাঁড়ায়। প্রায় ৪০ বৎসর বয়ক্রমের সময় হইতে মেরুদণ্ড ক্রমেই বক্রভাব ধারণ করিতে ও সঙ্কুচিত হইতে থাকে বলিয়াই উক্তরূপ দেহের উচ্চতা হ্রাস পায়। বার্দ্ধক্যের আর একটী সুস্পষ্ট লক্ষণ হইতেছে ক্রতগম হৃদস্পন্দন

অর্থাৎ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে (যথা এক মিনিট) একজন মধ্য বয়স্ক ব্যক্তির হৃদয় যতবার স্পন্দিত হয়, তাহার তুলনায় ঐ সময় মধ্যে একজন বৃদ্ধের হৃদয় অধিকবার স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং উহা আভ্যন্তরিণ দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত বার্দ্ধক্যে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতির হ্রাস ও আরও নানাপ্রকার দৈহিক জড়ত্বের পরিচায়ক লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব দেহস্থিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের কার্য্যকরী ক্ষমতা যদি অবিকারী ভাবে রাখা যায় তাহা হইলেই বার্দ্ধক্য আসিতে পারে না এবং দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। কিন্তু উক্তরূপ ব্রতে সিদ্ধ হইতে হইলে প্রথমে কারণ সমূহের অনুসন্ধান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে দৈহিক, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ পরিবর্ত্তন সমূহ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ চূড়ান্ত প্রামাণিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে একটী মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বার্দ্ধক্যে হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া থাকে। দেহরূপ জটিল যন্ত্রটার পরিচালন কেন্দ্র হইতেছে হৃদপিণ্ড বা রক্তাশয়। এই মর্ম্মস্থান হইতেই ধমনী (arteries) * সমূহ দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরিণত বয়সে রক্তবহা নাড়ী বা জীবিতজ্ঞা সমূহের আর পূর্ব্বের ন্যায় স্ফূর্ত্তিযুক্ততা থাকে না। উহারা ক্রমে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। তখন বাধ্য হইয়া উহাদের মধ্য দিয়া দেহের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনোচিত রক্ত প্রেরণ করিতে হৃদ্‌পিণ্ডের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়াই হৃদস্পন্দন দ্রুততর হইয়া থাকে। উক্তরূপে সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম করিতে করিতে অবশেষে হৃদ্‌পিণ্ডও ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্নায়ুমণ্ডলির দার্ঢ্য (Arterial Sclerosis) হইতেই দৈহিক জড়ত্বের উৎপত্তি। এইরূপে বার্দ্ধক্যের অন্যান্য লক্ষণাবলীর আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধেও প্রামাণিক ব্যাখ্যা সমাহৃত হইয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ধমনী সমূহের শীর্ণতা (Atrophy) বা দুর্ব্বলতা হইতেই উহাদের উৎপত্তি।

বিবৃতভাবে একমত না হইলেও ধমনীর জড়তাই যে বার্দ্ধক্যের কারণ তদ্বিষয়ে স্থূলতর বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। অধ্যাপক অস্‌লার (Prof. Osler) এক কথায় দীর্ঘায়ুরহস্য সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। "Longevity is a vascular Question and a man is only as old as his lyrteres." * অর্থাৎ রক্তবহানারী মণ্ডলীর উপর জীবন নির্ভর করিতেছে এবং উহাদিগকে কর্ম্মক্ষম রাখিতে পারিলেই দীর্ঘজীবি হওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্নায়ুমণ্ডলীর জড়তা (arerial atrophy) প্রতিরোধ করিতে পারিলেই চিরজীবত্ব লাভ করা যায়।

মূল উদ্দেশ্য অনুরূপ হইলেও বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক ধমনী নিচয়ের পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ জড়তা স্থাপিত রাখার পন্থা বিভিন্ন রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবশ্য উহাদের মধ্যে কোন্‌টা যে শ্রেষ্ঠ বা সমীচীন তাহা বলা না গেলেও উহাদের কোনটাকেই উপেক্ষা করা যায় না। কারণ বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত সমূহ সর্ব্বদাই পরীক্ষামূলক প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উপরিলিখিত ব্যবস্থা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১)

দেহরূপ যন্ত্রটার পরিচালনার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, আমাদের খাদ্য হইতে তাহা সংগৃহীত হয়। আমাদের ভুক্ত দ্রব্যের অধিকাংশ শান্তভাবে প্রতিনিয়ত পুড়িয়া শরীরের

* ধমনী, রক্ত বাহিনী, বায়ুবাহিনী, রক্ত বহানাড়ী রোহিণী ও জীবিতজ্ঞা একই অর্থবাচক ও ইংরেজীতে Artery পারিভাষিক শব্দ।

* 2 Osler "The principles and practice of medicine. p p. 666.

পেশী সকলকে কর্ম্ম শক্তি (Energy) দান করে এবং কয়লা পুড়িয়া যেরূপ কিছু ছাই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ ঐ খাদ্য দগ্ধ হইয়াও কিছু আবর্জ্জনা পশ্চাতে ফেলিয়া রাখে। এই আবর্জ্জনা ভাগকে নিয়মিতভাবে দেহ হইতে বাহির করিয়া না দিতে পারিলে উহারা পেশী সমূহে সঞ্চিত হইয়া উহাদের উপর বিষক্রিয়া করিয়া থাকে এবং উহাদের কর্ম্মশক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে দেহ হইতে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বা আবর্জ্জনা রাশির নিয়মিত উৎসর্জ্জনের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। অধ্যাপক মণ্টগোমারি (Prof. T. H. Montgomery) বহু পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল। "Natural death of the individual results from self poisoning the waste products of metabolism accumulate in the tissues until there results a true intoxication of the latter. Death follows on account of the insufficiency of the excretion process; there fore the limit of life is a matter of excretion."

বৈজ্ঞানিকগণের নির্দ্দেশ যে কোনও নর্দ্দামায় আবর্জ্জনা জমিলে যেরূপ জল ঢালিয়া উহা স্থানান্তরিত করিতে হয়, সেইরূপ দেহরূপ বিরাট অন্দরমহলের প্রত্যাখ্যাত উচ্ছিষ্ট-রাশিকে একমাত্র জলদ্বারা ধৌত করিয়াই দূর করিয়া দেওয়া যায় এবং তজ্জন্য প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ জল পান করা দরকার। কিছু দিন পূর্ব্বে নিউইয়র্ক সহরের একটী স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সরকারী ইস্তাহারে ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে,—"প্রত্যহ অন্ততঃ ছয় গ্লাস করিয়া জল পান করিও" বলা বাহুল্য বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ মতই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থাটী বাহ্যতঃ এত সহজ, সুলভ ও সাধারণ যে, অনেকে হয়ত উহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে যাঁহারা সুস্থ তাঁহারা যদি দেহকে চিরদিন সুস্থ রাখিতে অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হইতে বা দেহকে ক্রমশঃ সুস্থতর করিতে অর্থাৎ নবতারুণ্য লাভ করিতে (rejuvenation) চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণ জলপান একান্ত কর্ত্তব্য। 'প্রচুর পরিমাণ' অর্থে দিবসে অন্ততঃ ছয়গ্লাস বা তিনসের। অবশ্য এতদাধিক জল পানে কোনওরূপ অনিষ্ট হয় না; বরং উহা নবযৌবন প্রদায়করূপে দেহের পক্ষে অধিকতর ইষ্টকর।

জলের প্রধান কার্য্য—উহা বৃহদন্ত্র হইতে শোষিত হইয়া রক্তধারার মধ্যে মিশিয়া গিয়া উহার মধ্য হইতে দ্রবনীয় বিষসমূহ সংগ্রহ করিতে করিতে আমাদের কুক্ষির উভয় পার্শ্বগত বৃক্কদ্বয়ে (Kidneys) আসে; বৃক্কদ্বয় রক্তকে সুপরিষ্কৃত করিয়া ও উহার স্বাভাবিক মৌলিক ঘনতা সম্পাদন করিয়া, বিষমিশ্রত জলীয়াংশ মূত্রাশয়ে (Bladder) পাঠাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত জল শরীরের উত্তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করে; দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে সমানভাবে তাপ বিতরণ করে; এবং অতিরিক্ত উত্তাপকে ঘামের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। তারপর, যে কোটি কোটি সূক্ষ্মতম প্রাণবস্তবং অণুকোষ সমূহ (cells) দ্বারা নির্ম্মিত এই যে দেহরাজ্য, সেইগুলি আমাদের কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষরিত, অকর্ম্মণ্য ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এই মৃত অনাবশ্যক অণুকোষগুলি রক্তের মধ্যে মিশিয়া, পরে চর্ম্ম, ফুসফুসদ্বয়, বৃক্কদ্বয় ও অন্ত্রমধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। জল ঐ সকল আভ্যন্তরিক যন্ত্রকে সক্রিয় ও সুস্থ রাখে, এবং শরীরে কোনওরূপ অপ্রয়োজনীয় বা দুষ্ট পদার্থ থাকিতে দেয় না। অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরের সর্ব্বপ্রকার ময়লা নিষ্কাষন করিয়া দিতে জল অদ্বিতীয় এবং দেহের ভিতরে শত্রুর সন্ধান পাইলেই জল তাহাকে যে কোনও দরজা দিয়া হউক অর্দ্ধচন্দ্র দানে তাড়াইয়া দেয়।

আমরা যতটা জল পান করি তাহার ২।৩ অংশ মূত্ররূপে নির্গত হইয়া থাকে। বাকি ১।৩ অংশের কতকটা মলের

সঙ্গে কতকটা ঘর্ম্মরূপে, এবং অবশিষ্টাংশ অসাক্ষাৎ ঘর্ম্মরূপে (insensible perspiration) বাহির হইয়া যায়। শুচিবাই গ্রস্ত ঠাকুরানীরা যেমন শরীরের বহিরাঙ্গ জলদ্বারা ধৌত করিয়া শুদ্ধ রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন, দীর্ঘজীবন প্রাপ্তেচ্ছু বা স্বাস্থ্য-পিপাসু ব্যক্তিগণেরও সেইরূপ দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলিকে নির্ম্মল রাখিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জলপান করাই হইতেছে উহা করার একমাত্র উপায়।

(২)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের ভুক্ত দ্রব্যের সমস্তটা দৈহিক উপাদানে পরিণত হয় না। কিয়দংশ আবর্জ্জনা-রূপে পড়িয়া থাকে এবং ক্রমে দেহের উপর বিষক্রিয়া করিয়া নানাপ্রকার রোগ ও জরা আনয়ন করে। কাজেই আমাদের খাদ্যদ্রব্য যদি এরূপভাবে নির্ব্বাচন করা যায় যে উহা দেহে সম্পূর্ণরূপে সমীকৃত (assimilated) হইতে পারে, তাহা হইলে আর আমাদের পূর্ব্বোক্ত কারণে কোনও রোগ হইবে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য কি? বহু চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে নিরামিষাশী ব্যক্তিগণ যেমন সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারেন, আমিষাশী ব্যক্তিগণ তাহা পারেন না। মৎস্য মাংস ভক্ষণদ্বারা মানবদেহে অতিশয় অনিষ্টকারক রোগ উৎপন্ন হয়। সিড্‌নি, এইচ্‌ বিয়ার্ড প্রণীত The testimony of science in favour of Natural and human diet (অর্থাৎ মানব জাতির বিজ্ঞান সম্মত কিরূপ আহার হওয়া উচিত) নামক গ্রন্থে বিভিন্ন দিক হইতে বিষয়টার অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদের আমিষ ভক্ষণের পরিবর্ত্তে নিরামিষ আহার করাই উচিত। উদ্ভিজ্জাত খাদ্যই মানবের স্বাভাবিক আহার্য্য। খাদ্যসম্বন্ধে এই নৈসর্গিক নিয়ম মানিয়া না চলাতেই মানবদেহে নানা প্রকার রোগ ও অকাল বার্দ্ধক্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অধ্যাপক বেরণ [illegible]র বহু পরীক্ষার পর নিঃসন্দিগ্ধভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে—শারীরবিজ্ঞানানুযায়ী মানবশরীরের গঠনীপ্রণালী যেরূপ তাহাতে ফলমূলাহারী জীবের সাদৃশ্যই মানবে লক্ষিত হয়; মানবদেহ আমিষ (অর্থাৎ মৎস্য ও মাংস) ভক্ষণোপযোগীরূপে গঠিত নয়। মাংসাহারী জীবের সহিত মনুষ্যের পূর্ব্বকাল হইতে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না বা ছিল না। শাকমূলাহারী জীবের ন্যায় মানবের শারীরিক গঠন। ডাক্তার জোরিয়া ওল্ডফিল্ড জীবনব্যাপী অনুধ্যানের পর বলিয়াছেন যে বিজ্ঞান স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে মানবেরা মাংসাশী * জীব নহে; পরন্তু ফল মূল ভক্ষণ কারী। ফলমূল শাকসব্জীতে যে উপাদান আছে, মানবশরীরের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। মাংস অস্বাভাবিক খাদ্য; তজ্জন্য পাকস্থলী সম্বন্ধীয় নানা রোগ উৎপন্ন করে। মাংস গুরুপাক। মানবের পাকস্থলী এইরূপ গুরুপাক খাদ্য হজমের পক্ষে উপযোগী নহে। অপরদিকে যে সারধাতুর দ্বারা শরীরের শ্রীবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ হয়, সেই বাস্তব তেজ মাংস ভক্ষণ দ্বারা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানবের আয়ুও তাহাতে কমিয়া যায়। শতকরা নিরনব্বই জনই একমাত্র মাংস ভক্ষণের জন্য নানাবিধ কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকে। কর্কটরোগ, ক্ষয় রোগ, দূষিত জ্বর, দদ্রু, কুষ্ঠ প্রভৃতি আমিষাশীদের মধ্যেই অনেকটা সীমাবদ্ধ। ডাক্তার হেগ্‌ ইংলণ্ডের একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী চিকিৎসক। তাঁহার প্রণীত "ইউরিক এসিড ও রোগের নিদান" নামক গ্রন্থপাঠ করিয়া জানা যায় যে একমাত্র ইউরিক এসিড (uric acid) হইতে গেঁটেবাত, পক্ষাঘাত, মাথাঘোরা, অঙ্গঅবশ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, নানা প্রকার বায়ুরোগ, মানসিক দুর্ব্বলতা, তন্দ্রা, শিরোঘূর্ণন, মস্তিকের দুর্ব্বলতা, বাতব্যাধি, হাঁপানি, যকৃতের দোষ, বহুমূত্র প্রমুখ বহু রোগ উৎপন্ন হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ইউরিক এসিড ভক্ষণ করা বন্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ সকল রোগ আরোগ্য হয় না। এতদ্ব্যতীত যকৃত ও মূত্রনালীকে অনেক

* মাংস শব্দ পশু মাংস ও মৎস্যের মাংস উভয়কেই বুঝাইতেছে। এবং মাংসাশী ও আমিষাশী একই অর্থে (অর্থাৎ মৎস্য বা পশুমাংস ভক্ষণকারী) ব্যবহৃত হইয়াছে।

সময় ইউরিক এসিড ধ্বংস করে। কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণ ইউরিক এসিড থাকে তাহা সমভাবে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার হেগ্ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে অর্দ্ধসের গোমাংস ১৪ গ্রেণ ও পশুর অর্দ্ধসের যকৃতে ১৯ গ্রেণ ইউরিক এসিড পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে শাকসব্জীতে এই অম্ল পদার্থ নাই বলিলেই চলে। উক্ত চিকিৎসকের মতে মানবদেহে শত শত রোগ একমাত্র ইউকিরে এসিড ভক্ষণে উৎপন্ন হইয় থাকে।

আর একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রবার্ট পার্কস্ দেখাইয়াছেন যে মাংসে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে যাহা ধীরে ধীরে শরীরে সঞ্চিত হইয়া উহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। প্রথমে পাকস্থলীর গোলযোগ এবং ক্রমে দৈহিক যন্ত্রাদিরও অবনতি ঘটিতে থাকে। এইরূপে ক্রমাগত আমিষ আহার দ্বারা নানা রোগের উৎপত্তি হয়। মাংসে যে বিষাক্ত লবণময় পদার্থ আছে তাহাদ্বারা অল্প বয়স হইতেই দেহটা ব্যাধির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে দেহ যন্ত্রটার এত অবনতি সাধিত হয় যে উহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে (অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে)। উক্ত চিকিৎসকের মতে হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের একমাত্র কারণ মাংসজ বিভাক্ত লবণ (Salt) ডাক্তার পার্চেট, ডাক্তার লুকাস প্রমুখ বহু চিকিৎসক তাঁহাদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার পর একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে দুরারোগ্য অন্ত্রোপান্ধ প্রদাহ রোগের (appendicitis) একমাত্র কারণ হইতেছে মাংসাহার। নিরামিষাশীদের মধ্যে এই রোগ কখনও দেখা যায় না।

এতএব দেখা যাইতেছে যে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তা। নুসারে আমাদের নানাপ্রকার ও দৈহিক ব্যাধি জড়তা বিকাশের একমাত্র কারণ হইতেছে আমিষাহার অর্থাৎ আবাল্য নিরামিষাসী হইলেই মানব যৌবনময় দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে।

বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত সমূহ ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে শাখমৃগ, অজ, অশ্ব, গো প্রভৃতি ফলমূল তৃণভোজী প্রাণীদের তুলনায় মাংসাশী সারমেয়, মার্জ্জার ব্যাঘ্রাদি জন্তু সমূহের কতকগুলা দৈহিক বিশিষ্টতা আছে। নিম্নেকয়েকটি উল্লেখ করা গেল। মাংসাসী প্রাণীদিগের দন্ত সমূহ ক্রম সূক্ষ্মাগ্র, তিক্ষ্ণ ধারাল অর্থাৎ মাংসভক্ষণোপযোগী ভাবে গঠিত। মর্কটাদি অপর শ্রেণীর জন্তুদিগের দন্ত নিচয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের; উহাদের উপরিভাগ তীক্ষ্ণ বা ধারালের পরিবর্ত্তে সটান ও চ্যাপটা এবং কাজেই মাংসভক্ষণোপযোগী নহে। মাংসাশীদের দন্তসমূহ ফাঁক ফাঁক এবং এমন ভাবে অবস্থিত যে মুখ বন্ধ করিলে উপরের দন্তগুলা নিচের দন্তগুলার ফাঁক মধ্যে এবং নিচের দাতগুলা উপরের দাতগুলার ফাঁক মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। এইরূপ ব্যবস্থা মাংস টানিয়া ছিঁড়িবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নিরামিষাশীদের দন্তসমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট এবং খাদ্যদ্রব্য পিষিয়া না চর্ব্বন করিয়া গ্রহণের উপযোগী ভাবে গঠিত। মেষ অশ্ব গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তুগণ ওষ্ঠদ্বারা আকর্ষণ করিয়া জল পান করে এবং তৎকালে কোনও শব্দ হয় না। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীসমূহ ওষ্ঠ সাহায্যে পানীয় দ্রব্য গ্রহন করিতে পারে না; উহারা জিহ্বার সাহায্যে জল পান করিয়া থাকে এবং তৎকালে 'স্তু-স্তু-স্তু' এইরূপ একটা শব্দ হয়। মাংসাষী প্রাণীদের স্ত্রী পুরুষভেদে নাসারন্ধ্রের ঠিক নিচেই অল্প কএক গাছা দীর্ঘ কেশ থাকে। নিরামিশাষী প্রাণীদের মধ্যে ওরূপ দেখা যায় না। মাংসাষী জন্তুর হস্ত পদের নখসমূহ অতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র অর্থাৎ অপর প্রাণী হত্যা করিয়া খাদ্য আহরণের উপযোগী ভাবে গঠিত। নিরামিশাষী প্রাণীদের হস্ত পদের নখাবলী প্রশস্ত ও মসৃণ এবং মোটেই ধারাল নহে অর্থাৎ আমিষাহার সংগ্রহের উপযোগী ভাবে গঠিত নয়।

উপরে মাংসাশী প্রাণীদের যে কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা গিয়াছে মনুষ্যের মধ্যে তাহার কোনটিরও চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যের পক্ষে মৎস মাংস অস্বাভাবিক খাদ্য এবং উদ্ভিজ্জ বস্তু স্বাভাবিক খাদ্য।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে নিরামিষাশী বিধবাগণ সাধারণতঃ নিরোগ ও দীর্ঘজীবনী হন। ফলমূলাহারী সাধুসন্ন্যাসীরাও সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী। জগতের শ্রেষ্ঠ মনিষীদিগের নামের একটী তালিকা করিলে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরামিষাশী ছিলেন। পিথেগোরাস, প্লেটো, আরিষ্টটোল, সক্রেটিস্, হাইপেটিয়া, ব্রিসাস্, ডাইয়োগিনিস্, প্লুটার্ক, সেনেকা, জোরোষ্টার, মিল্টন, নিউটন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, নেলসন্, ওয়েলিংটন ইহাদের কেহই আমিষাহারী ছিলেন না। অবশ্য বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, নানক, প্রতাপ, শিবাজ এবং "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অনুসরণে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক (যদিও অল্প কিছুদিনের জন্য মাত্র) যে নিরামিষাশী * ছিলেন তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

(৩)

বায়ুর সহিত আমাদের শরীরের অতি নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণের সময় আমরা শরীর মধ্যে বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি এবং প্রশ্বাসকালে তাহা পরিত্যাগ করি। বায়ু শরীরের পক্ষে এতই আবশ্যকীয় যে শরীরের দুইটি প্রধান যন্ত্র (ফুসফুস্) সদা সর্ব্বদা বায়ু গ্রহণের জন্য নিযুক্ত আছে।

বায়ু প্রধানতঃ অম্লজান (শতকরা ২১ ভাগ) ও যবক্ষারজান (শতকরা ৭৯) নামক দুইটি আদিম পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। এতদ্ব্যতীত বায়ুতে সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প কার্ব্বন ডাই অকসাইড্ গ্যাস প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। নিশ্বাস গ্রহণ কালে যে বায়ু ফুস্ফুস্ মধ্যে গৃহীত হয়, রক্ত তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণ অম্লজান (oxygen) শোষণ করিয়া লয়। এই অম্লজান রক্তের সহিত শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে চালিত হইয়া উহার পুষ্টি সাধন করে। অম্লজান শরীরের অঙ্গার (carbon) জাতীয় পদার্থ সমূহের সহিত মিলিত হয় এই এবং রাসায়নিক সংযোগ হইতেই শরীরের উত্তাপ ও শক্তির উৎপত্তি। অঙ্গার ও অম্লজানের সংযোগে শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বনডাই অক্সাইড নামক যে বাষ্পকার পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা দেহের পক্ষে অনিষ্টকারী। উহা রক্তের দ্বারা ফুসফুসে নীত হইয়া প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। এই কারণে আমাদের নিশ্বাসবায়ু ও প্রশ্বাসবায়ু এতদুভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়।

যে বায়ু নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শরীরের অনিষ্ট সাধিত হয় তাহাকে দূষিত বায়ু বলা হয়। সাধারণতঃ যে যে কারণে বায়ু দূষিত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল:—(১) অম্লজানের অভাব; (২) কার্ব্বন ডাই অক্সাইডের আধিক্য; (৩) জলীয় বাষ্পের অভাব বা আধিক্য; (৪) অনিষ্টকর বাষ্পের সংমিশ্রণ; (৫) বায়ুতে ধূলিকণার বা অন্য কোনও ভাসমান পদার্থের আধিক্য; এবং (৬) রোগ বীজাণুর বিদ্যমানতা।

দেহ যন্ত্রটা অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করিতেছে এবং তৎজন্য শক্তির প্রয়োজন হইতেছে। দেহাভ্যন্তরে অম্লজান যে সকল রাসায়নিক সংযোজন, বিয়োজন ক্রীয়া ঘটাইয়া থাকে তাহা হইতেই উক্ত শক্তির উৎপত্তি। মুহূর্তের জন্যও প্রয়োজনোচিত শক্তির অভাব হইলেই দেহ যন্ত্রটার কাজ বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে। আমরা বায়ু হইতেই নিশ্বাসের সঙ্গে উক্ত অম্লজান দেহাভ্যন্তরে প্রেরণ করিয়া থাকি। অতএব দেখা যাইতেছে যে বায়ুই হইতেছে জীবের জীবন। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে কোনও খাদ্য গ্রহণ না করিয়াও ৫০ দিন পর্য্যন্ত এবং বিন্দুমাত্রও জল পান না করিয়া ৩দিন পর্য্যন্ত বাচিয়া থাকা যায়। কিন্তু পাঁচ মিনিটের জন্য নিশ্বাস গ্রহণ কোনও কারণে বন্ধ হইলে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণের মতে আমরা নিজেরাই অজ্ঞতাবশতঃ বায়ুকে দূষিত করি এবং এই দূষিত বায়ু সেবন করিয়া নানারূপ পীড়াগ্রস্থ হই। দূষিত বায়ু সেবনের ফলে শির পীড়া, বমনেচ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা অনিদ্রা ও সময়ে সময়ে উদরাময় প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস

* পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে ডিম্ব নিরামিষের মধ্যে গণ্য।

নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধি বায়ুস্থিত বীজাণুদ্বারাই উৎপন্ন হয়। যক্ষাবীজাণু অধিকাংশ স্থলে নিশ্বাসের দ্বারা ফুসফুসে উপনীত হয় ও যক্ষারোগ জন্মায়।

স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে গৃহমধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ততঃ ১০০০ ঘনফুট বায়ু আবশ্যক এবং ঘণ্টায় অন্ততঃ তিনবার এই বায়ুর পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত অর্থাৎ ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বায়ু প্রত্যেক ব্যক্তি কলুষিত করে। ১০ ফুটলম্বা ১০ ফুট প্রশস্ত ও ১০ ফুট উচ্চ একটি ঘরে কেবল মাত্র এক ব্যক্তির শয়ন করা কর্ত্তব্য।

বৈজ্ঞানিকগণের মতে নিয়মিত ভাবে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে সহজে কোনও রোগ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। বিশুদ্ধ বায়ুর প্রভাবে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাদির ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেহ স্থিত রক্ত প্রভৃতি উপাদান সমূহের একটা বিশেষত্ব এই যে উহাদের মধ্যে ব্যধি নির্ম্মূল করিবার শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। উহারা যখন দুর্ব্বল হইয়া পরে তখনই মাত্র দেহে ব্যাধি বা জরা প্রবেশ করিতে পারে। বিশুদ্ধ বায়ু উহাদিগকে নূতন সজীবতা বা কর্ম্মক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে একমাত্র বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারিলেই জীবদেহে সহজে কোনও ব্যধি প্রবেশ করিতে পারে না, এবং প্রবেশ করিলেও তৎজন্য কোনও চিকিৎষক ডাকা বা ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ দেহস্থিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রহরী মণ্ডলীর শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া ব্যধি আপনা হইতেই সরিয়া পরে। বন্য পশুপক্ষির মধ্যে যে কোনও ডাক্তার বা বিশেষ কোনও ঔষধাদির ব্যবহার প্রচলন নাই উহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলের কারণ। তাহাদের ব্যধিও কদাচিত হয় এবং এরূপ হওয়ার একমাত্র কারণ হইতেছে যে তাহারা সর্ব্বদা মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করে। • নেপোলিয়েন বলিয়াছেন "Do not counteract the living principle: Leave it to the liberty of defending itself: it will do better thau any drugs."

শারীরতত্ত্ববীদগণের মতে যে বায়ু যত অধিক চঞ্চল সে বায়ু তত অধিক জীবনী শক্তি প্রদায়ক এবং রুদ্ধ, নিশ্চল বায়ু জীবনীশক্তি দানে অনুপযুক্ত। আকাশের অবস্থা ভাল থাকিলে মাঠের মাঝখানের বা ছাদের উপর মুক্ত বায়ুতে শয়ন করা বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের উপায়। অবশ্য তাহা সম্ভবপর না হইলে গৃহের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ঠিক সেই দিকের কোনও উম্মুক্ত জানালার নিকট মস্তক স্থাপন পুর্ব্বক শয়ন করা কর্ত্তব্য। এ স্থলে ড্রাইডেনের (Dryden) একটি কবিতা মনে পড়িতেছে।

"Better to hunt in fields for health unbought,
Than fee the doctor for his noxious draught."

(৪)

আমাদের দেহটা অসংখ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদী দ্বারা গঠিত একটি জটিল যন্ত্র বিশেষ। বৈজ্ঞানিকগণের মতে মানবদেহে এমন কতকগুলা অংশ আছে যাহার কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত ২১১টা অংশ এমন ভাবে গঠিত যে উহাদের সহিত অপরাপর অংশের ঐক্য হয় না; এবং এই অনৈক্য হেতুই আমরা নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করি। "We suffer very much from Disharmonies, i. e. imperfect adaptations of structures within us to the performance of the body as a whole."

দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় আমাদের বৃহদন্ত্রটা (Large Intestine) অত্যন্ত বৃহৎ; অর্থাৎ দেহ যন্ত্রটা সুপরিচালনার জন্য বৃহদন্ত্রটা অনেক ছোট হইলেও চলিত। অধ্যাপক মেচ্‌নিকফের (Metchnikoff) মতে বৃহদন্ত্রটা প্রয়োজনাতীরিক্ত বৃহৎ হওয়াতেই আমাদের দেহে বার্দ্ধক্য আসিয়া থাকে। বৃহদন্ত্রটা আয়তনে বৃহৎ হওয়ার ফলে অর্দ্ধপাক খাদ্য দ্রব্যের কতকাংশ তন্মধ্যে থাকিয়া যাইতে সুবিধা পায়। পরে এই পদার্থগুলা অন্ত্রাশয় মধ্যে সঞ্চিত (fermented) হইয়া এমন সকল রাসায়নিক পদার্থের উৎপত্তি করে যাহা মানব দেহে বিষ ক্রীয়া করিয়া থাকে।

অন্ত্র মধ্যস্থ এক জাতীয় অনুদণ্ডক (bacteria) দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্তরুৎসেক বা সন্ধান সাধিত হয়। বৃহদন্ত্রটা প্রয়োজনাতীত বৃহৎ না হইলে এরূপ কিছু ঘটিতে পারিত না।

বীজাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে ৪০ বৎসর বয়সের পর মনুষ্যের অন্ত্র মধ্যস্থ জীবাণু সমূহের সংখ্যা ও কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; উহারা ভুক্তদ্রব্যস্থ পচনশীল (Proteid ভাগকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই পরাক্রমশালী হইয়া পড়ে এবং শরীরে নানাপ্রকার রোগের বিষ উৎপাদন করে। অধ্যাপক মেস্‌নিকফের মতে উক্ত বিষ দ্বারা জর্জ্জরিত হওয়াতে মানবদেহে বার্দ্ধক্যজনক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। উক্ত অধ্যাপক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত বার্দ্ধক্য-আনয়নকারী জীবাণু সমূহের বৃদ্ধি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা দুগ্ধাম্ল (Lactic Acid) দ্বারা আংশিকরূপে প্রতিহত করা যায়। এস্থলে মনে হইতে পারে যে বাজার হইতে দুগ্ধাম্ল ক্রয় করিয়া নিয়মিত রূপে সেবন করিলে, এই সকল দেহ ধ্বংসকারী জীবাণু সমূহের আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা করা যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বিশুদ্ধ লেকটিক এসিড সেবন করিলে তাহা অন্ত্র পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া পাকস্থলীর মধ্যেই রহিয়া যায় এবং কাজেই ঐ জীবাণু সমূহের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত জীবাণু সমূহের আবাস স্থানে যদি দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত করান যায়, তাহা হইলে উহা সহজেই উহাদিগকে নিষ্ক্রিয় রাখিতে পারে। অধ্যাপক্ মেস্‌নিকফ্ দেখাইয়াছেন যে বিশুদ্ধ দধি ভোজন দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। কারণ দধি ভোজন করিলে তন্মধ্যস্থ দুগ্ধাম্ল-বীজাণু সমূহও (lactic acid bacilli) তৎসহ অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং ঐ স্থানে দধিস্থ অবশিষ্ট শর্করা ভাগকে দুগ্ধাম্লে পরিণত করিবে। এই অম্ল অন্ত্রমধ্যস্থ দেহক্ষয়কারী জীবাণু সমূহের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া অকাল বার্দ্ধক্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের রোগ হইতে শরীরকে রক্ষা করে।

বহু পরীক্ষা দ্বারা অধ্যাপক মেস্‌নিকফ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যহ দুগ্ধাম্ল বীজাণু অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করাইলে অর্থাৎ প্রতিদিন বিশুদ্ধ দধি ভোজন করিলে, মনুষ্য দীর্ঘজীবী হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল সবল ও কার্য্যক্ষম থাকে। সমগ্র ইউরূপে বুলগেরিয়াতেই দধির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন এবং এই দেশের অধিবাসিগণ অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন অত্যধিক মাত্রায় "টক্ দুগ্ধ" (বা দধি) পান করিয়া থাকে। সমগ্র বুলগেরিয়ার লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। তন্মধ্যে ১০ জনের বয়স ১২৫ এর অধিক, ৮৮ জনের বয়স ১২০ হইতে ১২৫ এর মধ্যে এবং ২৩৪০ জনের বয়স ১১০ এর উপর। পৃথিবীতে বুল্‌গেরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী মনুষ্যের দেশ। বৈজ্ঞানিকগণের মতে ঐ দেশের লোকেরা প্রত্যহ দধি ভোজন করে বলিয়াই এত দীর্ঘজীবী হয়।

দধিস্থিত কেসিন (Casein) ভাগ জমাট অবস্থায় থাকা হেতু অনেক সময় আমাদের পক্ষে, বিশেষতঃ রোগীদের পক্ষে উহা পরিপাক করা সহজ নয়। এমত স্থলে দধির পরিবর্ত্তে ঘোল বা মাঠা ব্যবহার করা শ্রেয়। ঘোলেও দধি বীজাণু থাকে।

প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বড় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক দীর্ঘজীবন লাভের আরও যে সকল উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাদের আলোচনায়ও বিরত হওয়া গেল।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

পুরাণো কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইউরোপীয় মহাসমরের অবসানে রুসিয়ান বিপ্লবের সময় মহাত্মা জননায়ক লেনিনের সম্বন্ধে কতই যে অদ্ভুত রহস্যময় সংবাদ—কতবার তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সিপাহি বিদ্রোহের সময় নানা সাহেবের সম্বন্ধেও এইরূপ কত আজগুবী খবর—কতবার তাঁহার ধৃত হওয়ার, কতবার তাঁহার মৃত্যুর কত অলীক সংবাদ ইংরাজী কাগজে প্রকাশ হইয়াছে আবার তাহার পরই খবর আসিয়াছে 'তিনি ধৃত হন নাই, বিদ্রোহী ব্যূহের সঙ্গে সঙ্গেই বেদের টোল নাড়ার ন্যায় এদিক ওদিক টহল পড়িতেছেন'। এইরকম "অলীক আকাশ ভেদী সংবাদ" বোধ হয় ইংলিশম্যানই বেশী প্রকাশ করিতেন। বারবার এইরূপ অলীক সংবাদে জ্বালাতন হইয়া ইংলিশম্যানকে লক্ষ্য করিয়া প্রভাকর লিখিতেছেন—

"এইরূপ সংবাদ ইংলিশম্যান পত্রে কতবার কতপ্রকারে প্রকটিত হইয়া পশ্চাৎ সম্পূর্ণ অমূলকরূপে পরিণত হইয়াছে তাহা আমরা একমুখে ব্যক্ত করিতে পারিনা, কারণ প্রতি-বাক্যেই মুখ পরিবর্ত্তন করিলেপর মনুষ্যের প্রধানতা কতদূর পর্য্যন্ত সুরক্ষিত হইতে পারে তাহা পাঠক মহোদয়বর্গেরা আপনাদিগের বিচক্ষণ বুদ্ধিদ্বারা অনুধাবন করুণ। আমরা বারবার ইংলিশম্যান সম্পাদকের অস্থির বাক্যসকল সুস্থির চিত্তে বিবেচনা করতঃ অবাক হইয়াছি। ইংলিশম্যান সম্পাদক সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে করিতে শুক্লকেশ ধারণ করিয়া একপ্রকার মুরীদ হইয়া বসিয়াছেন। তথাচ যেন হত চেতনের ন্যায় যাহা মুখে আইসে তাহাই বলিয়া বসেন। কি অপূর্ব্ব! পূর্ব্বাপর বিবেচনা দ্বারাই মনুষ্য বিচক্ষণাগ্রগণ্য হইয়া থাকেন। ইংলিশম্যান সম্পাদকের পূর্ব্বাপর বিবেচনা এতদূর পরিপক্ক হইয়াছে—প্রাচীনদশার যে সীমা তাহারে দশা বলিয়া থাকে—ইংলিশম্যান সম্পাদক কি প্রকৃতরূপে তাহারই দুর্দ্দম হইয়া উঠিতেছেন? যাহা হউক ইংলিশম্যান সম্পাদকের পরিপক্কতা বিষয়ে আমরা অনুরোধ করি উঁহার আত্মীয়স্বজনেরা যেন তাঁহার শুশ্রূষা জন্য কিছু মনোযোগী হয়েন নতুবা সম্মুখ বর্ষায় ভয়ানক পূর্ব্বক চেষ্টিত হইয়া পবন দমন জন্য কোন প্রকার প্রতিকার নিরূপণ করুণ।"

* * *

ইতিহাস নানা সাহেবের চরিত্র ঘন কৃষ্ণ মসী লিপ্ত করিয়া আঁকিয়াছে। কারণ নানা বিজিত তাঁহার ইতিহাস লেখক বিজেতা। সিরাজউদ্দৌলার ঘন কালিমাময় চরিত্র আধুনিক গবেষনার ফলে অনেকাংশ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নৃশংসতার পরিচায়ক অন্ধকূপহত্যা রাজনৈতিকের কাল্পনিক চাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্রেণীর অন্যান্য যে সকল কলঙ্ক উপন্যাস এবং কাব্য প্রণেতাদের রচনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাও আধুনিক গবেষণার ফলে আকাশকুসুমবৎ শূন্যেই বিলীন হইতেছে। নানা সাহেবের সম্বন্ধে যদি এইরূপ বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে নির্ভীক নিরপেক্ষ গবেষণা হয় তাহা হইলে বোধ হয় আজ আমরা তাঁহাকে যে ভাবে দেখিতে পাইতেছি হয়ত তিনি এতটা খারাপ প্রতিপন্ন না ও হইতে পারেন। তাঁহার নামে বহু অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে সত্য কিন্তু বাস্তবিক তিনি Savage Slaughterer of women and children বলিয়া অখ্যাতি প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত কিনা তাহা গবেষণা সাপেক্ষ। সিপাহি বিদ্রোহের সমকালীন প্যারিস নগরে প্রকাশিত কোন সংবাদ পত্র হইতে উদ্ধৃত জনৈকা প্রত্যক্ষ দর্শিনী ভুক্তভোগী উচ্চ সামরিক ইংরেজ কর্ম্মচারী পত্নীর নিম্নলিখিত উক্তি পাঠ করিলে এই সন্দেহটী মনে প্রবলতর হয়। উক্ত মহিলা বলিয়াছেন যে আমি নানা সাহেবের অনুগ্রহেই সতীত্ব ও প্রাণ রক্ষা করতঃ আগ্রায় গমন করি। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণের হত্যা করণ বিষয়ে নানা সাহেবের কোন অপরাধ নাই। বিদ্রোহি সেনারা অবাধ্য হইয়াই এইরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছে;

[illegible] আবার স্বামী পুত্র হত্যা করিয়াছে, কন্যার প্রতি দুর্ব্যবহার করত তাহাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি নানা [illegible] লইয়া বিচার পাইয়াছি।

[illegible] ক্রিনিকৃস পত্রিকায় বিলাতের কোন পত্র প্রেরকের পত্রে এইরূপ জানা যায় যে উপস্থিত বিদ্রোহে সিপাহীদিগের প্রতি বিশেষ দোষপূর্ণ করা উচিত হয় না [illegible] সকল হৃদয় বিদীর্ণকর নিষ্ঠুর আচরণের জন্য [illegible] দায়ী করা হয় তাহার মূলাধার কেবল কারামুক্ত

* *
*

মৃত্যুকে কালের করাল দন্তরূপে কল্পনা করা আমাদের [illegible] তৎপূর্ব্বকাল হইতেই সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে। [illegible] সময় শুধু কবির সুললিত সরল গীতি কবিতায় বাঙ্গলা মুখরিত, সেই সময় তাঁহারই সম্পাদিত দৈনিক পত্রে প্রকাশিত কালের দন্তের একটা উপমা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার ভাষা আজকালকার পাঠকগণের উপভোগ্য হইবে বলিয়া আশা করি। একদিনের সংবাদ পাইলাম— "বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর সিনিয়ার ধর্ম্মাদক্ষ রেবেরণ্ড আর্থার [illegible] সাহেব কালের ভীষণ দন্তে চর্ব্বিত হইয়াছেন।" তারপর ই এক সংবাদ দাতার প্রেরিত পত্র পড়িলাম—দস্যু অলঙ্কারের লোভে একটা শিশুকে ভুলাইয়া লইয়া হত্যা করার সন্দেহে এই সংবাদটী প্রেরিত হইয়াছে—

"তাহারা করাল বরণী করাল নয়নী ব্যাদান বদনী রক্ত রসনা শক্ত দশনা মুক্ত বসনা ভীষণবেশী গলিতকেশী লোক রাক্ষসীর প্রচণ্ড দন্ত প্রহারে লণ্ড ভণ্ড ও জর্জরীভূত হইয়া এই অদ্ভূত ঘটনা রটনা করিতেছি" (ভূমিকা-ই এত দীর্ঘ যে সংবাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে আপনাদের ধৈর্য্য থাকিবে

এ সংবাদটী পড়িতে পড়িতেই Servant পত্রিকাখানি [illegible] হইল। Servant খুলিয়াই দেখিলাম Hillaire Belloc এর লেখা "Decadence of novels—change in Pubic taste" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ। তাহাতে পড়িলাম তিনি কবিদের [illegible] করিয়া লিখিয়াছেন— The poets will survive, they are the toughest kind of meat for the teeth of time—কবিগণ কালকে জয় করিয়া টিকিয়া থাকিবে। কালের দন্তের পক্ষে তাহারা বড়ই শক্ত মাংস।

* *
*

নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ নাকি খুব সাদাসিধে ধরণে থাকিতেন—পরন্ত পরিচ্ছদ আহার বিহার কোন বিষয়েই তাঁর ব্যয় বাহুল্য ছিল না। বেশী মসলার খানা, বরফ জমান সরবত কি পণীর এ সবে তাঁর রুচি ছিল না। তবে বরফটা চাই-ই। শীতকালে রাজমহাল পাহাড় থেকে বরফ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত, ইহাতেই সারা বছর চলিত। এখন একথা শুনিলে আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত মনে হয় কিন্তু স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁর "সেকাল ও একাল" এ লিখিয়াছেন যে দেশে দিন দিন শীত কমিয়া যাইতেছে। তাঁদের বাপখুড়াদের ছেলেবেলায়ও নাকি শীতকালে মাঝে মাঝে মাঠে ঘাসে গাছ পাতায় পালা পড়িত। কোম্পানীর সাহেবরা যখন কলিকাতায় বসত বাস আরম্ভ করিলেন তখন কলিকাতায় বরফ পাওয়া যাইত না। তাঁরা পানীয় ঠাণ্ডা করিবার জন্য অন্য প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। বড় বড় সাহেবদের বাড়ীতে একশ্রেণীর খানসামা থাকিত তাদের "আবদার" বলিত—তাদের কাজই ছিল মদ পানীয় ঠাণ্ডা রাখা। তারা Saltpetre এবং Glaubers salt দিয়া মদ ঠাণ্ডা রাখিত। ১৮০৫ সনে একজন বিদেশী ভ্রমণকারী এই ঠাণ্ডা সরবৎ খাইয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে লিখিয়াছেন—

"The tiffin, a meal at two o'clock, defrauds the dinner of its homage due. But the luxury of the first glass of cool claret (loll shraub) that salutes your lips! Skilfully refrigerated, it is a celestial draught The icynectar courses down the whole

system with the rapidity of lightning : the spirits are set free as from the torpor of enchantment, and the whole being undergoes a refreshing transformation,—"

দ্বিপ্রহরে দুইটার আহার, টিফিন, নৈশ ভোজের প্রাপ্য সম্মান লাভে বিগ্ন জন্মায়। কিন্তু প্রথম পাত্র স্নিগ্ধ ক্ল্যারেট মদের ওষ্ঠ স্পর্শ কি আরাম দায়ক! সুকৌশলে শীতলীকৃত হইয়া ইহা স্বর্গ সুধায় পরিণত হয়। এই হিমশীতল অমৃত শরীরের ভিতর বিদ্যুদ্বেগে সঞ্চালিত হয়, মনপ্রাণ যেন যাদুর মোহের অবসাদ হইতে মুক্তি পায় এবং সর্ব্বাঙ্গে কেমন এক প্রাণ সঞ্জীবক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

ইহার কিছু দিন পর বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি স্থান থেকে জাহাজে বোঝাই হইয়া বরফ আসিতে লাগিল এবং কলিকাতার টেরেটী বাজার প্রভৃতি স্থানে গুদাম জাত হইয়া এই বরফ বাজারে বিক্রয় হইতে লাগিল।

* * *

পূর্ব্বে বন্য পশুর সংগ্রাম রাজা রাজারাদের একটা খুব সৌখিন আমোদের মধ্যে ছিল। তখনকার সাহেব সুবারাও ইহাতে যোগ দিতেন। কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি উপলক্ষে লর্ডক্লাইব আউডের নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলাকে যে এক বিরাট Entertainment (ভোজ) দেন, তার খরচের তালিকা ইতিহাসে Lord Clive's bill of 1st January 1776 বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই খরচের তালিকায় মোট উনত্রিশ হাজার কয়েশ টাকা মধ্যে দেখিতে পাই—বন্যপশুর খোরাকী এবং তাদের লড়াইএর স্থান প্রস্তুতের এবং ঐ পশুর রক্ষকের বকসিস ইত্যাদির ব্যয় প্রায় সাড়ে চারি হাজার টাকা।

এ আমোদ প্রমোদ হয় আউডে। কলিকাতার Entertainment এ বন্যপশুর সংগ্রাম হইত না তবে পক্ষীর সংগ্রাম অনেক দিন পর্য্যন্ত কলিকাতার সৌখিন সমাজে একটা খুব আমোদের মধ্যে ছিল। ১৮৫৮ সনের একটী বাস্তবিক পক্ষী সংগ্রামের বিবরণ আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। অথচ এ সময় অজ্ঞাত বীরভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভিতরে যে একটু বীরত্বের ভাব ছিল তাহা লোপ পাইয়া আর কেবল বুলবুলের সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে—

"প্রতি বৎসর বুলবুল পক্ষীর আমোদকারী মহাশয় বর্গ দিগের দুই সম্প্রদায় পরস্পর নিজ পক্ষের পাখী লইয়া প্রকাশ্য স্থলে আহ্বান করতঃ সকলের সমক্ষে যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন করেন, এবারে গত রবিবারে ভিন্ন ভিন্ন চারি সম্প্রদায়ের পক্ষ সংগ্রাম দুই স্থানে এক দিবসেই সম্পন্ন হইয়াছে। উহার একপক্ষে রাজা নৃসিংহ চন্দ্র রায়, রাজা রাজেন্দ্র [illegible] আর এবং বাবু শ্যামচাঁদ মল্লিক প্রভৃতি কয়েক মহাশয়, উঁহাদিগের প্রতিপক্ষ কেবল একাকী বাবু [illegible]চাঁদ [illegible]। [illegible] মহাশয় বিপক্ষ বৃন্দের স্থাপিত ক্রীড়াক্ষেত্রে [illegible] সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছেন; প্রতিপক্ষের [illegible] পাখী নাবাইতে না পারিয়া পক্ষপাত ও [illegible] করিয়াছিলেন, সুবিজ্ঞোত্তম দয়ালচাঁদ বাবু [illegible] কথাই উল্লেখ না করিয়া বিস্তর সৌজন্য [illegible] প্রিয়ালাপে বিদায় লইয়া আগমন করেন। [illegible] মল্লিক মহাশয়ের পক্ষি ঐ দিবস [illegible] বাবুদিগের [illegible] পক্ষভেদ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইয়াছেন"।

প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি যে অনেক দিন পর্য্যন্ত [illegible] পল্লীগ্রামের সৌখিনদের এই রকম বেশ ছিল—[illegible] ধুতি, কাঁধে লাল গামছা, মাথায় তেল চুকচুকে [illegible] আর হাতে একটা পোষাপাখী—[illegible], বুলবুলি, [illegible] কাকাতুয়া।

* * *

কোম্পানিকা রাজ মজলিসমে জোয়া।—

এই প্রবাদটীর উৎপত্তি কোন্ সময় হইতে [illegible] ঐতিহাসিকগণই অনুসন্ধান করিবেন। [illegible] ভিক্টোরিয়া যখন ভারত সাম্রাজ্যের রাজ [illegible] থেকে খাস্ লণ্ডনে তখন এটি একটা [illegible] দাঁড়াইয়াছে। সিপাই যুদ্ধের অবসানে [illegible] করিবার জন্য যখন Right Hon'ble [illegible] সাহেব বিলাত থেকে অর্থ সচিব নিযুক্ত [illegible]

তাঁহার মনে Income tax প্রচলন করিবার সংকল্প বদ্ধমূল হইল। দেশের লোকের আবেদন নিবেদন, দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন—দেশীয় সংবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টের অপব্যয়ের কত উদাহরণ দেখাইতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। মাদ্রাজের গবর্ণর সার্ চার্লস ট্রেভেলিয়ন নিজের চাকরির আশা পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রস্তাবিত ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিলেন। এই ট্যাক্স ধার্য্য হইলে দেশ উৎসন্ন যাইবে, দেশে ঘোর অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে, কত উপদেশ দিলেন—অপব্যয় নিবারণ কর, সিভিল সার্ভিসের বেতন কমাও, আর ব্যয়ের সমতা রক্ষা হইবে। কোন আবেদন নিবেদন হিতোপদেশই গ্রাহ্য হইল না। ইনকম্ ট্যাক্স ধার্য্য হইল, দেশময় মহাক্রন্দন সঞ্চার হইল। বোম্বাই সহরে হরতাল হইল, দোকান পাট বন্ধ হইল। মাদ্রাজ সুপ্রীম কোর্টের চিফ জাষ্টিস এই অন্যায় ট্যাক্স বাদ দিয়া মাইনা লইতে অস্বীকার করিলেন, মাদ্রাজের একজন সিভিলিয়ান গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তাঁর জেলায় ইনকম্ ট্যাক্স আদায় করা অসম্ভব অতএব তাঁকে এই বেলা বিদায় দেওয়া হউক। অথচ ব্যয়ের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। একদিকে যুদ্ধের ব্যয় অন্য দিকে রেলওয়ের ব্যয়। সে ব্যয়ের একটু নমুনা শুনুন—রাণীগঞ্জ থেকে গোযানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরিত হইল। তার খরচের জন্য এ মাসে ৫০০০০৲ টাকা বর্দ্ধমানের কালেক্টারের নামে খরচ লিখিয়া দাও, এ মাসে লাখ টাকা খরচ লিখিয়া দাও। তখন এ সব গোলমেলে জমা খরচের নিয়ম বন্ধ নাই, এসব কড়াকড়ি অডিটের (audit) এর চলন ও হয় নাই। কত সরকুট মাজিষ্ট্রেট হাতার ভিতরেই তাঁবু খাটাইয়া মোটা মোটা T. A. draw করিয়াছেন।

আর রেলওয়ে—বিদ্রোহের পরই তো রেল নির্ম্মাণের ধুম। বিলাত থেকে মহাজনগণ ভারত দেশীয় শোনিত-শোষণ-কল-কব্জা আবার এদিকে রেল কোম্পানীতে খাটাইবার জন্য আমাদের দেশের তুলনায় অতি মোটা সুদে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা সুদে এদেশে পাঠাইতেছেন। মোটা সুদ তার উপর ভারত সরকার তার জামিন (guaranteed on the revenues of India) এ টাকা গঙ্গার জলেই ফেল কি রেল রাস্তায়ই ঢাল কি পাতু ভূতের উদর গহ্বরেই ঢাল তাঁহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি! বছর গেলেই সুদের টাকা দিবে গৌরীসেন—ভারতের নিরন্ন মূকপ্রজা, কাহারো কোন দায়িত্ব নাই, কণ্ট্রাক্টরের দায়িত্ব নাই, মোটা মোটা মাহিনার নবাগত আনাড়ি ইঞ্জিনিয়ারদের উপর ভার তাঁদের অভিজ্ঞতাও নাই; ব্যয় সংক্ষেপের দিকে দৃষ্টিও নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া ২।১ জন বড় ২ ইংরেজও এই কথাই বলিয়াছেন—All the money come from the English capitalist and so long as he was guaranteed 5 % on the revenues of India it was immaterial to him whether the funds that he lend were thrown into the Hoogly or converted into brick and mortar—তবে আপসোষ এই যে ঢালছেন বটে তাঁরা দরিয়াসে কিন্তু 'মাল'টা হচ্ছে ভারতের গরীব প্রজার।

* *
*

যে সময় সিপাই বিদ্রোহ এবং কোম্পানির হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রাজ্যভার লওয়া উপলক্ষে বিলাতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল সেই সময় মহারাণীর প্রথমা কন্যার বিবাহ প্রাসিয়ার রাজবংশের যুবরাজ ভূতপূর্ব্ব Kaiser এর পিতার সহিত মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধীয় আমাদের পক্ষে গৌরবের একটা খবর—

"পাঠক শ্রবণ করুণ—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আত্মজের উদ্বেগির উদ্বাহ সম্বন্ধীয় উৎসাহ হেতু সুচারু স্বর্ণের ঢাকাই মলমল এখান হইতে প্রেরিত হয়। এই বিষয়টী আমাদিগের দেশের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক হইয়াছে।"

ইহার অল্পকালের মধ্যেই ঢাকাই মসলিনের গৌরব ও মর্য্যাদা একেবারে লোপ পাইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন।

[২৭শে চৈত্র, ১৩৩১]

১

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশন এবার বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জে হইয়া গেল। এই উপলক্ষে বহু স্থান হইতে সাহিত্যিক বৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। চৈত্রের শেষে কয়েক দিনের জন্য এ-প্রদেশ বঙ্গ সাহিত্যের সেবাব্রতে প্রায় আত্মহারা হইয়াছিল।

বিক্রমপুর আমাদের সাহিত্য-সম্পর্কে স্মরণীয় স্থান, বিক্রমপুরের প্রাচীন গরিমার বিষয় ভাবিতে চিত্ত বিমোহিত হয়। সেই প্রাচীন কাহিনীর সহিত ইতিহাস-বিদিত রামপালের স্মৃতি সংশ্লিষ্ট। রামপালের নিকটবর্ত্তী মুন্সীগঞ্জ জনপদে বঙ্গসাহিত্যের সেবানুষ্ঠান এই বাৎসরিক সম্মেলনের উদ্দেশ্যানুযায়ীই হইয়াছিল।

বিক্রমপুরের সু-সন্তান অক্লান্ত সাহিত্য কর্ম্মী রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের আমন্ত্রণে আমরা বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে এই উপলক্ষে আমাদের সন্নিকটেই বর্ত্তমান যুগের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক বৃন্দের সমাগম সন্দর্শন করিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। এই এত বড় গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যে সর্ব্বথা সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি।

আদিশূর, বল্লাল, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতির পুণ্যকীর্ত্তিতে বিক্রমপুর প্রদেশ মহিমান্বিত। তথায় এই সাহিত্যিক মহাযজ্ঞের প্রধান পরিচালক মূল সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বঙ্গের [illegible] রাণী ভবানীর বংশধর,—বিনয়ের সত্য-অবতার, জ্ঞান মার্গে সমুন্নত, বিদ্যোৎসাহী, সুপণ্ডিত-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর।

[illegible] তাঁহার নেতৃত্বে সম্মেলনের কার্য্যাবলী সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জের এই সাহিত্য সম্মেলন বিক্রমপুরের গৌরবময় ইতিহাসেও এক স্মরণীয় স্থান অধিকার করিল।

সমাগত অতিথি বৃন্দের সম্বর্দ্ধনার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এবম্বিধ সুবৃহৎ অনুষ্ঠান একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনপদে সুসাধিত করা সহজ নহে। কিন্তু মুন্সীগঞ্জের সমস্ত আয়োজন সফল হইয়াছিল—তজ্জন্য তত্রত্য কার্য্য-নির্ব্বাহক দিগকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। ঐ স্থানের শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীণ কর্ম্মী; তাঁহাদিগের উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত চেষ্টা প্রশংসনীয়। তথাকার হিন্দু মুসলমান ছাত্রবৃন্দ যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহারাও আমাদিগের ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ-ভাজন।

এই সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের সহায়তা-কল্পে মুন্সীগঞ্জের সরকারী কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। মহকুমা-হাকিম শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহযোগী শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী সকলেই সমাগত অতিথিগণের অভ্যর্থনা-কার্য্যে প্রাণপণ সাহায্য করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহারা আমাদিগের ধন্যবাদার্হ; তাঁহাদের অতিথিগণ তাঁহাদের আন্তরিকতা বিস্মৃত হইবেন না।

অতিথিগণ মধ্যে ঢাকা হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত পরিমলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতির সাদর-ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

৩

মূল সভার সভাপতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষ শাখাগুলির সভাপতি নির্ব্বাচনও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সাহিত্য শাখায় সর্ব্বজন বিদিত কথা সাহিত্যের প্রধান শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস শাখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, দর্শন শাখায় সুপণ্ডিত শাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং বিজ্ঞান শাখায় সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী সভাপতি হইয়াছিলেন।

মূল সভাপতির ও শাখা-বিভাগের সভাপতিগণের অভিভাষণ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল অভিভাষণ বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী স্থান গ্রহণোপযোগী। আমরা পাঠকালে উহা শ্রবণ করিয়া, এবং পরে পত্রিকা পৃষ্ঠে উহা পাঠ করিয়া, আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি।

এই অনুষ্ঠানে সমাগত আরও অনেক সুধীবৃন্দের দর্শন লাভ করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। সুবিখ্যাত "ভারতবর্ষ" সম্পাদক, সাহিত্যিকাগ্রগণ্য, প্রবীণ শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, নিপুণ শব্দশিল্পী, খ্যাতনামা উপন্যাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত "ধ্রুবতারা" লেখক সুধীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, এই অনুষ্ঠান অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাক্যাবলী ও যতীন্দ্র বাবুর "সাহিত্যিক পঞ্জিকা"-প্রবন্ধ বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ বলে গণ্য।

ঢাকা হইতে অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী মুন্সীগঞ্জে গিয়াছিলেন। চারুবাবুর কথা উল্লেখ করিয়াছি; তদ্ভিন্ন পণ্ডিতপ্রবর ভাষাবিৎ মৌলভী শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্, বঙ্গভাষার অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত আবদুল ওদুদ, প্রতিভা সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র সরকার, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ, বিক্রমপুরের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক সুবক্তা ও সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী, সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং নবীন লেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ ব্যানার্জী প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ করা যাইতেছে। আরো গিয়াছিলেন বৈষ্ণব কাব্য রসজ্ঞ সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটক—যিনি প্রাচী প্রতীচি উভয় ভাষায় গীতিমাল্য রচনা দ্বারা বাণীপূজার অর্ঘ্য সাজাইতেছেন।

এ যেন এক পবিত্র তীর্থ সম্মিলন,—বাণী-মন্দির দ্বারে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানবের আত্ম-নিবেদন। আমরা তীর্থ দর্শক মাত্র—দর্শনে প্রীত হইয়াছি।

সম্মিলন-কার্য্য সমাধা হইবার পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় ঢাকায় আসিয়াছিলেন। এখানে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর পক্ষ হইতে শরৎ বাবুকে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। তথায় আমরা উক্ত দুই সাহিত্য মহারথীর জ্ঞানগর্ভ বাক্যশ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

৪

অভিভাষণ ইত্যাদি চমৎকার হইয়াছিল।

সুবিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে, সাগ্রহ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্র নাথের জলদগম্ভীর ধ্বনি যেন কোন্ পূর্ব্ব গৌরব-স্মৃতি-মণ্ডিত মরুবক্ষে সেই পুরাকালের ভগীরথ আনীত পুণ্যতোয়া সুরধনীর আগমন নির্ঘোষের মতনই শুনাইতেছিল।

মহারাজের অভিভাষণের ভাষা তাঁহার নিজস্ব। তাঁহার সুললিত বাক্যাবলী, ভাব ও ভাষায় এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ সৃষ্টি করিয়া সমবেত মানব বৃন্দকে জাগ্রত, অভিভূত, ও বিমোহিত করিয়াছিল। তাঁহার বর্ণিত "সেন, শূর ও পাল রাজগণের কীর্ত্তি কলিত বিক্রমপুর," "দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান অতীশের জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত বিক্রমপুর," "বিশ্বরূপ, কেশবের বিক্রমপুর" যেন শ্রোতৃবর্গের মনশ্চক্ষুতে পুনরায় ফিরিয়া দেখা দিতেছিল,—তাঁহার এই মহাযজ্ঞের "পৌরোহিত্য" তাঁহারই মহীয়সী ভাষার ওজস্বীনী মন্ত্রশক্তিতে সফল হইয়াছে।

মহারাজের আত্মবাক্যে "সমাগত প্রায় জীবন সন্ধ্যা"র উল্লেখ বড় প্রাণস্পর্শী। আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

৫

স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে মহারাজের বাণীর একাংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—

"জাতীয় ভাবকে অব্যাহত রাখিয়া স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে শিক্ষাদান সকল দেশেই প্রয়োজন, ভারতে সে প্রয়োজন ততোধিক। আমাদের ভবিষ্য জননীগণকে এমন ভাবে শিক্ষাদান করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা আমাদের দেশের বৈশিষ্টকে অক্ষুন্ন রাখিয়া দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধনে সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সহায়তা করিতে পারেন।"

আমরা ইহার প্রত্যেক বর্ণ সমর্থন করি।

৬

মহারাজ একটী মুসলমান মহিলার প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমতী নুরন্নেছা খাতুন যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মহারাজ বলিতেছেন,—

"…………হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টা যে বঙ্গবাসীর অভ্রভেদী মণি মন্দির তাহার তুঙ্গশির ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবে এবং মন্দির চূড়ায় কেতনের চীনাংশুক শোভা দেশ দেশান্তর-বাসী বিস্মিত নেত্রে দেখিতে থাকিবে। যে মহীয়সী মোস্লেম মহিলার মনে এই মহান্ সত্যই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি বঙ্গদেশবাসী সমাজ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই নমস্যা এবং যে হৃদয়ের বলে তিনি এই পরম ও চরম সত্যবাণী উচ্চারণ করিবার সৎসাহস লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট সকলেরই মস্তক গভীর শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া পড়ে………"

জ্যৈষ্ঠের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' তে প্রকাশিত এই মহিলার প্রবন্ধ হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম,—

"নারী আমরা, আমরাই ত সৃষ্টিকারিনী। আমরা যদি বাংলায় একটা স্ত্রীশিক্ষা মণ্ডলী গড়ে তুল্‌তে পারি, তা'হলে আমাদের সমাজের পুরুষদের ঘুম ভাঙতে পারে,— সমাজের ক্ষুদ্রতা দূর হতে পারে। কবে যে সে শুভদিন আস্‌বে, আমি তারই প্রতীক্ষায় পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

৭

সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করিতে পারিলাম না, তাহাতে আমরা ক্ষুব্ধ। এই সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, বারান্তরে আমরা তাহার চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করি।

এবারকার সাহিত্য সম্মেলনের অনেক স্মরনীয় বিষয় মধ্যে একটী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি।

শ্রীমতি প্রিয়বালা গুপ্তা একজন হিন্দু মহিলা, তাঁহার রচিত একটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ["নবীনের অভিনন্দন," জ্যৈষ্ঠের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত] তিনি স্বয়ং এই সভায় পাঠ করিয়াছিলেন জনমণ্ডলী এই প্রবন্ধ শ্রবণে আশ্চর্য্য ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাতৃ-জাতীর পক্ষ হইতে মাতৃ-সমা রমণী যখন দাঁড়াইয়া তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধে সন্নিবদ্ধ তাঁহার সুচিন্তিত অভিনন্দন পাঠ করিলেন, তখন বাস্তবিক মনে হইল, আমাদের সাহিত্যের ক্ষমতা কতদূর,—মাতৃ জাতির নিকট শিক্ষা করিবার অধ্যায় যেন আজও আমাদের সমাধা হয় নাই। মনে হইতেছিল যেন স্বয়ং মাতা জগদ্ধাত্রীই বুঝি সন্তানবরা ভয় প্রদানের জন্য সন্তান মণ্ডলীর মধ্যে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

আমরা তাঁহারই কথায় "নবীনকে" আশীর্ব্বাদ করিতেছি,—

"আমাদের ছেলেদের আনন্দোজ্জ্বল উৎসাহদীপ্ত তরুণ-শ্রীমণ্ডিত মুখগুলির দিকে চাইলে আমার এ কথাই মনে হয়, এরা যেন প্রভাতের মতোই নবীনতা, সরলতা এবং জীবনের বার্ত্তা নিয়ে এসেছে; নিরানন্দ, অবসন্ন, ভারাক্রান্ত সংসার, দেশ, সমাজ ও জাতিকে নূতন বলে বলীয়ান্, প্রাণবান্, সুন্দর, মধুর করে তুলবে।"

* * *

আমাদের তীর্থদর্শন সফল হইয়াছে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

(১) ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" পঞ্চদশ কথায় ১৬০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটী কথা এমন সরল সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে ইচ্ছা হয় ইহা প্রতিদিন পাঠ করি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সুপরিচিত লেখক, তাঁহার ভাষা যে সুন্দর তৎসম্বন্ধে মত ভেদ নাই। তিনি এই গ্রন্থে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না

করিতে পারলে কখনই এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিতে পারিতেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস. গ্রন্থ খানা ধর্ম্মপ্রাণা, বিদুষী, আলো ও ছায়া প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত্রী শ্রীমতি কামিনী রায় মহোদয়ার ভূমিকায় আরও মনোজ্ঞ হইয়াছে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও ব্রাহ্ম সমাজস্থ অনেক লোক তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি ও সরলতা থাকা সত্ত্বেও কেবল ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অযথা নিন্দিত হইয়াছেন। সাধু যাঁহাদের সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়। আজ সেই ব্রাহ্ম সমাজের মত প্রাচীন সমাজে অবাধে চলিতেছে। সেইজন্য সাহস করিয়া বলিতে পারি ক্ষিতিন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থ প্রাচীন সমাজেও আদরণীয় হইবে। আমার মনে হয় এই রকমের একখানা গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া সঙ্গত সাম্প্রদায়িকতা দোষে এই গ্রন্থখানা দূষিত হইলেও মূল ধর্ম্মতত্ত্ব সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

কলেজের ছেলেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক শান্তি পাইবেন। ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা না থাকায় পাঠ্যাবস্থায় অনেক ছাত্রকে কুপথে পতিত হইতে দেখা যায়। এই সরল সহজ গ্রন্থ খানা পাঠ করিলে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র কি তাহা উত্তমরূপে বুঝা যায়। ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সেই ভাবে না চলিয়া থাকা যায় না।

গ্রন্থের দশম কথা, "মামেকং শরণং ব্রজ" ৯১ পৃষ্ঠা হইতে ১০১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এই কথা প্রতিদিন পাঠ করিলে সাংসারিক দুঃখ হইতে শান্তি পাওয়া যায়।

আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এই জাতীয় গ্রন্থ আরও লিখিয়া মানব জাতীর কল্যাণ করিবেন।

---

(২) সত্যের সন্ধান।

ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউশনের সহকারী শিক্ষক

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

বইখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি মাত্র। "সত্যের সন্ধান" নাম হইতেই বইখানির আলোচ্য বিষয় কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কয়েকটী সমাজনীতি ও বাকিগুলি দর্শন ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক। গ্রন্থকার স্বয়ং সত্যানুসন্ধিৎসু এবং তিনি তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাইয়া নিজ ব্যক্তিগত জীবনে সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত জটিল সমস্যা প্রতিভাত দেখিতে পাইয়াছেন, সেগুলিকে তিনি কিরূপভাবে সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই ক্ষুদ্র বইখানির প্রাঞ্জল ভাষা ও সরল যুক্তি রাশির ভিতর দিয়া সাধারণের গোচর করা হইয়াছে। যথাসম্ভব উভয় পক্ষের যুক্তির যথাস্থানে অবতারণা করা হইয়াছে এবং সেগুলিকে সমর্থনের জন্য পাশ্চাত্য মনীষিগণের মতামত একটু অত্যাধিক পরিমাণেই যেন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। নীরস, একঘেঁয়ে শিক্ষকতা কার্য্যের অবসর সময়ে গ্রন্থকার মহাশয় তাঁহার মনকে সত্যের সন্ধানে ধাবিত করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন শাস্ত্র সমূহ যেরূপ গভীর উৎসাহের সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। সকলেই যে তাঁহার ভাব ও চিন্তাধারার সঙ্গে ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন, এমন আশা করা যায় না। তবে তাঁহার স্বাধীন গবেষণা ও গতানুগতিক মতের বিরুদ্ধে তাঁহার নির্ভীক উক্তি সমূহ তাঁহার সৎসাহসের পরিচায়ক বটে। বর্ত্তমান গল্প উপন্যাস প্লাবিত দেশে এই পুস্তকের স্থান কোথায় হইবে তাহা অনুমান করা তত কঠিন নহে। কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, একশ্রেণীর পাঠকের নিকট এই পুস্তক স্থানকাল নিরপেক্ষ ভাবে আদৃত হইবে। গী

প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ঢাকা; বরমন সংঃ। মূল্য ১৲ টাকা।

——(*)——